বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

শ্রীসুকুমার সেন, এম.এ., পি-এইচ. ডি., এফ. এ. এস.
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯৮

মূল্য ১০০·০০

ভারতবর্ষে মুদ্রিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট
শ্রীপ্রদীপ কুমার ঘোষ কর্তৃক ৪৮ হাজরা রোড
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ — ১৯৩৯
দ্বিতীয় সংস্করণ — ১৯৪০
তৃতীয় সংস্করণ — ১৯৪৩
চতুর্থ সংস্করণ — ১৯৪৫
পুনর্মুদ্রণ — ১৯৪৯
পুনর্মুদ্রণ — ১৯৫০
পঞ্চম সংস্করণ — ১৯৫৬
ষষ্ঠ সংস্করণ — ১৯৬০
সপ্তম সংস্করণ — ১৯৬৩
পুনর্মুদ্রণ — ১৯৯৮

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ শতাব্দী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ষোড়শ শতাব্দী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ শতাব্দী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতাব্দী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতাব্দী

সপ্তম সংস্করণে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোচনা পূর্বাপেক্ষা কিছু বাড়ানো হইল।

৮ এপ্রিল ১৯৬৩ শ্রীসুকুমার সেন

ষষ্ঠ সংস্করণের মুখবন্ধ

প্রস্তুত সংস্করণে প্রথম অংশ প্রায় আদ্যোপান্ত পুনর্লিখিত হইয়াছে। শেষ অংশে হস্তক্ষেপ আবশ্যক মনে করি নাই।

আশা করি সাধারণ পাঠক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই এই সংস্করণ অধিকতর আদরণীয় ও উপযোগী বিবেচিত হইবে।

শ্রীমান্ ভবতারণ দত্ত, এম.এ., নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমার শ্রম লাঘব করিয়াছেন।

৩১ জানুয়ারি ১৯৬০ শ্রীসুকুমার সেন

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অভাব নাই। কিন্তু অল্পপরিসরের মধ্যে সর্বজনপাঠ্য প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাসের বিশেষ অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণের জন্যই 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' লিখিত হইল। ইহাতে যথাসম্ভব খুঁটিনাটি বাদ দিয়া প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণনা করিতে প্রয়াস করিয়াছি। মল্লিনাথের কথায় বলি—নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিতমুচ্যতে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ এবং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের আগ্রহ না থাকিলে বইটি এত শীঘ্র প্রকাশিত হইত না। সেইজন্য ইঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসুকুমার সেন

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু কিছু নূতন তথ্য সংযোজিত হইল। তরজা, কবিগান ও পাঁচালীর বিষয়ে একটি নূতন প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। অজ্ঞাতপূর্ব কয়েকটি নূতন কাব্যের পরিচয়ও ইহাতে মিলিবে। আধুনিক পূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের বিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃততর পরিচয় ও তথ্য জানিতে চান তাঁহারা আমার নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দেখিলে উপকৃত হইবেন। বৈষ্ণব গীতিকবিতার বিষয়ে পূর্ণতর বিবরণ মদীয় *A History of Brajabuli Literature* গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

প্রথম সংস্করণের একটি বহুপ্রচলিত ভ্রম বর্তমান সংস্করণে শুধরাইয়া দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই ভ্রম নির্দেশ করিয়া দেন, সেজন্য তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলে রাখি। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা'র এক জায়গায় লেখা হয়েছে দিনেন্দ্রনাথ আমার রচিত অনেক গানে সুর বসিয়েছেন—কথাটা সম্পূর্ণই অমূলক। অনেক মিথ্যা জনশ্রুতি ইতিপূর্বেও অন্যত্র ছাপার অক্ষরে দেখেছি। মুখে মুখে অনেকে চালনা করেন।"

শ্রীসুকুমার সেন

বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের উপক্রম

বাঙ্গালা দেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে যাহারা বাস করিত তাহাদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, ভাষার সম্বন্ধে তো নয়ই। সুতরাং তাহাদের সাহিত্য কেমন ছিল সে কথা উঠে না। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর বেশ কিছুকাল পূর্ব হইতেই এদেশে আর্যদের বসতি আরম্ভ হয় গঙ্গাপথ ধরিয়া, এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই আগেকার বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্বত্র আর্যভাষা একচ্ছত্র হয়। আর্যেরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল, তবে এক জোটে নয়, দলে দলে ও ক্রমে ক্রমে। ইহাদের পোষাকী (অর্থাৎ শিক্ষার, বিদ্যাচর্চার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের) ভাষা ছিল সংস্কৃত আর আটপহরিয়া (অর্থাৎ ঘর-সংসারের) ভাষা ছিল প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন।[১]

এই উপনিবিষ্ট আর্যদের দ্বারা এদেশে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। প্রথম কয়েক শতাব্দী তাঁহারা প্রায় সবই সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন, দৈবাৎ প্রাকৃতে। এই সব লেখার নমুনা পাই শিলাখণ্ডে অথবা তাম্রপটে উৎকীর্ণ ভূমিদানপত্র ইত্যাদিতে, দুই-একটি মহাকাব্যে ও কয়েকখানি নাটকে আর প্রচুর সংস্কৃত শ্লোকে। বাঙ্গালা দেশে রচিত সর্বাপেক্ষা পুরাতন কাব্য বলিয়া যাহা জানি সেই 'রামচরিত' রামায়ণ-কাহিনী। কবির নাম অভিনন্দ। অনুমান হয় যে, ইনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে রাজা দেবপালের সভাকবি ছিলেন। পাল রাজাদের রাজ্যকালে, দশম শতাব্দীর শেষভাগে, এই নামে

১ যেমন, সংস্কৃত — ত্রয়ো ভ্রাতরো গৃহং যান্তি; প্রাকৃত — তিন্নি ভাঈ ঘরং যান্তি; বাঙ্গালা — তিন ভাই ঘর যান।

আরও একটি কাব্য লেখা হইয়াছিল। সে কাব্যে প্রত্যেক শ্লোকের দুইটি করিয়া অর্থ। এক অর্থ লইলে রামায়ণ-কাহিনী, অপর অর্থ লইলে রাজা রামপালের জীবনী। ইহার কবি সন্ধ্যাকর নন্দীও রাজসভাসদ ছিলেন। সন্ধ্যাকরের রামচরিতে সেকালের ইতিহাসের অনেক কথা জানা যায়। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের উপাখ্যান লইয়া আরও অনেক কাব্যনাটক লেখা হইয়াছিল। সেগুলি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কতকগুলির নাম মাত্র জানা আছে। তখনকার সাধারণ লোকের সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে পাহাড়পুরে (প্রাচীন সোমপুরে) অষ্টম শতাব্দীতে যে বিরাট মন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহার ভগ্নস্তূপ হইতে যে সব উৎকীর্ণ চিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সেকালকার লোকের সাহিত্যরুচির সম্বন্ধে ধারণা এই করিতে পারি যে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, দেবতাদের মূর্তি, পঞ্চতন্ত্রের গল্প ইত্যাদিতে সেকালের লোকের রুচি ছিল।

পাল রাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাহার পর দেব, বর্ম, চন্দ্র ও সেন প্রভৃতি বংশের রাজত্ব। চিরকালের রাজনীতি অনুসারে ইঁহারাও বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যপ্রিয় ছিলেন। বিশেষ করিয়া সেন রাজাদের সাহিত্য ও সঙ্গীত আলোচনায় অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সেকালের অনেক বড় কবি পণ্ডিত ও গুণী ইঁহাদের সভা অলংকৃত করিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লক্ষ্ণণ সেনের সভায় উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, ধোয়ী, শরণ এবং জয়দেব এই পাঁচজন বিখ্যাত কবির সম্মেলন হইয়াছিল। উমাপতি ধর দীর্ঘজীবী ছিলেন। রাজনীতিতে ও কাব্যানুশীলনে ইঁহার সমান দক্ষতা ছিল। ইঁহার লেখা কয়েকটি প্রশস্তি এবং কতকগুলি প্রকীর্ণ শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিতে সেকালের জীবনের কিছু প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। পণ্ডিত শরণের লেখা কোন কাব্য পাওয়া যায় নাই, তবে অনেকগুলি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। গোবর্ধন আচার্য 'আর্যাসপ্তশতী' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্য রচনায় ইনি শিষ্য উদয়ন এবং ভাই বলভদ্রের যে সাহায্য পাইয়াছিলেন সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ধোয়ী 'পবনদূত' কাব্যের রচয়িতা। কাব্যটি কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণ হইলেও গুণহীন নয়। লক্ষ্মণ সেনের সভায় ধোয়ীর খাতির ছিল সবচেয়ে বেশী। ইনিই রাজার সভাকবিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন।

লক্ষ্ণণ সেনের "প্রতিরাজ" এবং সুহৃৎ "মহাসামন্তচূড়ামণি" বটুদাসের

পুত্র শ্রীধরদাস ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সঙ্কলন করেন। এই বইটিতে বহু বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী কবির রচিত প্রকীর্ণ শ্লোক সঙ্কলিত আছে। পরবর্তী কালের বাঙ্গালা সাহিত্য কোন্ পথে যাইবে তাহার কিছু পূর্বাভাস এই বইটির কোন কোন কবিতায় পাই।

লক্ষণ সেনের সময়ে আমরা এমন এক কবিকে পাইতেছি যিনি শুধু বাঙ্গালা দেশের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ইনি জয়দেব। ইঁহার 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনাময় যে চব্বিশটি গান আছে তাহা কতকটা গীতিনাট্যের আকারে উপস্থাপিত। গানগুলির ভাষা সংস্কৃত কিন্তু রচনারীতি ও ছন্দ প্রাকৃতের অনুযায়ী এবং অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। বলিতে পারা যায়, এই পদগুলি লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের জয়যাত্রারম্ভ। পরবর্তীকালে বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালার বাহিরে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা সকলেই জয়দেবের কাছে অল্পবিস্তর ঋণী। অজয়ের ধারে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের নিবাস ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই গ্রামের নাম এখন কেঁদুলী (বা জয়দেব-কেঁদুলী)। বহুকাল হইতে এই স্থানে অজয়ের তীরে প্রতি বৎসরে পৌষ সংক্রান্তির সময়ে বিরাট মেলা বসে। দেশের দূরতম অঞ্চল হইতেও সাধু-বৈষ্ণব এই মেলায় হাজির হন। জয়দেবের কাব্য হইতে তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে, তাঁহার পিতা ভোজদেব, মাতা বামাদেবী, পত্নী পদ্মাবতী। সঙ্গীতকুশলী জয়দেব ও নৃত্যকুশলী পদ্মাবতীর সম্বন্ধে নানা গল্পকাহিনী প্রচলিত আছে।

জয়দেবের আগেই প্রাকৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। হিন্দী, উড়িয়া, মৈথিল, অসমীয়া, গুজরাটী প্রভৃতি আঞ্চলিক আর্য ভাষাও প্রাকৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্য ভাষা উৎপন্ন হইবার ঠিক আগে প্রাকৃত ভাষা যে রূপ লইয়াছিল তাহাকে বলে অবহট্‌ঠ। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় যেমন অবহট্‌ঠ ভাষায়ও তেমনি কবিতা গান ইত্যাদি লেখা হইত। কিন্তু অবহট্‌ঠ ভাষা রাজসভায় ও পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত ছিল না, ছিল সাধারণ লোকের এবং কোন কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের গুরুশিষ্যদের মধ্যে। অবহট্‌ঠ ছড়ার একটি উদাহরণ দিই।

তরু ফল দরিসণে ণউ অগ্‌ঘাই।
বেজ্জ দেক্‌খি কি রোগ পলাই।।

আধুনিক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে এই রকম হইবে—

তরুতে ফল দেখিলে আঘ্রাণ হয় না
বৈদ্য দেখিলেই কি (রোগীর) রোগ পালায়?

যে ধর্ম-সম্প্রদায়ে অবহট্‌ঠ রচনার প্রচলন ছিল সেই সম্প্রদায়েই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যবহার হইয়াছিল — গান রচনায়। সহজপন্থী বৌদ্ধ ও যোগী গুরুদের লেখা বাঙ্গালা গানের পুঁথি নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে বহুকাল হইতে সংগৃহীত ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সেই পুঁথি আবিষ্কার করিয়া 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নাম দিয়া প্রকাশ করেন (১৯১৬)। মূল বইটিতে একান্নটি গান ছিল। তবে তাহার মধ্যে একটি গান পুঁথি লেখক বাদ দিয়াছেন, এবং মাঝখানের কয়েকটি পাতা হারাইয়া যাওয়ায় সাড়ে তিনটি গান পাওয়া যায় নাই। গানগুলির মধ্যে গুরু-কবিরা তাঁহাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত শিষ্যদের জন্য সাধনার নির্দেশ সঙ্কেতে দিয়াছেন। এই সাধনসঙ্কেতযুক্ত গানকে তাঁহারা বলিয়াছেন "চর্যা-গীতি"। চর্যা-গীতির গঠন বৈষ্ণব-পদাবলীরই মত। গোড়ায় রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে এবং গানের মধ্যে কবির নিজের অথবা গুরুর নাম (অর্থাৎ "ভনিতা") আছে। লুই, সরহ, কাহ্ন, জয় নন্দী, তাড়ক, কঙ্কণ, আজদেব, ভুসুকু ইত্যাদি প্রায় বিশজন "সিদ্ধাচার্য" কবির রচিত চর্যাগীতি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের জীবৎকাল দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পড়ে। বাঙ্গালা ছাড়া আর কোন আধুনিক আর্য ভাষায় লেখা এত পুরানো রচনা রক্ষিত হয় নাই।

চর্যাগীতিগুলিতে বৌদ্ধ ও যোগী গুরুদের সাধনার যে সঙ্কেত নিহিত আছে তাহা হারাইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা জানি না। তবে সাধারণ মানে বোঝা খুব কঠিন নয়। ভাষা দুর্বোধ, কেননা প্রাকৃত হইতে সদ্যোজাত।

চর্যাগীতির একটি নিদর্শন দিই। এটি "সিদ্ধাচার্য" ভুসুকুর রচনা। বাহ্য অর্থে বিষয় হইতেছে — দেশে জলদস্যুর হানায় কবি সর্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে যেন নিঃস্বতার নিশ্চিন্ততায় নিমগ্ন হইয়াছেন।

বাজ-নাব পাড়ী পঁউআ-খালে বাহিউ
অদয় দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।

দহিঅ পঞ্চ পাটন ইন্দি-বিষয়া ণঠা
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা।
সোণ রূঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ
ণিঅ পরিবারে মহাসুহে বুড়িউ।
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লই আশেষ
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ।।

আধুনিক কালের বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে এই রকম হইবে—

বাজ-নাও পাড়ি (দিয়া) পদ্মা-খালে বাহিল,
নির্দয় ডাঙ্গালিয়া দেশ লুটিল।
আজ ভুসুকু (তুই) বাঙ্গালী হইলি
(তোর) নিজ-গৃহিনীকে চাঁড়ালে লইল।
দহিল পাঁচ পাটন, ইন্দ্রের বিষয় নষ্ট (হইল)
না জানি চিত্ত মোর কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট (হইয়াছে)।
সোনা রূপা মোর কিছুই থাকিল না
নিজ পরিবারে (আমি) মহাসুখে ডুবিলাম।
চারি কোটি (মূল্যের) ভাঁড়ার মোর লইল অশেষ
জীবনে মরণে নাই পার্থক্য।।

সেকালের জনসাধারণের জীবনযাত্রার ছোটখাট ছবি কোন কোন চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলি হইতে বোঝা যায় যে হাজার বছর আগেও সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন অনেকটা এখনকার পল্লীজীবনের মতই ছিল।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের গানে আর সিদ্ধাচার্যদের চর্যাগীতিতে যে পদাবলীর স্রোতোমুখ খোলা হইল তাহা পরবর্তী কালে বৈষ্ণব কবিদের লেখনীতে পুষ্টিলাভ করিয়া পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান ধারারূপে প্রবাহিত হইয়াছিল। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেও গীতিকাব্যরূপে এই ধারাই খাত বদলাইয়া নিরন্তর বহমান।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি গানে, এবং আধুনিক কালের সীমানা পর্যন্ত এ সাহিত্যে সুরের সঙ্গে কবিতার বিচ্ছেদ হয় নাই। একথা মনে রাখিতে হইবে।

২. তুর্কি অভিযানের ফল

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালা দেশে তুর্কি আক্রমণ শুরু হয়। অনেক দিন হইতেই বাঙ্গালা দেশ আর্যাবর্তের রাষ্ট্র-সঙ্ঘট্টের যথাসম্ভব বাহিরে থাকিয়া অনেকটা নিজের মতে চলিয়া আসিতেছিল। সুতরাং আর্যাবর্তে শক, হূণ প্রভৃতি বিদেশী রাজ্যলোভীরা প্রচণ্ড বিক্ষোভ তুলিলেও তাহার ঢেউ বাঙ্গালা দেশের সীমানা স্পর্শ করিতে ও বাঙ্গালীর শান্ত পল্লীজীবনে দুর্যোগ ঘনাইতে পারে নাই। অনেক কাল পরে যখন তুর্কি ও পাঠান সেনা পশ্চিম ও উত্তর ভারতে একে একে দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখনও এই ব্যাপারের গুরুত্ব বাঙ্গালীর সম্যক্ বোধগম্য হয় নাই। অতএব যখন ইখ্‌তিয়ারুদ্‌দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার মগধ দেশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া অকস্মাৎ পূর্বদিকে প্রধাবিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালা দেশের রাজশক্তি অথবা প্রজাবর্গ কেহই বাধা দিবার জন্য রীতিমত প্রস্তুত ছিল না। তাই তুর্কি-পাঠান অভিযান বাঙ্গালা দেশে বিশেষ বাধা পায় নাই।

তুর্কি আক্রমণের ফলে কিছুকালের জন্য বাঙ্গালীর জ্ঞানের ও সংস্কৃতির অনুশীলনের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেকালে বিদ্যাচর্চার প্রধান স্থান ছিল বৌদ্ধ বিহার ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাড়ী। তুর্কিরা বৌদ্ধ বিহার সব ভূমিসাৎ করিল, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা এদিকে ওদিকে পলাইয়া গেল। দুই শত আড়াই শত বৎসর ধরিয়া দেশ যেন অন্ধকারময় রহিল। এইজন্য ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলনের কোন নিদর্শন স্থায়ী হয় নাই।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শম্‌সুদ্দীন ইলিয়াস শাহা বাঙ্গালা দেশকে নিজের অধীনে আনিয়া এবং দিল্লীর সম্রাটের অধিকার অস্বীকার করিয়া স্বাধীন সুলতান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন হইতে দেশে স্বস্তির ও শান্তির হাওয়া ফিরিতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালী রাজকর্মচারীদের আগ্রহে আবার লেখাপড়ার পোষকতা শুরু হইল। আগেকার কালের মত এ কালেও প্রধানত রাজসভাই সাহিত্যসংস্কৃতির পোষকতা করিতে লাগিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনচারিজন সুলতান এবং ষোড়শ শতাব্দীতেও তিনচারিজন সুলতান আর কয়েকজন মুসলমান শাসনকর্তা নিজেদের সভায় বাঙ্গালী কবিকে কাব্য ও কবিতা রচনা করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইংরেজ অধিকারের গোড়ার দিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রধানত গেয় কাব্যের ও কবিতার অধিকার ছিল। অর্থাৎ তখন কাব্য ও কবিতা এখনকার মত মনে মনে পড়া বা আবৃত্তি করা হইত না, খোল করতাল একতারা ইত্যাদি লইয়া দলবদ্ধভাবে অথবা একাকী গান করা হইত। হাজার দেড় হাজার বছর আগে "পাঞ্চালিকা" অর্থাৎ পুতুল-নাচের সহযোগে এই ধরণের রচনা গাওয়া হইত বলিয়াই বোধ হয় পুরানো বাঙ্গালা কাব্যের সাধারণ নাম হইয়াছিল "পাঞ্চালী"। পাঞ্চালী কাব্যের বিষয় ছিল রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি সংস্কৃত মহাকাব্যে ও পুরাণে বর্ণিত আখ্যান অথবা পুরাণে অনুল্লিখিত কিন্তু বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত দেবকাহিনী।

কবিতা বা গানের বিষয় প্রধানত ছিল কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবং ঐতিহাসিক গাথা। পাঞ্চালীর তুলনায় গানই বেশী পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তাহার কারণ গানের ধারা চর্যাগীতি ও গীতগোবিন্দের সময় হইতে অনুশীলিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু পাঞ্চালী পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে হয় গান নয় মেয়েলি ব্রতকথার আকারেই নিবদ্ধ ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের সাহিত্যিক রুচির চমৎকার ছবি পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত বইটিতে। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, তখন গায়কেরা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ও শিবের গৃহস্থালীর গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত, পূজা উপলক্ষ্যে সাধারণ লোকে আগ্রহ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ও মনসার গান শুনিত, এবং রামায়ণ-গানে আর ঐতিহাসিক গাথায় হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের, এমন কি বিদেশী মুসলমানেরও চিত্ত বিগলিত হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত এই সব কাব্যের তিনচারিখানির মাত্র সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক গাথা — বৃন্দাবনদাসের কথায় "যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত' — প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ শতাব্দী

১. রাজসভায় বিষ্ণুকথা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা পাঞ্চালী ও কবিতা (পদাবলী) যাঁহারা লিখিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই রাজসভা-পুষ্ট অথবা রাজপরিষদ-পালিত। কবিতাগুলি অনেক সময় কবির পোষ্টাদের প্রীতিকামনায় রচিত হইত। কিন্তু পাঞ্চালীগুলির শ্রোতা ছিল জনসাধারণ। সাধারণত দেবমন্দিরে, নাটশালায় অথবা বারোয়ারি পূজার উৎসব-প্রাঙ্গণে কয়েকদিন ধরিয়া পাঞ্চালী কাব্য গীত হইত। সে গানের সভায় সকলের প্রবেশ-অধিকার ছিল।

কোন কোন রাজসভায়—যেমন নেপালে—গীতিনাট্যেরও অনুশীলন ছিল। নেপালে বাঙ্গালী কবির লেখা গান ও নাট্যরচনার কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গিয়াছে। তবে সেগুলি পরবর্তী শতাব্দীর।

বাঙ্গালা দেশে যেসব রচনা পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে তাহার প্রায় সবগুলিতে—পদাবলী হোক বা পাঞ্চালী হোক—রামায়ণে মহাভারতে ও ভাগবত-পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণু-অবতারলীলার বর্ণনা। অন্য দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া যে পাঞ্চালী কাব্যগুলি লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে একটিমাত্র পঞ্চদশ শতাব্দী শেষ হইবার চারিপাঁচ বছর আগে লেখা হইয়াছিল। তাহার আগে নিশ্চয়ই এইধরণের রচনা ছিল, কিন্তু সেগুলির রচয়িতারা হয় শক্তিশালী লেখক ছিলেন না, নয় রাজার অথবা ধনীর সহায়তা পান নাই। তাই তাঁহাদের রচনা প্রচারের সুযোগ না পাইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

২. কৃত্তিবাস ওঝা ও মালাধর বসু

প্রথম দুইখানি পাঞ্চালী কাব্য গৌড়-সুলতানের দরবারে সম্মানিত দুই কবির রচনা। একজন কৃত্তিবাস ওঝা, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সবার আগে রামায়ণ

কাব্য লিখিয়াছিলেন। আর একজন মালাধর বসু, যিনি প্রথম কৃষ্ণলীলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথমেই আমরা একজন বড় কবি কৃত্তিবাস ওঝাকে পাইতেছি। ইঁহার 'শ্রীরাম-পাঞ্চালী' বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি মুখ্য রচনা। কৃত্তিবাসের নামকে আশ্রয় করিয়া রামকথা শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙ্গালীর শ্রবণ তৃপ্ত ও মন প্রসন্ন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শান্তি দান করিয়া আসিয়াছে। রামায়ণের শান্তকরুণ কাহিনী অত্যন্ত কঠিনহৃদয় ব্যক্তির চিত্তও আর্দ্র করে। এমন কাব্য আহার ঔষধ দুইই, এক দিকে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করে, অপর দিকে অজ্ঞাতসারে শ্রোতা-পাঠকের চরিত্রগঠনে সহায়তা করে। কৃত্তিবাসের রামকথা বাঙ্গালীর প্রথম জাতীয় কাব্য। সেকালে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রোতার কাছেই যে এই কাব্যকাহিনী উপাদেয় ছিল, সেকথার সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে।

কৃত্তিবাসের কাব্যে কবির কিছু আত্মপরিচয় আছে। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। কৃত্তিবাসের এক পূর্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বসতি করেন। ইঁহার এক পৌত্র মুরারি ওঝা। মুরারির সাত পুত্র, তাহার মধ্যে একজন বনমালী। এই বনমালীই কৃত্তিবাসের পিতা। কৃত্তিবাসের মায়ের নাম মালিনী (পাঠান্তরে মানিকী)। কৃত্তিবাসেরা ছয় ভাই, আর ছিল এক বৈমাত্র ভগিনী। কোন এক বছরের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিনে রবিবারে কৃত্তিবাসের জন্ম। বার বৎসর বয়সে কৃত্তিবাস উত্তরদেশে বড়গঙ্গা পারে পড়িতে গিয়াছিলেন। সেখানে নানা শাস্ত্র পড়িয়া শুনিয়া শেষে রাজধানী গৌড়ে গেলেন। রাজসভার খাতির পাইলেই তখন কবি-পণ্ডিতের গৌরব বাড়িত। কৃত্তিবাস রাজভবনে গিয়া সাতটি শ্লোক রচনা করিয়া দ্বারীর হাতে রাজসভায় পাঠাইয়া দিলেন, বোধ করি অনুমোদনের জন্য। তখন মাঘ মাস, গৌড়েশ্বর পাত্রমিত্র লইয়া প্রাসাদের ভিতর প্রাঙ্গণে রৌদ্র পোহাইতে ছিলেন। রাজা কৃত্তিবাসকে আনিতে বলিলেন। অনেক মহল পার হইয়া কৃত্তিবাস রাজার দেখা পাইলেন এবং সেই সাতটি শ্লোক পড়িয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন। শুনিয়া খুশি হইয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে পুষ্পমাল্য ও পাটের পাছড়া দিতে আদেশ করিলেন। সভাসদদের

ইচ্ছা, কৃত্তিবাস রাজার কাছে মোটা রকম কিছু পুরস্কার চাহেন। কৃত্তিবাস নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তাঁহাকে রাজ-প্রতিগ্রহ করিতে নাই। তাই কৃত্তিবাস গৌরব করিয়া লিখিয়াছেন,

ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাঞি লই
যথা যথা যাই আমি গৌরব সে চাহি।

পাটের চাদর ও চন্দনের ছিটা-অভিষেক পাইয়াই কৃত্তিবাস খুশি হইলেন। রাজসভা-সংবর্ধিত কৃত্তিবাসের যশ শ্রীরাম-পাঞ্চালী লেখার পরে দৃঢ়তর হইয়াছিল।

কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের নাম করেন নাই, কিন্তু রাজসভার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে এবং সভাসদ্‌দের নাম হইতে মনে হয় যে, গৌড়ের সিংহাসনে তখন কোন হিন্দুভাবাপন্ন রাজা ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কংস (গণেশ) ও তৎপুত্র যদু ছাড়া অন্য কোন হিন্দু রাজা "গৌড়েশ্বর" হন নাই। সুতরাং কৃত্তিবাস, রাজা কংস অর্থাৎ গণেশের অথবা যদুর সভায় সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন,—এই অনুমান অনেকে করেন। কিন্তু রাজা যদি হিন্দু না হন তবে কৃত্তিবাসের সময় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইবে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাস তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং এই কাব্যের ভাষা পুরানো ধরণের হইবার কথা। কিন্তু কাব্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়াতে গায়কের মুখে মুখে ভাষা বদলাইতে বদলাইতে একেবারে আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য ভেজালও যথেষ্ট ঢুকিয়াছে। কৃত্তিবাসের মূল রচনার কিছুই আমরা অবিকৃতভাবে পাই নাই।

সেকালে রাজকার্যে হিন্দু কর্মচারীদের বেশ হাত ছিল। রাজা ও সুলতানের মত দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও পণ্ডিত ও কবিদের খুব উৎসাহ দিতেন। যোগ্যতা থাকিলে নিজেরাও পদাবলী অথবা পাঞ্চালী রচনা করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে এমন এক রাজকর্মচারী কবি ছিলেন, বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু। মালাধর সুলতান রুক্‌নুদ্দীন বার্‌বক শাহার কাছে "গুণরাজ খান" উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) মালাধর কৃষ্ণলীলা পাঞ্চালী রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সাত বৎসর পরে ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে) তাহা সমাপ্ত হয়। কাব্যটির নাম

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। যতদূর জানা গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাঙ্গালায় কৃষ্ণলীলাবিষয়ক প্রথম কাব্য।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় সহজ ও সুললিত রচনা। কাব্যের মধ্যে কবির ভক্তহৃদয়ের পরিচয় সমুজ্জ্বল। কাব্যটির খুব সমাদর হইয়াছিল। মালাধরের দুই পুত্র সত্যরাজ খান ও রামানন্দ যখন পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রথমবার মিলিত হন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাদের পিতার রচিত কাব্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ অনুসারে চৈতন্য সত্যরাজ খানকে এই কথা বলিয়াছিলেন—

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।
"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ।

বারবক শাহের পর শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহা গৌড়ের সুলতান হন। ইঁহার রাজ্যকাল ১৪৭৪ হইতে ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি। য়ুসুফ শাহার পর বারো বৎসর ধরিয়া গৌড়-সিংহাসনে ঘন ঘন রাজপরিবর্তন ঘটিয়াছিল। শেষ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ হোসেন খান নামক এক সাধারণ ব্যক্তি বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে এবং হিন্দু রাজকর্মচারীদের সহায়তায় রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ইনিই বাঙ্গালার সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হোসেন শাহা। হোসেন শাহার রাজ্যকালে (১৪৯৩-১৫১৮) শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক চরিত্র বাঙ্গালা দেশে যে জাগরণ-স্পন্দন তুলিয়াছিল তাহা ভারতবর্ষের অন্যত্রও অল্পবিস্তর চাঞ্চল্য জাগাইয়াছিল।

হোসেন শাহার এক সভাসদ, নাম যশোরাজ খান, একটি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পাঞ্চালী লিখিয়াছিলেন। এটির প্রায় নাম মাত্র জানা আছে।

৩. মৈথিলী সাহিত্য ও বিদ্যাপতি

পাল ও সেন বংশের রাজ্যকালে তীরহুত (মিথিলা) সংস্কৃতিতে ও আচারব্যবহারে বাঙ্গালা দেশ হইতে ভিন্ন ছিল না। বাঙ্গালা দেশের ও মিথিলার ভাষা

এক না হইলেও এতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত যে পরস্পর সহজবোধ্য ছিল। বাঙ্গালা কবিতা মিথিলায় সমাদৃত হইত এবং মৈথিলী গান বাঙ্গালায় অনুকৃত হইত। বাঙ্গালা ও মৈথিলী দুই ভাষাতেই কৃষ্ণলীলা গান লইয়া সাহিত্যের পত্তন। আর, সেই গানের আদর্শ ছিল জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলী।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কিদের দ্বারা অধিকৃত হইয়া বাঙ্গালা মিথিলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মধ্যে মধ্যে মুসলমান শক্তি-কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও পরে প্রায় দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া মিথিলার স্বাধীনতা বজায় ছিল। এই কারণে চতুর্দশ শতাব্দীতে মিথিলায় সাহিত্যচর্চার নিদর্শন অপ্রাপ্য নয়। অথচ বাঙ্গালা দেশে সমকালীন কোন রচনার সন্ধান মিলে নাই। কৃষ্ণলীলা-পদাবলী বাঙ্গালা দেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দশক হইতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু মিথিলায় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত পদাবলী পাওয়া গিয়াছে এবং ভাঙ্গা গদ্যে লেখা একটি বইও পাওয়া গিয়াছে।

মিথিলার রাজা হরিহরসিংহের মন্ত্রী উমাপতি ওঝা (উপাধ্যায়) সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় 'পারিজাতহরণ' নামে একটি সঙ্গীতনাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে একুশটি মৈথিলী গান আছে। সে পদগুলিতে উমাপতির ভনিতা, মাঝে মাঝে সেই সঙ্গে রাজার ও রাজমহিষীর উল্লেখও আছে। হরিহরসিংহ দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘ্‌লকের (১৩২০-২৪) বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মিথিলার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুপতি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কয়েকটি পদে উমাপতি ইঁহাকে "হিন্দুপতি" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

হরিহরসিংহের আর এক সভাসদ্ ছিলেন পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর, উপাধি কবিশেখরাচার্য। ইনি সংস্কৃতে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জ্যোতিরীশ্বর মাতৃভাষা মৈথিলীতে ভাঙ্গা গদ্যে একখানি বই লেখেন। এ বইটির নাম 'বর্ণরত্নাকর'। আসলে এটি কবি ও কথকদের কড়চা বা "হ্যাণ্ড বুক"। ইহাতে নগর, বাজার, রাজসভা, নায়ক, নায়িকা, প্রভাত-সন্ধ্যা ইত্যাদি বিষয়ের মামুলী বর্ণনা সংক্ষেপে দেওয়া আছে। মাঝে মাঝে বাক্য ছড়ার মত ছন্দোময়।

মিথিলার শ্রেষ্ঠ কবি এবং আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতর প্রধান কবি বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্তত

১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন। ইনি তীরহুতের একাধিক ব্রাহ্মণ-রাজার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর ভনিতায় প্রায়ই শিবসিংহের নাম আছে। ইনি কবির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বিদ্যাপতি সংস্কৃতে কতকগুলি বই লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি গল্পসঙ্কলনের বই, নাম 'পুরুষপরীক্ষা'।

বিদ্যাপতি অবহট্‌ঠ ভাষায় গদ্যে পদ্যে দুইটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কীর্তিলতা'। কীর্তিলতা ঐতিহাসিক কাব্য। কবির প্রথম জীবনের পৃষ্ঠপোষক ভ্রাতৃদ্বয় কীর্তিসিংহ-বীরসিংহের পিতা তুর্কি শাসনকর্তার হস্তে নিহত হন। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহার সহায়তায় তাঁহারা তুর্কি শাসনকর্তাকে পরাভূত করেন। ইহাই কীর্তিলতার কাহিনী। শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের রাজ্যকালে বিদ্যাপতি মাতৃভাষায় পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদে শিবসিংহের উল্লেখ আছে। কোন কোন পদে আবার রানী লখিমা (বা লছিমা) দেবীর নামও পাওয়া যায়। রাজপরিবারের বহু ব্যক্তির এবং একাধিক মন্ত্রীর ও তাঁহাদের পত্নীর নাম কতকগুলি পদে পাওয়া যায়। মনে হয় ইঁহারা সকলেই কোন না কোন সময়ে কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বিদ্যাপতির কবিতা ছন্দোঝঙ্কৃত অলঙ্কারময় ও চিত্রবহুল। বিদ্যাপতি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, তাই তাঁহার কাব্যশিল্প সংস্কৃতানুসারী। অনেক সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা হইতে বিদ্যাপতি ভাব ও রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ণনা গাঢ় সংযত ও বর্ণাঢ্য বলিয়া বিদ্যাপতির অঙ্কিত কিশোরী নায়িকার (রাধার) রূপ অত্যন্ত পরিস্ফুট। মৈথিলী ভাষার হ্রস্বদীর্ঘবহুল ধ্বনিপরম্পরা ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বিদ্যাপতির পদগুলিতে বিচিত্রভাবে তরঙ্গিত হইয়াছে।

উমাপতি-বিদ্যাপতির মৈথিলী পদাবলী বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার পার্শ্ববর্তী প্রদেশে, অর্থাৎ আসামে এবং উড়িষ্যায়, এক নূতন কাব্যভাষা ব্রজবুলির প্রচলন করিয়াছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এই সব দেশে, মৈথিল পদের অনুকরণে ব্রজবুলি পদবলী রচনায় কমবেশি উৎসাহ দেখা দিয়াছিল। তবে সব চেয়ে বেশি বাঙ্গালা দেশে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বহু বাঙ্গালী পদকর্তা বিদ্যাপতির অনুসরণে ব্রজবুলি পদাবলী লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের সভাপণ্ডিতের রচিত একটি ব্রজবুলি পদ বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি পুঁথির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এটি বাঙ্গালা দেশে লেখা প্রাচীনতম ব্রজবুলি পদাবলীর অন্যতম। হোসেন শাহার একাধিক সভাসদ্ ভালো পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ হোসেন শাহার পুত্র নসরৎ শাহার সভাতেও বর্তমান ছিলেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর তুলনায় ইহাদের একজনের রচনা নিকৃষ্ট ছিল না, সেই জন্য লোকে তাঁহাকে নাকি বিদ্যাপতি নাম দিয়াছিল। আসল এবং/অথবা এই বিদ্যাপতি বাঙ্গালাতেও পদ রচনা করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে অনেক বাঙ্গালী কবি ব্রজবুলি পদ রচনায় বিদ্যাপতির সমান দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির পদাবলী শেষ পর্যন্ত মিথিলায় টিকিয়া থাকে নাই, ছিল বাঙ্গালা দেশে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্তা এবং কীর্তনিয়াদের চেষ্টাতেই বিদ্যাপতির পদগুলি সঙ্কলিত ও সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে। চৈতন্য বিদ্যাপতির গান শুনিতে ভালোবাসিতেন। প্রধানত এই কারণেই বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা বিদ্যাপতিকে "মহাজন" অর্থাৎ বৈষ্ণব মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়াছিলেন।

৪. আসামে ও উড়িষ্যায় ব্রজবুলি-পদাবলী ও অন্য রচনা

বাঙ্গালায় যেমন, আসামেও তেমনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ হইতে ব্রজবুলি ভাষায় কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ রচনা হইতে থাকে। তবে সে সময়ে অসমীয়া বাঙ্গালা হইতে ভিন্ন হয় নাই। তখন উত্তরপূর্ব বঙ্গে যে উপভাষা প্রচলিত ছিল, মোটামুটি তাহাই আসামের ভাষার মূল। সুতরাং এই হিসাবে প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহিরে পড়ে না।

আসামে বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শঙ্করদেব চৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহারে ইঁহার মৃত্যু হয়। শঙ্করদেব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অবলম্বনে বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শ্লোক এবং ব্রজবুলি পদসংবলিত কৃষ্ণচরিত্র ও রামচরিত্র অবলম্বনে কয়েকটি "নাট" বা যাত্রা-পালাও লিখিয়াছিলেন। এই পালাগুলি এখনও নৃত্যগীত-সহযোগে অভিনীত

হইয়া থাকে। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা-সেনাপতি শুক্লধ্বজের উৎসাহে শঙ্করদেব 'রামবিজয়' নাট রচনা করিয়া গান করাইয়াছিলেন।

শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য-সহযোগী মাধবদেবও বহু কৃষ্ণলীলাত্মক পদ রচনা করিয়াছিলেন। মাধবদেবের প্রধান শিষ্য "দীন" গোপালদেব গুরুর অনুসরণে পদরচনা করিয়াছিলেন।

আসাম অঞ্চলের প্রথম রামায়ণ-পাঞ্চালীর রচয়িতা হইতেছেন মাধব কন্দলী। "শ্রীমহামাণিক্য বরাহ রাজার অনুরোধে" ইনি ছয় কাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। উত্তরকাণ্ড লিখিয়াছিলেন শঙ্করদেব। মহামাণিক্য পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন, সম্ভবত ত্রিপুরার কোন রাজা।

পণ্ডিত অনিরুদ্ধ রাজা নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতার পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতের বনপর্ব-পাঞ্চালী লিখিয়াছিলেন। শুক্লধ্বজের বদান্যতার বিষয়ে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা গদ্য করিয়া বলিতেছি। 'একদিন আমাকে তিনি অতি হর্ষমনে বলিলেন, "তুমি ভারত-পয়ার রচনা করিতে চেষ্টা কর। আমার ঘরে ভারত-পুঁথি যথেষ্ট আছে, সে সব তোমাকে দিলাম। তুমি নিজের ঘরে লইয়া যাও।" এই বলিয়া রাজা পরে বলদ জুড়িয়া পুঁথি আমার কাছে পাঠাইলেন। খাইবার সকল দ্রব্য অপর্যাপ্ত দিলেন, দাসদাসী দিলেন, আমার নাম বাড়াইলেন।'

অনিরুদ্ধের উপাধি ছিল রামসরস্বতী এবং এই নামেই তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন কালে বাঙ্গালা ও আসামের সহিত উড়িষ্যার যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। প্রতি বৎসর স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও অন্যান্য পর্ব উপলক্ষ্যে বহু তীর্থযাত্রী নীলাচলে যাইত। চৈতন্যের সময় হইতে যাত্রীদের ভিড় খুব বাড়িয়া যায়। গৌড় হইতে বরাবর সোজা রাস্তা ছিল দক্ষিণমুখে নীলাচল পর্যন্ত। দেশের সহিত খবরাখবরের ও গতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল বলিয়াই চৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পরে মায়ের অনুমতি লইয়া নীলাচলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উড়িষ্যায় হিন্দু-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এই কারণেই তখন ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সাধুসন্ন্যাসীরা নীলাচলবাস পছন্দ করিতেন।

উড়িষ্যায় সবচেয়ে পুরানো ব্রজবুলি পদ (বা গান) রাজা কপিলেন্দ্রের রচিত, অর্থাৎ তাঁহার কোন সভাকবির লেখা। কপিলেন্দ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। তাহার পরেই রামানন্দ রায়ের একটি পদ উল্লেখযোগ্য। রামানন্দ ছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, চৈতন্যের অন্যতম প্রধান অন্তরঙ্গ ভক্ত। রামানন্দ সংস্কৃত ভাষায় একটি নাটকও লিখিয়াছিলেন, নাম 'জগন্নাথবল্লভ নাটক'। ইহাতে জয়দেবের ধরণে কয়েকটি সংস্কৃত গান আছে। নাটকটি নীলাচলে জগন্নাথদেবের মন্দিরে অভিনীত হইত। চৈতন্য এই অভিনয় দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি রামানন্দের পদাবলী গান শুনিতে ভালোবাসিতেন।

উড়িষ্যার লেখা প্রথম পাঞ্চালী কাব্য হইতেছে জগন্নাথ দাসের 'ভাগবত'। বাঙ্গালা দেশের সীমান্ত ছাড়াইয়াও কাব্যটির প্রসার হইয়াছিল। জগন্নাথ দাস চৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। বলরাম দাসের 'রামায়ণ' প্রায় সমসাময়িক রচনা।

উড়িষ্যায় পদাবলীর তুলনায় পৌরাণিক আখ্যায়িকা কাব্যের বেশি সমাদর ছিল।

৫. হোসেনশাহী আমল

হোসেন শাহার রাজ্যলাভের পর দেশে বেশ কিছুদিনের জন্য শ্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হোসেন শাহার বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকে হিন্দু ছিলেন। ইঁহাদের উদ্যোগে সংস্কৃতি-সাহিত্য-চর্চায় নূতন উৎসাহ জাগিল। গৌড়-দরবারের শিক্ষিত সভাসদেরা অনেকে শাস্ত্রচর্চায় ও কাব্য-আলোচনায় রত ছিলেন। সে সময়ের দুই জন শ্রেষ্ঠ মনীষী সুলতানের মন্ত্রী ছিলেন। এই দুই ভাই পরে সংসার ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করিয়া সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী নামে পরিচিত হন। সনাতন গভীর জ্ঞানী ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিলেন। রূপ গোস্বামী পণ্ডিত, বিচক্ষণ ও কবি ছিলেন। সনাতন ও রূপ যখন গৌড়-দরবারে অধিষ্ঠিত, তখন তাঁহাদের বাসস্থান ছিল গৌড়ের নিকটে রামকেলি গ্রামে। সেকালে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল রামকেলি। ভাগবতপুরাণ-সমর্থিত বৈষ্ণবমত প্রধানত এই স্থান হইতেই বাঙ্গালা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। কৃষ্ণলীলাকাব্য ও পদাবলী

রচনার রীতি সেন রাজাদের সময় হইতে এই অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছিল। "ভাগীরথী পরিসরে" "বহুশিষ্টজুষ্টে" এই "শ্রীরামকেলিনগরে" থাকিয়া করঞ্জগ্রামীণ চতুর্ভুজ কবি 'হরিচরিত' নামে সংস্কৃতে এক কৃষ্ণলীলাকাব্য রচনা করেন। সে ১৪১৫ শকাব্দের (১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের) কথা। হোসেন শাহার এক কর্মচারী, শ্রীখণ্ডনিবাসী যশোরাজ খান, বাঙ্গালায় কৃষ্ণলীলাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের একটি ব্রজবুলি পদের ভনিতায় কবি সগৌরবে হোসেন শাহার নাম করিয়াছেন। হোসেন শাহার আরও দুইএকজন কর্মচারী গীতিকবিতা লিখিয়া যশ লাভ করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামীর 'উদ্ধবসন্দেশ' কাব্য এবং সংস্কৃত পদাবলী এইখানে থাকিতেই লেখা হইয়াছিল।

মুসলমান সভাসদেরাও পিছাইয়া রহিলেন না। হোসেন শাহার এক সেনাপতি ("লস্কর") ত্রিপুরা জয় করিয়া চাটিগ্রাম অঞ্চলে জাগীর পাইয়া শাসনকর্তারূপে বসতি করেন। ইঁহার নাম পরাগল খান। ইনি নিজের সভাকবি "কবীন্দ্র" পরমেশ্বরের দ্বারা বাঙ্গালায় ভারত-পাঞ্চালী অর্থাৎ মহাভারত-কাব্য রচনা করাইয়াছিলেন। কাব্যটির নাম 'পাণ্ডববিজয়'। লস্কর পরাগল খান মহাভারত-কাহিনীর এতটা অনুরক্ত ছিলেন যে কবীন্দ্রের কাব্য তাঁহার সভায় প্রত্যহ পড়া হইত। এইটিই বাঙ্গালায় লেখা সর্বপ্রাচীন মহাভারত কাব্য। কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল।

পরাগল খানের পুত্র—যিনি "ছুটি খান" অর্থাৎ ছোট খাঁ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন—সেই নসরৎ খানও ভারত পাঞ্চালীর মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন। ছুটি খান কবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়া জৈমিনি-ভারতের বিস্তৃততর অশ্বমেধ-পর্বের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কবীন্দ্রের কাব্যে সকল পর্বের কথাই খুব সংক্ষেপে আছে। অশ্বমেধ-পর্বের গল্প ছুটি খানের খুব ভালো লাগিত বলিয়া তিনি বিস্তৃত বর্ণনা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। ছুটি খান হোসেন শাহার ও তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহার সেনাপতি ছিলেন। শ্রীকর নন্দীর কাব্য নসরৎ শাহার রাজ্যকালে (অর্থাৎ ১৫১৮ হইতে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল।

হোসেন শাহার পুত্র নসীরুদ্দীন নসরৎ শাহাও কবিতার সমজদার ছিলেন। ইঁহার পিতার আমলের কর্মচারী শ্রীখণ্ড-নিবাসী কবিরঞ্জন তখনকার

সময়ের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। নসরৎ শাহার সময় হইতে গৌড়-দরবারে হিন্দুর প্রভাব কমিতে থাকে, তাই গৌড়ে সাহিত্যচর্চার স্রোতও মন্দীভূত হইয়া আসে।

নসীরুদ্দীন নসরৎ শাহার পুত্র আলাউদ্দীন ফীরূজ শাহা। ইনি মাস কয়েকের জন্য (১৫৩৩) গৌড়ের সিংহাসনে বসিতে পাইয়াছিলেন। পিতা-পিতামহের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ফীরূজ শাহা যুবরাজ-অবস্থাতেই কবি-পণ্ডিতের উৎসাহদাতা ছিলেন। "কবিরাজ" শ্রীধর ইঁহারই আদেশে বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি যখন লেখা হয় তখন ফীরূজ শাহা যুবরাজ। সুতরাং শ্রীধরের কাব্যের রচনাকাল ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের কিছুকাল আগেই হইবে। ফীরূজ শাহার পর তাঁহার এক পিতৃব্য গিয়াসুদ্দীন মামুদ শাহা রাজা হন। একটি ব্রজবুলি-পদে ইহার নাম উল্লিখিত আছে।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব—হোসেনশাহী আমলেই ঘটিয়াছিল।

৬. মনসামঙ্গল পাঞ্চালী

বাঙ্গালা দেশে সর্পরাজ্ঞী মনসাদেবীর পূজা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। একদা মনসাদেবী বাস্তুদেবতার ন্যায় ঘরে ঘরে পূজিত হইতেন। এখন মনসাপূজায় লোকের আগ্রহ কমিয়া গিয়াছে। মনসাপূজার সময়ে মনসাদেবীর মাহাত্ম্যখ্যাপক গীত বা পাঞ্চালী গাওয়া হইত। বাঙ্গালা দেশ হইতে এই কাহিনী-গীতি মিথিলা ও বিহার হইয়া কাশীর নিকটবর্তী অঞ্চল অবধি পৌঁছাইয়াছিল। এই পাঞ্চালীর কাহিনী কোন পুরাণে নাই, ইহার মূল আরও প্রাচীন ঐতিহ্যে প্রাপ্তব্য। মনসার গল্প সব মনসামঙ্গল কাব্যে প্রায় একই ভাবে বর্ণিত। গল্পটি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

শিবের কন্যা মনসা কালিদহে পদ্মপলাশে জন্ম লইবার পর পাতালে পৌঁছিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবয়স্ক নারীরূপ পাইলেন এবং সর্পদের আধিপত্য লাভ করিলেন। শিব তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলে গৃহিণী চণ্ডী ঈর্ষান্বিত হইলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনসা ও চণ্ডীর মধ্যে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হইল, এবং পরস্পর হাতাহাতির সময়ে মনসার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া

গেল। চণ্ডীর উপর নিদারুণ ক্রোধ লইয়া মনসা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিছুকাল পরে জরৎকারু মুনির সহিত মনসার বিবাহ হইল। আরো কিছুকাল পরে পুত্র আস্তীকের জন্ম হইল।

জনমেজয়ের পিতা সম্রাট্ পরীক্ষিৎ সর্পদংশনে দেহত্যাগ করেন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য জনমেজয় সর্পধ্বংস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সর্পেরা সমূহ বিপদ বুঝিয়া মনসার শরণ লইল। মনসা আস্তীককে জনমেজয়ের যজ্ঞস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। আস্তীক জনমেজয়কে বুঝাইয়া শুঝাইয়া যজ্ঞ বন্ধ করিলেন। কতক সাপ রক্ষা পাইয়া গেল। (এই উপাখ্যানটুকু মহাভারতে পাওয়া যায়।)

এদিকে চণ্ডীর কাছে মনসা যে অপমান পাইয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না। উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার একমাত্র উপায় হইতেছে শিবের ও চণ্ডীর ধনী ও সম্ভ্রান্ত ভক্তদিগকে ভাঙ্গাইয়া লওয়া। তাহার পূর্বে সাধারণ লোকসমাজে মনসার পূজাপ্রচার আবশ্যক। মনসা প্রথমে এই কাজে মন দিলেন। ইহাতে তাঁহার সহচরী ভগিনী নেতা পরম সহায় হইলেন। নিজের শক্তি দেখাইয়া মনসা একে একে রাখাল বালক, জেলে এবং মুসলমান চাষীর পূজা আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। তখন শিবের ও চণ্ডীর ভক্তদের ভাঙ্গাইয়া লইতে তাঁহার মন গেল। সে সময়ে সমাজে গন্ধবণিকদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। এই সমাজের প্রধান ছিল চাঁদো। নেতা ও মনসা ছদ্মবেশে আসিয়া চাঁদোর পত্নী সনকাকে মনসার পূজা শিখাইয়া দিলেন। একদিন স্ত্রীকে মনসাপূজা করিতে দেখিয়া চাঁদো ক্রুদ্ধ হইল এবং পূজার দ্রব্য সব লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। মনসা তখন চাঁদোর কাছে আসিয়া নরমগরমভাবে পূজা চাহিলেন। চাঁদো রাজি হইল না। চাঁদো কিছুতেই বাগ মানিতেছে না দেখিয়া মনসা তাহাকে শাস্তি দিয়া বশে আনিতে সঙ্কল্প করিলেন। চাঁদো ছয় পুত্র ও মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য হইতে ফিরিতেছিল। মনসার কোপে সেই ছয় পুত্র পণ্যসমেত নদীতে নিমগ্ন হইল। চাঁদো তাহাতেও দমিল না। তাহার "মহাজ্ঞান" আছে। সে মহাজ্ঞানের বলে সে ছয় পুত্রকে বাঁচাইল। মনসা তখন হীন ছলনা করিয়া চাঁদোর মহাজ্ঞান হরণ করিয়া লইলেন। তখন চাঁদো তাহার ছয় পুত্র ও ধনসম্পত্তি আর রক্ষা করিতে পারিল না। এবার নিঃস্ব, কৌপীনসম্বল হইয়া চাঁদো বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া

আসিল। তখন চাঁদোর কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর বড় হইয়াছে। খুব ধুমধাম করিয়া সুলক্ষণা বেহুলার সহিত লখিন্দরের বিবাহ হইল। চাঁদোর অশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও লৌহনির্মিত অচ্ছিদ্র বাসরঘরে লখিন্দর সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল। চাঁদোর এখন সত্যই সর্বনাশ হইল।

বয়সে বালিকা হইলেও বেহুলা বুদ্ধি ধৈর্য এবং সতীত্ব-গুণে প্রাপ্তবয়স্ক নারীর অপেক্ষাও তেজস্বিনী। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, প্রাণ যায় সেও ভালো স্বামীকে বাঁচাইতে হইবে। সর্পদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিত না, জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। বেহুলা একটি ছোট ভেলায় স্বামীর মৃতদেহ লইয়া উঠিল এবং গ্রামপার্শ্বস্থ নদীর স্রোতের মুখে ভেলা ভাসাইয়া দিল। আত্মপরিজন কাহারও প্রবোধ ও নিষেধবাক্যে সে কর্ণপাত করিল না। গাঙ্গুর নদীর স্রোত বাহিয়া ভেলা গঙ্গার দিকে চলিল। পথে নানা প্রলোভন ও ভীতি বেহুলাকে টলাইতে বৃথাই চেষ্টা করিল।

ত্রিবেণীর কিছু ভাটিতে গঙ্গাসঙ্গমে পড়িয়া বেহুলা একটি অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। এক ধোপানী শিশুসন্তান লইয়া কাপড় কাচিতে আসিয়াছে। সে প্রথমে তাহার ছেলেকে আছড়াইয়া মারিল, তাহার পর কাপড় কাচিতে লাগিল এবং সন্ধ্যাবেলায় ফিরিবার পূর্বে ছেলেটিকে বাঁচাইয়া লইল। এই দৃশ্য দেখিয়া বেহুলা ভাবিল, এ মেয়ে সামান্য নয়, ইহার সাহায্যেই সে তাহার স্বামীর প্রাণদান পাইতে পারে। পরদিন ধোপানী কাপড় কাচিতে আসিলে বেহুলা বিনীতভাবে তাহার সহিত আলাপ করিয়া তাহার হইয়া কিছু কাপড় কাচিয়া দিল। পরিচয়ে জানিতে পারিল যে ইনি স্বর্গের ধোপানী, দেবতাদের কাপড় কাচেন, ইঁহারই নাম নেতা। ইনি মনসার সহচরীও বটেন। বেহুলার কাজে ও কথায় খুশি হইয়া নেতা তাহাকে সাহায্য করিতে রাজি হইল। নেতার সঙ্গে বেহুলা স্বর্গে গেল, এবং সেখানে সঙ্গীতনৃত্যে চাতুর্য দেখাইয়া শিব ও চণ্ডী প্রমুখ দেবতাগণকে পরিতুষ্ট করিল। দেবতারা বেহুলার দুঃখের কাহিনী শুনিলেন। কিন্তু তাঁহাদের তো হাত নাই। অবশেষে তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং বেহুলার অনুনয়ে মনসার ক্রোধ প্রশমিত হইল। বেহুলা তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হোক শ্বশুরকে দিয়া মনসার পূজা করাইবে। মনসা লখিন্দরের অস্থি-অবশিষ্ট দেহে প্রাণসঞ্চার করিয়া দিলেন এবং পণ্যসম্ভারসমেত চাঁদোর বড় ছয় ছেলেকেও বাঁচাইয়া

দিলেন। বেহুলা স্বামী ও ভাসুরদের লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিল। মনসার পূজা করিতে এখন আর চাঁদোর কোন আপত্তি রহিল না।

মনসার গীত পূর্বাবধি প্রচলিত থাকিলেও, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকের আগে লেখা কোন মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া যায় নাই। অনেকের ধারণা আছে যে, বিজয় গুপ্তের কাব্যটি পুরানো রচনা। কিন্তু কাব্যটির কোন পুরানো পুঁথি পাওয়া যায় নাই। ছাপা বইয়ে বহু কবি ও গায়েনের রচনা গাঁথা আছে। সুতরাং বিজয় গুপ্তের রচনা কতটুকু খাঁটি এবং তাঁহার জীবৎকাল কখন, সে সম্বন্ধে ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। আধুনিক জনশ্রুতি অনুসারে বরিশাল জেলার মধ্যে অবস্থিত ফুল্লশ্রী গ্রামের এক বৈদ্যঘরে বিজয় গুপ্তের জন্ম হইয়াছিল। কবির পিতার নাম সনাতন; মাতার নাম রুক্মিণী। কোন এক শ্রাবণ মাসে রবিবার মনসা-পঞ্চমীর রাত্রে কবি স্বপ্ন দেখেন যে, দেবী মনসা তাঁহাকে মনসামঙ্গল পাঁচালী রচনা করিতে আদেশ করিতেছেন। তদনুসারে কাব্যটি রচিত হয়।

বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' পঞ্চদশ শতাব্দীর। রাজসভার আওতার বাহিরে লেখা ইহাই প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। ১৪১৭ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) ব্রাহ্মণ কবি বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁহার মনসাবিজয় কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তারিখ কবি এইভাবে দিয়াছেন

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।

বিপ্রদাসের নিবাস ছিল আধুনিক চব্বিশ পরগণা জেলার উত্তরপূর্বাংশে বসিরহাট মহকুমায় নাদুড়্যা-বটগ্রামে। কবির পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। কবিরা তিনচারি ভাই ছিলেন। বিপ্রদাসও স্বপ্নে মনসা-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পাঞ্চালী রচনা করিয়াছিলেন।

বিপ্রদাসের কাব্য অলঙ্কৃত নয়, কিন্তু সরল ও আন্তরিক রচনা। কাব্য-কাহিনী সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত। বিভিন্ন আখ্যানগুলি সুগ্রথিত। ইহাতে ঐতিহাসিকের প্রয়োজনীয় অনেক মূল্যবান্ তথ্য নিহিত আছে। মনসাবিজয় আগাগোড়া বর্ণনাময় সুতরাং গীতিকবিতার রস ইহাতে তেমন নাই। তবে

বর্ণনায় বাহুল্য নাই। তখনকার দিনে বাঙ্গালা দেশের প্রধান বন্দর সপ্তগ্রামের বর্ণনা বিপ্রদাসের রচনারীতির নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত করিতেছি।

ছত্রিশ আশ্রমে লোক[১] নাহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে[২] নিরন্তর
বৈসে যত দ্বিজগণ সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
তেজোময় যেন দিবাকর।
সভে দেবে ভক্তি অতি প্রতি ঘরে নানা মূর্তি
রত্নময় সকল প্রাসাদে
আনন্দে বাজায় বাদ্যি শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি
দেখি রাজা বড়ই প্রমোদে।
নিবসে যবন যত তাহা বা বলিব কত
মোঙ্গল[৩] পাঠান মোকাদীম[৪]
সৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরান রাজি
দুই ওক্ত[৫] করে তসলিম[৬]।
মসিদ[৭] মোকাম[৮] ঘরে সেলাম নমাজ করে
ফয়তা করয়ে পিত্যলোকে[৯]
বন্দিয়া মনসাদেবী কহে বিপ্রদাস কবি
উদ্ধারিহ ভকত সেবকে।।

মহাকাব্যতুল্য মনসার গাথা বিপ্রদাসের কাব্যেই সম্পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণভাবে পাওয়া গিয়াছে। তবে পুঁথি অষ্টাদশ শতাব্দীর, তাই ভাষায় খুব প্রাচীনত্ব নাই। কিছু প্রক্ষেপও আছে।

৭. বড়ু চণ্ডীদাস ও "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"

চণ্ডীদাস-ভনিতায় প্রচুর পদাবলী পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পদ অনেকদিন হইতে প্রচলিত, কিন্তু পুরানো পুঁথিতে ও বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থে অন্য কবির নামে লব্ধ। পদগুলির উৎকর্ষও একরকম নয়। কতকগুলি খুবই ভালো, আবার কতকগুলি মোটেই ভালো নয়, অত্যন্ত বাজে কবির

---

১ নানাজাতির লোক। ২ দিন কাটায়, বাস করে। ৩ মোগল। ৪ মখদুম, কর্তাব্যক্তি, মসজিদের মোল্লা। ৫ সময়। ৬ নমস্কার, নমাজ। ৭ মসজিদ। ৮ পীরের স্থান। ৯ পীরদের শিন্নি দেয়।

রচনা। ইহা হইতে বোঝা গেল যে, চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত পদগুলি এক ব্যক্তির এবং এক সময়ের রচনা হইতে পারে না।

এই ধারণা যে অযথার্থ নয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময়ে স্বর্গীয় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলায় পুরানো পুঁথির খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের ঘরে অযত্নরক্ষিত কতকগুলি পুঁথিপাতড়া পান, তাহার মধ্যে একটি পুঁথি দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল, এত প্রাচীন অক্ষরের পুথি তিনি ইতিপূর্বে কখনো দেখেন নাই। পড়িয়া তিনি দেখিলেন যে, এটি একটি অজ্ঞাতপূর্ব কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য, রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। কাব্যের ভাষা অত্যন্ত পুরানো ধরণের, এবং কাহিনীতেও অনেক নূতনত্ব আছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, পুঁথিটি খণ্ডিত। গোড়ার একখানি এবং মধ্যের ও শেষের কয়েকখানি পাতা নাই। প্রথম ও শেষের পাতা না থাকায় কাব্যের নাম, রচনাকাল ও পুঁথিলেখার তারিখ কি ছিল তাহা জানা গেল না। ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌ হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে কাব্যটি প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত হইবামাত্র পণ্ডিত এবং সাহিত্যরসিক সমাজে সাড়া পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষার এত পুরানো রূপ 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। এত প্রাচীন হাতের লেখা বাঙ্গালা পুঁথিও ইহার পূর্বে কেহ দেখে নাই। কাব্যের কাহিনীতে ও রচনায় অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। এতদিনে আসল চণ্ডীদাসের মূল কাব্য পাওয়া গেল বলিয়া প্রাচীন সাহিত্যরসিকেরা পুলকিত হইলেন, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনা করিবার উৎকৃষ্ট উপাদান মিলিল বলিয়া ভাষাবিজ্ঞানবিদেরা উৎসাহিত হইলেন। কিন্তু কিছু বিবাদেরও সৃষ্টি হইল। এই বিবাদ এখনো সম্পূর্ণরূপে মিটে নাই। যাঁহারা এতদিন আধুনিক ভাষায় চণ্ডীদাসের পদ পড়িয়া মুগ্ধ ছিলেন তাঁহারা বলিলেন, এই বিকট ভাষায় ও উৎকট রুচিতে লেখা পদ আসল চণ্ডীদাসের হওয়া সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আদিরসের ঘটা দেখিয়া কোন কোন সাহিত্যরসিক বলিলেন, এ রচনা নিতান্ত গ্রাম্যবস্তু, শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের যে পদ আস্বাদন করিতেন, সে পদ এ কবির রচনা হইতেই পারে না।

কিন্তু এই চণ্ডীদাসই যে "চণ্ডীদাস" ভনিতার শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা

হওয়া সম্ভব, তাহার একটি গৌণ প্রমাণ পাওয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি ভালো পদ রূপান্তরিত ভাষায় প্রচলিত কীর্তন-পদাবলীর মধ্যে ধরা পড়িল। চৈতন্যের সময়ে যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অজ্ঞাত ছিল না, তাহারও প্রমাণ মিলিল। চৈতন্যের এক প্রধান ভক্ত সনাতন গোস্বামী-রচিত ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী-সঙ্কলিত 'বৈষ্ণবতোষণী' নামক ভাগবতের টীকায় একস্থানে চণ্ডীদাস-বর্ণিত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড লীলার উল্লেখ রহিয়াছে। এই দুই লীলা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই মুখ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে কবির সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, তাঁহার নাম অথবা উপাধি ছিল বড়ু চণ্ডীদাস আর তিনি ছিলেন দেবী বাসলীর ভক্তসেবক। কয়েকটি পদের শেষে "অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস" এই ভনিতা আছে। এখানে "অনন্ত" এই নামটি লিপিকরের অথবা গায়কের প্রক্ষেপ বলিয়াই অনুমান হয়। চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ-কথা ও গালগল্প প্রচলিত আছে। এক প্রবাদ অনুসারে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে। আর এক প্রবাদের মতে ইনি ছিলেন বাঁকুড়ার নিকটবর্তী ছাতনা গ্রামের অধিবাসী। প্রবাদে আরও বলে যে, ইঁহার এক রজকজাতীয় সাধনসঙ্গিনী ছিলেন। এই মহিলার নাম-সম্বন্ধেও বিভিন্ন কিংবদন্তীর মধ্যে মিল নাই। এক মতে ইঁহার নাম তারা, অপর মতে রামতারা এবং তৃতীয় মতে রামী। এই সব জনশ্রুতি আংশিকভাবেও সত্য কিনা, তাহা যাচাইয়া লইবার মত কোন উপাদান এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল জানা নাই। পুঁথিতে তিন ছাঁদের লিপি আছে। একটি ছাঁদ খুব পুরানো, আর একটি ছাঁদ আধুনিক, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের। পুঁথির কাগজ ও কালি দেখিয়া বোঝা যায় যে, পুঁথির লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির মধ্যে একটুক্‌রা কাগজ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তারিখ আছে ১০৮০ মল্লাব্দ। পুঁথির লিপিকাল ইহারই কাছাকাছি।) পুঁথি যখনই লেখা হোক, মূল কাব্যটি বেশ পুরানো রচনা। তবে তাহার উপর পরবর্তী কালের ভাষার ছাপ পড়িয়াছে। যাই হোক মোটামুটিভাবে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ মূল কাব্যের রচনাকাল ধরা যাইতে পারে।

বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে একমাত্র রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ বলরামের জন্ম ও গোকুলে আগমন, এবং কালিয়দমন—শুধু এই দুইটি বিষয় প্রচলিত পুরাণ হইতে নেওয়া হইয়াছে। অপর লীলা-কাহিনীগুলি ভাগবতপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ বা হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থে যেখানে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে সেখানে নাই। তবে বাঙ্গালা দেশে যে এই দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি লীলাকাহিনী বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুরাপূরি প্রেমের কাব্য। কবির সংস্কৃত বিদ্যার অধিকার ছিল। তাহার পরিচয় কাব্য মধ্যে যথেষ্ট আছে। তবে কবিত্বের উচ্ছ্বাস বা অলঙ্কারের ঘনঘটা নাই, উপরন্তু বর্ণনায় দৃঢ়তা ও চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা যে খুব উঁচুদরের কবি ছিলেন, তাহা প্রমানিত হয় রাধার চরিত্র-চিত্রণ হইতে। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধার চরিত্র যেরূপ মানবোচিত উজ্জ্বল ও জীবন্ত, এমনটি আর কোন প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে দেখা যায় নাই। কাব্যটিতে এখনকার রুচির বিরোধী কিছু কিছু বর্ণনা থাকিলেও সবশুদ্ধ বেশ জোরালো রচনা। একটু নমুনা উদ্ধৃত করি। কাব্যের গোড়াতে, নারদ কংসকে কৃষ্ণ-অবতারের ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতেছে। নারদের মনে খুব স্ফূর্তি। সে যেন যাত্রার আসরে সঙ সাজিয়াছে।

আইলা দেবের সুমতি[১] শুনী
কংসের আগক[২] নারদ মুনী।
পাকিল[৩] দাঢ়ী মাথার কেশ
বামন শরীর মাকড় বেশ[৪]।
নাচএ নারদ ভেকের গতী[৫]
বিকৃত বদন উমত মতী[৬]।
খণে খণে হাসে বিনি কারণে
খণে হএ খোড় খণেকেঁ কানে।[৭]
নানা পরকার[৮] করে অঙ্গভঙ্গ
তাক[৯] দেখি সব লোকের রঙ্গ।

---

১ মন্ত্রণা। ২ কাছে। ৩ পাকা। ৪ বানরের মত আকৃতি। ৫ ব্যাঙের মত লাফ দিয়া। ৬ উন্মত্ত বুদ্ধি। ৭ কখনো হয় খোঁড়া কখনো হয় কানা। ৮ প্রকার। ৯ তাহাকে।

লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে
খনেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে[১০]।
উঠিআঁ সব বোলে আনচান[১১]
মিছাই মাথাএ পাড়য়ে সান।[১২]
মিলে ঘন ঘন জীহের আগ[১৩]
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।[১৪]
দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস[১৫]
বাসলী বন্দী[১৬] গাইল চণ্ডীদাস।।

আধুনিক কালের বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিলে এইরূপ হইবে—

'দেবতাদের পরামর্শ শুনিয়া নারদ মুনি কংসের কাছে আসিল। দাড়ি ও মাথার চুল পাকা, খর্ব দেহ, বাঁদরের মত ধরণধারণ। নারদ বেঙের মত (লাফাইয়া লাফাইয়া) নাচিতেছে, তাহার মুখ বিকৃত, বুদ্ধি পাগলের মত। ক্ষণে ক্ষণে বিনা কারণে হাসিতেছে, কখনও খোঁড়া সাজিতেছে, কখনও কানা হইতেছে। নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতেছে, সে সব দেখিয়া লোকের আমোদ (হইতেছে)। সে একবার লাফ দিয়া আকাশ ধরিতে যায়, আবার মাটিতে চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। উঠিয়া সব আবোলতাবোল বলে আর শুধু শুধু মাথায় টোকা দেয়। ঘন ঘন জিভের ডগা দেখায় আর বোকা ছাগলের মত রা কাড়ে। (নারদের এই ভাবভঙ্গি) দেখিয়া কংসের হাসি পাইল। বাসলী (দেবীকে) বন্দনা করিয়া চণ্ডীদাস (এই গান) গাহিল।

---

১০ চিৎ হইয়া। ১১ আবোলতাবোল। ১২ শুধুশুধুই মাথায় টোকা দিয়া সঙ্কেত করে। ১৩ জিহবার অগ্রভাগ। ১৪ বোকা পাঁঠা। ১৫ হাসি পাইল। ১৬ বন্দনা করিয়া।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ষোড়শ শতাব্দী

১. চৈতন্যদেব ও তাঁহার মহিমা

শ্রীচৈতন্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন দেশে রাজনৈতিক অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকে রাজ-সরকারের কোন না কোন বিভাগে চাকুরী করিতেন। ইঁহাদের দ্বারা সমাজে কিছু কিছু বিজাতীয় আচার আমদানী হইতে লাগিল। ক্রমশ সাধারণ লোকের মধ্যেও জীবনযাত্রায় কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। অনুন্নত সমাজের লোকেরা অনেকে প্রয়োজনের তাগিদে অথবা অবস্থাগতিকে মুসলমান ধর্ম আশ্রয় করিতে লাগিল। যে শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম-অনুগতি ও আচারনিষ্ঠা কঠোরতর হইতে লাগিল, তাহা হইতেছে ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়। ইঁহারা সমাজসংসারের দৃষ্টিতে দরিদ্র, তবে ইঁহাদের কোন আর্থিক উচ্চাশা ছিল না। তাই ইঁহারা রাজশক্তির আনুকূল্যের প্রত্যাশা রাখিতেন না। কিন্তু ইঁহাদের উৎসাহদাতা ধনী ব্যক্তিরা বিদ্যাচর্চার পোষকতায় ক্রমশ অনুৎসাহ হইয়া পড়ায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সংখ্যাও কমিয়া আসিতে লাগিল। সেন রাজাদের সময়ে বাংলার অন্যতম রাজধানী ছিল বলিয়াই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নবদ্বীপ ও আশেপাশে গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের প্রধান উপনিবেশ হইয়া দাঁড়ায় এবং বাঙ্গালা দেশের প্রধানতম বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত হয়। বাঙ্গালা দেশের বলি কেন, এক বিষয়ে নবদ্বীপ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র ছিল। সে হইতেছে নব্যন্যায়শাস্ত্রের চর্চা।

নবদ্বীপ সেকালে ছোট জায়গা ছিল না, বহু গ্রামের সমষ্টি রূপে ইহা একটি বড় শহরের মত ছিল। কিছু দূরে শান্তিপুর, তাহাও পণ্ডিতপ্রধান স্থান। একটু দূরে আম্বুয়া (এখন অম্বিকা-কালনা), সেখানে শাসনকর্তা "মুলুকপতির" থানা। আরও দূরে সপ্তগ্রাম, সেকালের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সবশুদ্ধ নবদ্বীপ ছিল যেন এখনকার শহরতলী-সমেত কলিকাতা।

নবদ্বীপের এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে চৈতন্যের জন্ম হয়

১৪০৭ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে), ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার দিনে। পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচী দেবী। চৈতন্যের ভালো নাম বিশ্বম্ভর, ডাক নাম নিমাই। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া আত্মীয়স্বজনে তাঁহাকে গোরা বা গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকিত। চৈতন্যের এক বড় ভাই ছিলেন, বিশ্বরূপ। তিনি যৌবনারম্ভের পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তখন চৈতন্য নিতান্ত বালক। বাল্যকালে চৈতন্য অতিশয় চপল ও দুর্বিনীত ছিলেন। তবুও পরিচিত অপরিচিত সকলেই এই দুর্ললিত সুন্দর শিশুটিকে না ভালো বাসিয়া থাকিতে পারিত না। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কিছুকাল পরে চৈতন্যের পিতৃবিয়োগ হয়। অল্প কিছুকাল পড়িয়াই চৈতন্য ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া টোল খুলিলেন। তাহার পর দরিদ্র ঘরের মেয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে তিনি নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহের অল্পকাল পরে তিনি বঙ্গদেশে অর্থাৎ পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও প্রচুর প্রতিপত্তি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সর্পদংশনে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারে চৈতন্য বিবাহ করিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে। এ বিবাহে তাঁহার প্রথমে মত ছিল না, কেবল মায়ের অনুরোধে করিতে হইয়াছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী ও সম্ভ্রান্ত গৃহের কন্যা।

পিতৃকৃত্য করিতে গয়ায় গিয়া চৈতন্য ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎলাভ করিলেন, এবং তথায় তাঁহার আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই চৈতন্যের হৃদয়ে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিল। তাঁহার তেজস্বীস্বভাব, পাণ্ডিত্যের গূঢ় গর্ব একেবারে মুছিয়া গেল। তিনি ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া যেন সব কিছু ভুলিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে ভাগবৎপাঠ, ভগবৎপ্রসঙ্গ ও হরিসংকীর্তন করিয়া দিনরাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া নবদ্বীপের বহু লোক ভক্তিভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। নবদ্বীপে ভক্তিপ্রচারকার্যে তাঁহার দুই প্রধান সহায় হইলেন নিত্যানন্দ এবং হরিদাস।

চৈতন্য দেখিলেন যে, শুধু নবদ্বীপে ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, সমগ্র বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালার বাহিরেও এই ধর্ম প্রচার করা আবশ্যক, নতুবা ভিন্নমুখ আচার-ব্যবহারে এবং অনাচার-অধর্মে আচ্ছন্ন খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী জনসাধারণ অন্তরে উদ্দীপনা পাইয়া

জাতিগত ঐক্যলাভ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। উপরন্তু সমস্ত দেশ নির্বীর্য হইয়া যাইবার সম্ভাবনা দিন দিন বাড়িতেছে। সাধুসন্ন্যাসী ছাড়া অন্যের কাছে লোকে ধর্মের কথা শুনিতে চাহে না। সুতরাং চৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লইলেন। তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্য। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া চৈতন্য নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা জনসাধারণের মন অবিলম্বে হরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদী দেশে কেহ রহিল না।

শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে দুই চারিদিন থাকিয়া চৈতন্য গঙ্গাতীরপথ ধরিয়া পুরীতে গেলেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া তিনি দেশ-পর্যটনে ও তীর্থদর্শনে বাহির হইলেন। প্রথম বারে তিনি সমগ্র দক্ষিণভারত, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ভ্রমণ করিলেন। দ্বিতীয় বারে বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে গঙ্গাপথ ধরিয়া শান্তিপুর হইয়া গৌড়ে পৌঁছিলেন। সঙ্গে লোকসঙ্ঘট্ট হওয়াতে তিনি সেবার গৌড়ের উপকণ্ঠস্থিত রামকেলি গ্রাম হইতেই প্রত্যাবর্তন করিলেন। রামকেলিতে হোসেন শাহার মন্ত্রী "সাকর-মল্লিক" সনাতন ও "দবীর-খাশ" রূপ এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের বৈরাগ্য জন্মিল, অল্পকাল পরেই তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিলেন। তৃতীয় বারে চৈতন্য ঝাড়িখণ্ড অর্থাৎ মানভূম-ছোটনাগপুরের অরণ্যময় পথে মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথে কাশী প্রয়াগ ইত্যাদি প্রধান প্রধান তীর্থ পড়িল। প্রয়াগে রূপের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ফিরিবার পথে কাশীতে সনাতন তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

এইরূপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া চৈতন্য সর্বজনীন ভক্তিধর্ম প্রচার করিলেন। এই প্রচার তিনি বক্তৃতা বা উপদেশবাণীর দ্বারা অথবা স্বর্গমোক্ষলাভের প্রলোভন দেখাইয়া করেন নাই। তাঁহার অমল লোকোত্তর চরিত্রের প্রভাবেই লোকে তাঁহার আচরিত ধর্ম সানন্দে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। চৈতন্য "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়"।

তীর্থপর্যটন ও গমনাগমনে ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল। জীবনের শেষ অষ্টাদশ বর্ষ চৈতন্য পুরী ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময়ে বাঙ্গালা দেশ হইতে অদ্বৈত আচার্য শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তেরা

আসিয়া মহাপ্রভু চৈতন্যের সহিত মিলিত হইতেন। এই সময়ে নীলাচলে আনন্দোচ্ছ্বাস বহিত। দিন দিন চৈতন্যের ঈশ্বরপ্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষের কয় বৎসর তিনি একরকম বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া দিব্যোন্মাদে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। অন্তরঙ্গ অনুচর ও ভক্তেরা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক শ্লোক ও গান শুনাইয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিয়া রাখিতেন। অবশেষে ১৪৫৫ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) আষাঢ় মাসে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোভাব ঘটিল। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা দেশে তাঁহার প্রভাব এতদূর ব্যাপক ও গভীর হইয়াছিল যে, জীবৎকালেই তিনি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন।

চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মপ্রচারের সহায়ক হইয়াছিলেন তাঁহার অনুচর ও ভক্তেরা। সেকালের নবদ্বীপ অঞ্চলের এবং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানের অনেক উচ্চ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী মনীষী তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। অন্য সময় হইলে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া গৃহীত হইতে পারিতেন।

অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ এবং হরিদাস চৈতন্যের আদি অনুচরদের মধ্যে প্রধান। চৈতন্যপ্রবর্তিত ভক্তিধর্মের বিস্তারের জন্য যাঁহারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখ্য ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ—ঈশ্বর পুরী, অদ্বৈত আচার্য এবং আরও দুইচারি জন। অদ্বৈত আচার্যের পিতা ছিলেন শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের রাজার মন্ত্রী ও সভাপণ্ডিত। অদ্বৈত আচার্য মহাপণ্ডিত এবং অসাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। চৈতন্যের জননী শচী দেবী ইঁহার মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। চৈতন্যের জন্মকালে অদ্বৈত আচার্যের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছিল। চৈতন্যের তিরোধানের পরেও কয়েক বৎসর ইনি জীবিত ছিলেন। চৈতন্য আচার্যকে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। আচার্যের দুই পত্নী, শ্রী দেবী ও সীতা দেবী। অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দ আকুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া চৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। ইনি গৌরাঙ্গপূজারও প্রথম প্রবর্তক। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ইঁহারই পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ চৈতন্য অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। ইঁহার জন্ম হয় আধুনিক

বীরভূমের অন্তর্গত একচাকা-খলপপুর গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী। শৈশব হইতেই নিত্যানন্দের গাঢ় ঈশ্বরানুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বাল্যাবস্থায় ইনি এক অবধুত সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং অবধুত সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। শেষে কিছুকাল কাশীতে অবস্থান করেন। তাহার পর চৈতন্যের কথা শুনিয়া বাঙ্গালা দেশে চলিয়া আসেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য নবদ্বীপে আগমন করেন। নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইয়া চৈতন্য দ্বিগুণ উৎসাহে হরিনাম ও ভক্তিধর্ম প্রচারে মন দিলেন। চৈতন্যের সন্ন্যাসের সময়ে নিত্যানন্দ সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে পুরীতে আসিয়াও কিছুকাল ছিলেন। তাহার পর চৈতন্যের অনুরোধে তিনি বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া গিয়া বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমী হইলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। সূর্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা দেবী ও জাহ্নবা দেবীর সহিত নিত্যানন্দের পরিণয় হয়। বসুধা দেবীর গর্ভে এক কন্যা গঙ্গা দেবী ও এক পুত্র বীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যের তিরোধানের কিছুকাল পরে নিত্যানন্দের তিরোধান হয়। তাহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভার্যা জাহ্নবা দেবী এবং পুত্র বীরচন্দ্র বাঙ্গালায় বৈষ্ণবসমাজের প্রধান নেতা হন।

হরিদাস অদ্বৈত আচার্যের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। যশোহর জেলায় (?) বুঢ়ন গ্রামে ইঁহার জন্ম। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি মুসলমান মাতাপিতার সন্তান। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইনি হিন্দুর সন্তান তবে পিতৃহীন হইয়া মুসলমানের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এইজন্য মুসলমান বলিয়া পরিচিত হন। যৌবনকালেই ইনি ভক্তিধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সংসার ছাড়িয়া নিঃসঙ্গ উদাসীন হইয়া দিবারাত্রি হরিনাম জপ করিয়া কাল কাটাইতে থাকেন। মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচরণ করিতে থাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিযোগক্রমে কাজী তাঁহাকে হিন্দুয়ানি ছাড়িতে আদেশ করে। হরিদাস তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তখন তাঁহার উপর অকথ্য নির্যাতন চলে। কিন্তু তাহাতেও বাহ্যজ্ঞানহীন হরিদাসের ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশেষে হার মানিয়া কাজী তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় হরিদাস কুটীর বাঁধিলেন। এদিকে মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহার নাম জাহির হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার কুটীরে

ভিড় জমিতে লাগিল। অগত্যা হরিদাস সেখান হইতে পালাইয়া শান্তিপুরে গেলেন। সেখানে অদ্বৈত আচার্য তাঁহাকে পাইয়া পরম সমাদর করিয়া কাছে রাখিলেন। এইখানে চৈতন্যের সহিত হরিদাসের মিলন হইল। হরিদাস এবং নিত্যানন্দ এই দুইজনের উপর মহাপ্রভু হরিনাম প্রচারের ভার দিলেন। ইঁহারা হার মানায়, চৈতন্য নিজে প্রভাব বিস্তার করিয়া নবদ্বীপের গুণ্ডা উচ্ছৃঙ্খল ভ্রাতৃদ্বয় জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেন। হরিদাসকে চৈতন্য অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালোবাসিতেন। সেই কারণে সন্ন্যাসের পর তিনি বৃদ্ধ হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া নীলাচলে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। হরিদাসের দেহত্যাগ হইলে চৈতন্য স্বহস্তে মৃতদেহ সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন এবং নিজে ভিক্ষা করিয়া হরিদাসের নির্বাণ-মহোৎসব করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজে তিরোধান-উৎসব ("মচ্ছব") এই হইতে শুরু।

নবদ্বীপে থাকার সময়ে চৈতন্যের অপরাপর প্রধান অনুচর ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার তিন ভাই, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব ঘোষ ও তাঁহার দুই ভাই, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত এবং আরও অনেকে।

নীলাচলে অবস্থানকালে তাঁহার প্রধান অনুচর ছিলেন স্বরূপদামোদর, রামানন্দ রায়—ইনি পূর্বে উড়িষ্যার রাজার তরফে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন—গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস, জগদানন্দ পণ্ডিত, কাশী মিশ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, পরমানন্দ পুরী এবং রঘুনাথ দাস।

রঘুনাথ দাস সপ্তগ্রামের ধনী জমিদার গোবর্ধন দাসের একমাত্র পুত্র এবং বংশের একমাত্র সন্তান। ইনি বাল্যে হরিদাসের সংস্পর্শে আসিয়া ভক্তিধর্মের দিকে আকৃষ্ট ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন হন। তাহা দেখিয়া তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত সুন্দরী কন্যা দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দেন। তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। গৃহ হইতে পলাইবার জন্য রঘুনাথ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা ছাড়া উপায় রহিল না। কিন্তু যিনি "চৈতন্যের বাতুল," তাঁহাকে ঘরে ধরিয়া রাখিবে কে? একদা রাত্রিতে প্রহরীদের ভাঁড়াইয়া তিনি পলাইলেন। চৈতন্য তখন পুরীতে। এ সংবাদ রঘুনাথ অবগত ছিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে তিনি পুরী পৌঁছিলেন বারো দিনে, পথে তিন দিন মাত্র ভোজন করিয়াছিলেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত সংবাদ

পাইয়া, তিনি গৃহে আর ফিরিবেন না জানিয়া, পুরীতে ভৃত্য পাচক ও উপযুক্ত অর্থ পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথ সে সব কিছুই নিজের জন্য লইলেন না। আহারবিহারে তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করিলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখিয়া চৈতন্য অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং নিজে কিছু উপদেশ দিয়া স্বরূপদামোদরের হস্তে তাঁহার শিক্ষা ও সাধনার ভার ন্যস্ত করিলেন। চৈতন্যের ও স্বরূপদামোদরের অন্তর্ধানের পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের আশ্রয়ে আসিয়া রাধাকুণ্ডতীরে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে থাকেন। এইখানেই অতিবৃদ্ধ বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

সনাতন ও রূপ গোস্বামী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া চৈতন্যের উপদেশে বৃন্দাবনে বাস করিলেন। এখানে ইঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনা করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রভাবে চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্ম মথুরা-অঞ্চলে পঞ্জাবে রাজপুতনায় মহারাষ্ট্রে ও সিন্ধু দেশে বিস্তৃত হইল। পাণ্ডিত্যে এবং প্রতিভায় সনাতন গোস্বামীর সমকক্ষ তখন কেহই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না,—"রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।" ইনি আবার কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। সনাতন অত্যন্ত বৈরাগ্যপরায়ণ ছিলেন, ইঁহার কুটীর তো ছিলই না, উপরন্তু এক বৃক্ষতলে একাধিক রাত্রি যাপন করিতেন না। অথচ পাণ্ডিত্যের ও আধ্যাত্মিকতার রেশটুকু ইঁহার আচরণে ছিল না। রূপ গোস্বামীও পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বশক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন বলা চলে। গৌড়ে থাকার সময়েই ইনি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক অনেক সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বৈরাগ্যগ্রহণ করিবার পর ইনি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক তিনখানি নাটক, অনেকগুলি কাব্য ও স্তোত্রকবিতা এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রের বহু প্রামাণ্য সিদ্ধান্তগ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার লেখা সবই সংস্কৃতে। রূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি' বই দুইখানি বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সনাতন এবং রূপ উভয়েই দীর্ঘজীবী ছিলেন। আনুমানিক ১৫৫৪ ও ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে সনাতনের ও রূপের তিরোভাব হয়।

সনাতন ও রূপের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহার নাম বল্লভ, চৈতন্যপ্রদত্ত নাম অনুপম। ইনি দীর্ঘায়ু হন নাই। ইঁহার পুত্র জীব জ্যেষ্ঠতাত রূপ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। ইনিও ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। বৈষ্ণবধর্মের

বহু দার্শনিক গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর তিরোধানের পর জীব গোস্বামী বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবসমাজের একচ্ছত্র নেতা হন।

সনাতন রূপ-জীবের কথা বাদ দিলে তখন বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহান্তদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস। এই ছয়জন "ষট্ গোস্বামী" নামে প্রথিত ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে লোকনাথ গোস্বামীরও নাম করা উচিত। প্রধানত এই গোস্বামীরাই বৃন্দাবনে তীর্থ সকল প্রকটিত করেন ও প্রধান প্রধান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা প্রচলিত করেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই যৌবনে অথবা বাল্যে চৈতন্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের খুব প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাঁহাদের ধনী শিষ্যেরা বৃন্দাবনে দেবমন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হিন্দু-অহিন্দু পণ্ডিত-মূর্খ উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে চৈতন্য তাঁহার ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাকে ইংরেজী মতে "রিলিজিয়ন" বা "ধর্ম" বলা বোধ হয় খুব সঙ্গত হয় না, নৈতিক ও অধ্যাত্মিক শিক্ষা বলাই ঠিক হয়। জনসাধারণের জন্য চৈতন্য যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা সর্বজনীন চিরন্তন আদর্শের অনুগত। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি-উদ্দীপনের জন্য নামসংকীর্তন—ইহারই উপর চৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। জাতিবর্ণ নির্বিচারে সকল মানুষই যে সমান আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইতে পারে, ইহা তিনি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তখনকার দিনের হিন্দুধর্মের গণ্ডীসঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়া ধর্মসাধনায় ও অধ্যাত্মভাবনায় সব মানুষের সমান অধিকার মানিয়া অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিলেন চৈতন্য তাঁহার চারিত্র্যের দ্বারা। সেই হইতে অপূর্ব প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া বাঙ্গালীর প্রতিভা কি ধর্মে, কি দার্শনিক চিন্তায়, কি সাহিত্যে, কি সঙ্গীতকলায় সর্বত্র বিচিত্রভাবে স্ফূর্ত হইতে লাগিল। ইহাই বাঙ্গালী জাতির প্রথম জাগরণ।

সকল দেশে যেমন, আমাদের দেশেও তেমনি প্রাচীন শাস্ত্র সর্বদা অনুশাসনমূলক। এইরকম ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা যে আদর্শ নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তাহা পরম্পরাগত প্রাচীন কিংবদন্তীর অথবা উপাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুপ্রাচীন সত্যযুগ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে আমরা দুর্গতির স্রোত বাহিয়া চলিয়াছি, এবং শাস্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করিলেই যে আমরা আবার

উজানে ফিরিয়া যাইব—এই বিশ্বাস শুধু প্রাচীন হিন্দুধর্মের নয়, প্রায় সকল ধর্মেরই বিশেষত্ব। চৈতন্য যে প্রেমধর্মের দৃষ্টিদান করিলেন, তাহাতে বর্তমান কাল এবং জীবিত মানুষ সর্বপ্রথম স্বমহিমায় গোচর হইল। সত্যযুগের কল্পিত মরীচিকার প্রত্যাশার মানুষ বর্তমানকে আর উপেক্ষা করিয়া রহিল না। তত্ত্বদর্শী বৈষ্ণব বলিলেন—বর্তমান কালই সাধনার কাল, যাহা করিবার তাহা তো এখনি করিতে হইবে। অতএব "প্রণমহোঁ কলিযুগ সর্বযুগসার"। সৃষ্টির পর্যায়ে প্রাণের ব্যক্ততম প্রকাশ হইয়াছে মানুষে, দেবতাকে মানুষ নিজের আদর্শেই গড়িয়াছে। সুতরাং "কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" এইরূপে আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কল্পনার অতীত হইতে বাস্তব বর্তমান কালে ঘুরাইয়া আনিয়া চৈতন্য বাঙ্গালীর চিন্তাধারা আধুনিকতার দিকে ফিরাইয়া দিলেন।

২. বৈষ্ণব গীতিকাব্য

রাজা ও রাজকর্মচারীদের সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্মেষ আরম্ভ হইয়াছিল, একথার আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্মেষ পরিপূর্ণ হইল। তাহার পর আড়াই শত তিন শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণবতা পাকারঙে লাগিয়া রহিল। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি সকলে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত অথবা বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। যাঁহারা প্রধান লেখক তাঁহাদের অনেকেই চৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্ত অথবা সাক্ষাৎ ভক্তের শিষ্যপ্রশিষ্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যের যে চিরন্তন ধারা সেই গীতিকাব্য বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা বিশেষরূপে অনুশীলিত হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব-গীতিকাব্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কাব্যকলায় চরম উৎকর্ষ প্রকাশ পাইল। এই গীতিকাব্য শুধু বাঙ্গালা ভাষাতেই রচিত হয় নাই, কিছু কিছু সংস্কৃতে, জয়দেবের অনুকরণে, রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বেশির ভাগই লেখা হইত নূতনসৃষ্ট মিশ্রভাষা ব্রজবুলিতে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। মৈথিলী ভাষায় রচিত ইঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতিকবিতা বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ

করিয়াছিল। চৈতন্যও বিদ্যাপতির গান শুনিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন। বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপতির কবিতার ঝঙ্কারে ও উজ্জ্বলতায় আকৃষ্ট হইয়া সেইমত কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। মৈথিলী ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নয়, সুতরাং তাঁহাদের লেখার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব কিছু না কিছু রহিয়া গেল। মৈথিলী-বাঙ্গালামিশ্রিত এই কাব্য ভাষা ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-গীতিকবিতার অন্যতম মুখ্য বাহন হইয়া দাঁড়াইল। সাধারণ লোকে মনে করিল যে, দ্বাপর যুগে রাধাকৃষ্ণ সম্ভবত এই ভাষাতেই কথা বলিতেন, ইহাই ছিল ব্রজের বুলি। সুতরাং এই ভাষার নাম হইল 'ব্রজবুলি', ব্রজের অর্থাৎ বৃন্দাবনের ভাষা। (বৃন্দাবনের আধুনিক কথ্যভাষার নাম ব্রজভাষা। ইহা পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষা, ব্রজবুলির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।) উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও কোন কোন বাঙ্গালী কবি ব্রজবুলিতে কবিতা রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভাষা ব্রজবুলি। ব্রজবুলির রচনার উদাহরণ পরে দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালায় এবং ব্রজবুলিতে শুধু রাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়াই পদ রচনা হইল না, চৈতন্যের জীবনকাহিনী এবং তাঁহার প্রধান প্রধান পারিষদের মাহাত্ম্য বিষয়েও গীতিকবিতা রচিত হইতে থাকে। দেবলীলা ছাড়া অন্য বিষয়ে, বিশেষ করিয়া জীবিত মানুষ লইয়া, কবিতা রচনা বাঙ্গালা সাহিত্য কেন, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করিল। বাঙ্গালা সাহিত্য এতদিন ছড়া-গান, ব্রতকথা ও দেবতার আখ্যায়িকা, বড় জোর রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী লইয়াই মশগুল ছিল। এখন ইহা উন্নত সাহিত্যের বিষয়মর্যাদা লাভ করিল। সে যুগের পক্ষে এ অসামান্য ঘটনা। চৈতন্যের বিষয়ে যাঁহারা সর্বপ্রথম পদ রচনা করেন তাঁহারা মহাপ্রভুরই পারিষদ ছিলেন। ইঁহারা হইতেছেন নরহরি দাস সরকার, বংশীবদন চট্ট, বাসুদেব ঘোষ ও তাঁহার দুই ভাই গোবিন্দ ও মাধব, এবং পরমানন্দ গুপ্ত। ইঁহাদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষ সর্বাধিক পদ রচনা করিয়াছিলেন। গোবিন্দ, মাধব ও বাসু তিন ভাইই সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। ইঁহাদের এবং অপর পদকর্তার চৈতন্য-পদাবলী গাহিয়া তবে কৃষ্ণলীলা পদাবলী কীর্তন আরম্ভ করা হয় বলিয়া চৈতন্য-পদাবলীকে "গৌরচন্দ্রিকা" বলা হয়। গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ

গৌরচন্দ্রবন্দনা পদের নমুনা হিসাবে বাসুদেব ঘোষের একটি পদ উদ্ধৃত হইল। শিশু চৈতন্যের আলেখ্য, মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়[১]
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে[২] লুকায়।
বয়নে[৩] বসন দিয়া বলে লুকাইনু
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু।
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চলচরণে
নাচিয়া নাচিয়া খঞ্জনগমনে।
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা
শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা।[৪]।।

চৈতন্যের অনুচরদের মধ্যে আরও অনেকে কবি ছিলেন, তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন দুইজন—মুরারি গুপ্ত ও রামানন্দ বসু।

নরহরি সরকারের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ডের বহু ব্যক্তি গৌড়ের রাজদরবারে চাকুরি করিতেন। সেই সূত্রে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে শ্রীখণ্ড সাহিত্যচর্চার, বিশেষ করিয়া পদাবলী-অনুশীলনের, বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। নরহরি স্বয়ং, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—হোসেন শাহার "অন্তরঙ্গ" অর্থাৎ খাশ চিকিৎসক—মুকুন্দ, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন চৈতন্যের বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। ইঁহাদের, বিশেষত নরহরির এবং রঘুনন্দনের, প্রভাবে শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবদের একটি প্রধান তীর্থস্থানে পরিণত হয়। নরহরি চৈতন্যের পূজাপ্রচারেরও অন্যতম উদ্যোক্তা। নরহরি-রঘুনন্দনের, শিষ্যদের মধ্যে বহু ভালো লেখক ছিলেন। যেমন লোচনদাস, কবিরঞ্জন, এবং "কবিশেখর রায়" উপাধিযুক্ত দেবকীনন্দন সিংহ।

নিত্যানন্দের এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভার্যা জাহ্নবা দেবীর শিষ্যদের মধ্যে সে যুগের তিন জন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন—বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস এবং জ্ঞানদাস। অন্যান্য চৈতন্য-পারিষদশিষ্যের মধ্যেও বহু কবি পাই। যেমন, নয়নানন্দ মিশ্র, শিবানন্দ চক্রবর্তী, যদুনন্দন চক্রবর্তী, উদ্ধবদাস, দৈবকীনন্দন, অনন্তদাস, চৈতন্যদাস, জগন্নাথ দাস ইত্যাদি।

১ বিশ্বম্ভর চৈতন্যের ভালো নাম (সন্ন্যাসের পূর্বে)। ২ মায়ের কাছে। ৩ বদন। ৪ লোভযুক্ত।

বৈষ্ণব-গীতিকবিরা "পদকর্তা" বা "মহাজন" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগের পদকর্তাদের মধ্যে কৃষ্ণলীলাবর্ণনায় মুরারি গুপ্ত, লোচনদাস, জ্ঞানদাস এবং বলরামদাস শ্রেষ্ঠ। লোচনদাস নাচাড়ী অর্থাৎ হাল্‌কা ছন্দের বাঙ্গালা কবিতায় বিশেষ গুণপনা দেখাইয়াছেন। সরল ভাষায় সহজ কবিত্বের দ্বারা মনের কথা প্রকাশ করিতে লোচন অদ্বিতীয়। বাৎসল্যরসের বর্ণনায় বলরামদাসের সমান নাই। জ্ঞানদাস বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষার পদেই উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। অনুরাগের ব্যাকুলতা জ্ঞানদাসের পদে যেমন সরলভাবে প্রকাশিত, তেমন পদাবলীসাহিত্যে আর কোথাও নয়। এ বিষয়ে বলরামদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের মিল আছে।

বলরামদাস নামে একাধিক পদকর্তা ছিলেন। আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনিই প্রাচীনতম। এই বলরাম এবং জ্ঞানদাস দুইজনে প্রায় একই শ্রেণীর কবি ছিলেন। দুইজনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কবিতার ভাষায়। বলরামদাস ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা দুই পদাবলীতেই স্বাচ্ছন্দ্য দেখাইয়াছেন, জ্ঞানদাস বাঙ্গালা পদাবলীতেই বেশী দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তবে এক বিষয়ে বলরামদাসের জিত। বলরাম ভালো বাৎসল্য-পদাবলী লিখিয়াছিলেন। জ্ঞানদাসের বাৎসল্য-পদাবলী খুব ভালো নয়। দুই কবির পদাবলীর উদাহরণ পরপর দিতেছি। বলরামের পদ ব্রজবুলিতে, জ্ঞানদাসের বাঙ্গালায়।

বসন্তনিশীথে বৃন্দাবনের শোভা বর্ণনা।

মধুর সময় রজনীশেষ
শোহই[১] মধুর কাননদেশ
গগনে উয়ল[২] মধুর মধুর
বিধু নিরমল-কাঁতিয়া[৩]
মধুর মালতীকেলিনিকুঞ্জ
ফুটল মধুর কুসুমপুঞ্জ
গাবই[৪] মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী
মধুর মধুহি[৫] মাতিয়া।......

---

১ শোভা পাইতেছে। ২ উদিত হইল। ৩ নির্মলকান্তি। ৪ গান করিতেছে। ৫ মধুতে

যমুনায় জল আনিতে গিয়া রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া হৃদয় হারাইয়াছেন। তিনি ঘরে ফিরিয়া সখীকে বলিতেছেন।

আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর কূলে
চিত হরি কালিয়া-নাগর নিল ছলে।
রূপের পাথারে[১] আঁখি ডুবি সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান
অন্তরে বিদরে[২] হিয়া ফুকরে[৩] পরান।...

ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থে বিবৃত কৃষ্ণলীলা লইয়া কয়খানি বৃহৎ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যও এই সময়ে রচিত হয়। চৈতন্যের অনুগৃহীত ভক্ত বরাহনগর-বাসী ভাগবতাচার্য রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবত অবলম্বনে 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী' রচনা করিয়াছিলেন। এটি পুরাপুরি বর্ণনাত্মক কাব্য। পরমানন্দ নামে এক কবিও ভাগবত অনুসরণ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম দুর্লভ। রচনাপদ্ধতি হইতে অনুমান হয় যে, এ কবিও ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কাব্যের গোড়ায় যে চৈতন্যবন্দনা আছে তাহাতে ইঁহার অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভবত ইনিই ছিলেন চৈতন্যের অনুচর পদকর্তা পরমানন্দ গুপ্ত। আর এক চৈতন্য-ভক্ত গোবিন্দ আচার্যও 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য লিখিয়াছিলেন। ভাগবত-অনুসারী হইলেও ইহাতে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড প্রভৃতি লৌকিক উপাখ্যান বাদ যায় নাই। মাধব আচার্য এবং তাঁহার কর্মচারী কৃষ্ণদাস একখানি করিয়া কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের এ কাব্য আকারে ছোট, রচনা সরল। কৃষ্ণদাসের পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম পদ্মাবতী। ইঁহাদের নিবাস ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী কোন গ্রামে। মাধব আচার্যের কাব্য চৈতন্য বর্তমান থাকা কালেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। মাধব আচার্যের কাব্যের ভাষায় ও ভাবে কবিত্বের পরিচয় আছে।

দৈবকীনন্দন সিংহ কৃষ্ণলীলা বিষয়ে চারিখানি বই লিখিয়াছিলেন।

---

১ বিস্তীর্ণ জলরাশি। ২ বিদীর্ণ হয়। ৩ ডাক ছাড়িয়া কাঁদে।

দুইখানি সংস্কৃতে। তাহার মধ্যে একখানি কাব্য, নাম 'গোপালচরিত'। একখানি নাটক, নাম 'গোপীনাথবিজয়'। তৃতীয় বইখানি পদাবলীগ্রন্থ, নাম 'কীর্তনামৃত'। শেষ বইটি কৃষ্ণলীলা-পাঞ্চালী, নাম 'গোপালবিজয়'। চারিখানি গ্রন্থের মধ্যে শুধু 'গোপালবিজয়' এবং পদাবলী মিলিয়াছে, অপর বই দুইটি লুপ্ত হইয়াছে। কবি সর্বত্র ভনিতা দিয়াছেন "কবিশেখর (রায়)" অথবা "শেখর (রায়)"। ইঁহার বাপ চতুর্ভুজ, মা হীরাবতী। ইহা ছাড়া কবির লেখা হইতে আর কোন খবর পাওয়া যায় না। কবিশেখর ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

গোপালবিজয়ের বিষয় জন্মাবধি কংসবিজয় এবং মথুরা হইতে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন পর্যন্ত কৃষ্ণলীলা। ভাগবতের অনুসারী হইলেও কবি বিষয়বিন্যাসে ও বর্ণনায় অনেক নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনাই মুখ্য। এ বিষয়ে এবং অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে গোপালবিজয়ের কিছু মিল আছে। কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহারেও তাঁহার খুব স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। প্রগাঢ় ভক্তিভাবও ছিল। কাব্যের গোড়া হইতে একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। কবিশেখর বলিতেছেন যে তিনি অশিক্ষিতের জন্যই কাব্য রচনা করিতেছেন, পণ্ডিতের জন্য নয়। আরও বলিতেছেন, কলিকালে মূর্খ লোকই বেশি। যাঁহারা পণ্ডিত আছেন তাঁহাদের শুধু পুঁথিপড়া সার, সত্যকার বিচারবুদ্ধি তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের দ্বিগুণ অহঙ্কার। লেখাপড়া করা শুধু রোজগারের জন্য,

> পুঁথিতে অভ্যাস করে ধন অর্জ্জিবার।

কলিকালে পণ্ডিতমূর্খে কোনই ভেদ নাই। পণ্ডিত সংস্কৃত জানে, মূর্খ তা জানে না, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়। কবিশেখরের মতে

> কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে যার সমতা ব্যবহার
> তাহা বই পণ্ডিত নাহিক কেহ আর।

মূর্খলোকের কাছে ভাগবতের মর্ম বোধ্য করিয়া তুলিবার জন্যই তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের অর্থ লৌকিক ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন। কেহ কেহ মনে করে যে সংস্কৃত ভাষায় কিছু আধ্যাত্মিক বা অতিলৌকিক শক্তি আছে। ইহাদের উদ্দেশ্য করিয়া কবি বলিতেছেন

লৌকিক বলিঞা না করিহ উপহাসে
লৌকিক মন্ত্রে সে সাপের বিষ নাশে।

"দুঃখী" শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' উৎকৃষ্ট কাব্য। কবির পিতার নাম শ্রীমুখ, মাতার নাম ভবানী। বাসস্থান ছিল মেদিনীপুর অঞ্চলে। অনুমান হয় যে, শ্যামদাসের পিতা আর ভারত-পাঞ্চালী রচয়িতা কাশীরাম দাসের খুল্লপ্রপিতামহ একই ব্যক্তি। তাহা হইলে কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রচনা হয়।

৩. চৈতন্যাবদান

পূর্বে বলিয়াছি যে, সমসাময়িক ব্যক্তির জীবনকাব্য লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ হইয়াছিল। চৈতন্যের অদ্ভুত চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব যেমন তাঁহার ভক্তদের তেমনি সাধারণ লোকেরও সবিস্ময় শ্রদ্ধা ও স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির উদ্রেক করিয়াছিল। তাঁহার তিরোধানের বহু পূর্বেই চৈতন্য অবতার বলিয়া সম্পূজিত হইয়াছিলেন, এবং শুধু গীতিকবিতায় নয়, বৃহৎ জীবনীকাব্যেও তাঁহার লীলাকাহিনী পরিকীর্তিত হইয়াছিল। চৈতন্যের বর্তমানকালে যে জীবনীটি রচিত হইয়াছিল তাহা সংস্কৃতে, কাব্যের আকারে, মুরারি গুপ্তের লেখনীপ্রসূত, নাম 'কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত'। তবে বইটি 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামেই প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালায় লেখা জীবনীকাব্যগুলি—দুই একখানি ছাড়া—তাঁহার তিরোধানের পরে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই লেখা ও বহুপ্রচারিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝের দিকে আরও দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থে চৈতন্যের জীবনী বর্ণিত হইয়াছিল। দুইখানিরই রচয়িতা পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর, চৈতন্যের এক প্রধান পারিষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। একখানি হইতেছে মহাকাব্য—'চৈতন্যচরিতামৃত' (১৫৪২), দ্বিতীয়খানি নাটক—'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' (১৫৭২)।

বাঙ্গালায় চৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য হইতেছে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'। বইটি চৈতন্যের বর্তমানকালে না হোক, তিরোধানের অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিত্যানন্দের আদেশে লেখা হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যের প্রথম জীবনের কাহিনী সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বইটি অতিশয় সুখপাঠ্য, মনে হয় যেন গ্রন্থকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যভাগবতে সেকালের নবদ্বীপ-অঞ্চলের সামাজিক অবস্থার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস ছিলেন চৈতন্যের মান্য প্রতিবেশী মুখ্য ভক্তদের অন্যতম শ্রীবাস পণ্ডিতের এক ভ্রাতার দৌহিত্র, এবং নিত্যানন্দের শিষ্য। বর্ণিত বিষয়ের অধিকাংশই তিনি নিত্যানন্দের মুখে শুনিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের বাল্যকথা এবং পরবর্তী কীর্তিকলাপও ইহাতে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে আছে। চৈতন্যভাগবত বড় বই। তিনখণ্ডে বিভক্ত— আদি মধ্য ও অন্ত্য। খণ্ডগুলি আবার অধ্যায়ে ভাগ করা। চৈতন্যের জন্ম হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত ঘটনা ভালোভাবেই আছে। পরবর্তী ঘটনা ধারাবাহিক নয়। চৈতন্যের শেষ কয় বছরের কোন প্রসঙ্গই নাই। শেষ অধ্যায়ে নিত্যানন্দের ও তাঁহার অনুচরদের কথা আছে। চৈতন্যের জন্মসময়ে দেশের অবস্থা কিরকম ছিল তাহার কিছু খাঁটি খবর চৈতন্যভাগবতে পাই। রচনা সহজ ও সরল। বর্ণনায় সহৃদয়তা আছে।

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' আকারে চৈতন্যভাগবতের তুলনায় অনেক ছোট। ইহা চারি খণ্ডে বিভক্ত, এবং অধ্যায়বিভাগ নাই। রচনায় কবিত্বের প্রকাশ বেশ আছে। বৃন্দাবনদাসের কাব্য রচনার কিছুকাল পরে লোচনের কাব্য লেখা হইয়াছিল। ইহাতে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। গুরু নরহরি সরকারের আদেশে লোচন কাব্যটি রচনা করেন। লোচনের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায় কোগ্রামে। পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম অভয়া দাসী। পিতৃবংশের ও মাতৃবংশের একমাত্র সন্তান ছিলেন বলিয়া বাল্যকালে লোচন শিক্ষার অপেক্ষা আদরই পাইয়াছিলেন অত্যধিক। একটু বেশি বয়সে ইনি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। তাহাও মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তের নির্বন্ধে। মাতামহের প্রতি কবি এই কথায় কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন।

মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর[১]
ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার।

লোচনের কাব্য প্রধানত মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে রচিত। চৈতন্যের সম্বন্ধে কোন নূতন কথা না থাকিলেও ইহাতে বর্ণনার বৈচিত্র্য আছে।

১ অক্ষর, বর্ণমালা।

পাঞ্চালী-গানের বিশেষ উপযোগী বলিয়া চৈতন্যমঙ্গলের বেশ সমাদর ছিল। লোচনের চৈতন্যমঙ্গল-পাঞ্চালী এখনও গাওয়া হয়।

শুধু শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনী বলিয়াই নয়, উচ্চস্তরের দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়াও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর অন্যতম। কৃষ্ণদাসের নিবাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার অনতিদূরে ঝামটপুর গ্রামে। ইনি প্রৌঢ় বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং সেখানে সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। সংস্কৃতবিদ্যায় কৃষ্ণদাসের বিশেষ অধিকার ছিল, কবিত্বপ্রতিভাও তাঁহার কম ছিল না। ইঁহার রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য 'গোবিন্দলীলামৃত' বহু বৈষ্ণব কবিকে পদাবলী রচনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

চৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক চৈতন্যভাগবতকে অনাদর করিতে পারে এই আশঙ্কায় কৃষ্ণদাস তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্যের বাল্যলীলা অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। তাহা করিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে চৈতন্যের প্রথম জীবনের বর্ণনায় বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে প্রামাণিকতা অক্ষুন্ন থাকিবে। চৈতন্যের মধ্যজীবনের অনেক কথা এবং শেষজীবনের কাহিনী যাহা আর কোথাও লেখা হয় নাই তাহা কৃষ্ণদাস নিপুণভাবে ও যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্যের শেষ কয় বৎসরের জীবনকথা জানিবার যে সুযোগ তাঁহার ছিল তাহা অন্য কাহারও ছিল না। রঘুনাথ দাস চৈতন্যের অবস্থিতিকালে নীলাচলে বাস করিতেন। তিনি স্বচক্ষে অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং পূর্ববর্তী অনেক লীলা তিনি স্বীয় গুরু, চৈতন্যের অভিন্নহৃদয় মর্মসহচর স্বরূপদামোদরের নিকট অবগত হইয়াছিলেন। এই সকল তথ্য কৃষ্ণদাস রঘুনাথের কাছে পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের ঐতিহাসিক বোধ এবং তথ্যনিষ্ঠা অতিশয় প্রবল ছিল। যখনই তিনি চৈতন্যের বিষয়ে কোন নূতন কথা বলিয়াছেন, সেইখানেই তিনি প্রমাণ দিতে ভুলিয়া যান নাই। বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত চৈতন্যচরিতামৃতে স্বল্পাক্ষরে অথচ সহজভাবে বর্ণিত থাকায় গ্রন্থটি অধ্যাত্মনিষ্ঠ ও দার্শনিক রসজ্ঞের কাছে সমাদর লাভ করিয়াছে। একাধারে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যের এমন সমন্বয় আর কোন দেশের সাহিত্যে রচিত হয় নাই।

চৈতন্যচরিতামৃত বড় বই এবং কঠিন বই। নানা শাস্ত্র ও সাহিত্যগ্রন্থ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে সে সব শ্লোকের অনুবাদ অথবা

মর্ম প্রায়ই দেওয়া আছে। বইটি তিন "লীলা"য় বিভক্ত—আদি মধ্য ও অন্ত্য। লীলাগুলি আবার পরিচ্ছেদে ভাগ করা।

চৈতন্যচরিতামৃত ষোড়শ শতাব্দীর শেষের বিশ বছরের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়। তখন কৃষ্ণদাস সুবৃদ্ধ। কোন কোন পুঁথির পুষ্পিকা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহা ১৫৩৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু নানাকারণে এ মত সমর্থনযোগ্য নয়।

জয়ানন্দ যে 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য লিখিয়াছিলেন তাহা সাধারণ লোকের জন্য, শিক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণবের জন্য নয়। সহজ কবিত্বশক্তির পরিচয় এই কাব্যে ছড়াইয়া আছে। কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে জয়ানন্দের কাব্যের উপযোগিতা ছিল না বলিয়া তাহা সমাদৃত হয় নাই। চৈতন্যের জীবনী জয়ানন্দ সাক্ষাৎভাবে অবগত ছিলেন না। বৈষ্ণব মহান্তের কাছে শোনা কথা লইয়াই তাঁহার কারবার। কিন্তু তা বলিয়া বইটির মূল্য কিছু কম নয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যের তিরোধান, তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের নামধাম ইত্যাদি দুইচারিটি নূতন কথা আছে। লোচনের কাব্যের মত জয়ানন্দের কাব্যও পুরাণের ছাঁদে লেখা। ইহাও পাঞ্চালীর মত গাওয়া হইত।

জয়ানন্দের নিবাস ছিল আমাইপুরা গ্রামে। এ গ্রাম কোথায় তা জানা যায় না। তাঁহার পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র চৈতন্যের বাল্যসহচর ও প্রধান পারিষদ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। জয়ানন্দের মাতার নাম রোদনী। জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে, যখন তিনি তিন বৎসরের শিশু তখন চৈতন্য তাঁহাদের গৃহে একবার দ্বিপ্রহরে অতিথি হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার "গুইয়া" নাম বদলাইয়া "জয়ানন্দ" রাখিয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে কোন সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে।

চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' জয়ানন্দের কাব্যের আগেই লেখা হইয়াছিল। রচয়িতা ছিলেন নিত্যানন্দ-অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য। বইটিতে নিত্যানন্দের ও চৈতন্যের বাল্যজীবন সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন কথা আছে। চৈতন্যভাগবতের মত এ বইও তিনখণ্ডে লেখা হইয়াছিল। শুধু প্রথম খণ্ডটুকু পাওয়া গিয়াছে। আর দুই খণ্ড এখন লুপ্ত।

চৈতন্যজীবনী-কাব্যের প্রসঙ্গে গোবিন্দদাসের কড়চার উল্লেখ করা উচিত এইজন্য যে অনেকে বইটিকে প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন। বইটি ছোট। রচনাভঙ্গি নিতান্ত আধুনিক, বস্তুতেও আধুনিকতা আছে। বইটিকে খাঁটি বলিয়া নেওয়া চলে না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কোন চৈতন্যজীবনী-কাব্য পাওয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখা দুই একখানি পাওয়া গিয়াছে। একটির নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী'। রচয়িতা পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ, নামান্তর প্রেমদাস। কাব্যটি কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের ভাবানুবাদ। অন্যটি, ভগীরথ বন্ধুর চৈতন্যসংহিতা (পাঠবিকৃতির ফলে 'চৈতন্যসঙ্গীতা') স্বাধীন রচনা। এ বইটি ছোট। রচনাকাল সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। গ্রন্থকার জাতিতে শাঁখারি ছিলেন। চৈতন্যসংহিতা আগমের ধরণে, অর্থাৎ হর-গৌরীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রচিত।

ষোড়শ শতাব্দীতে অন্তত চারিখানি অদ্বৈত আচার্যের জীবনীকাব্য লেখা হইয়াছিল। শেষের তিনখানিতে চৈতন্যের কথা প্রচুর থাকায় এ দুটিকে স্বচ্ছন্দে চৈতন্যজীবনীর মধ্যে ধরা চলে। শ্রীহট্ট-লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদাস নাম গ্রহণ করেন। ১৪০৯ শকাব্দে ইনি একটি ছোট সংস্কৃত গ্রন্থে অদ্বৈত আচার্যের বাল্যকথা লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী জীবনীকারেরা সকলেই এই বই হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। পরে বইটি 'অদ্বৈততত্ত্ব' নামে বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছিল।

ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' লাউড়ে বিরচিত হয় ১৪৯০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। বইটি ছোট, তবে রচনা সুললিত। চৈতন্যের সম্বন্ধেও অনেক প্রয়োজনীয় নূতন কথা ইহাতে আছে। ঈশান নাগর আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের সমবয়সী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি শান্তিপুরে আচার্যের গৃহে প্রতিপালিত হন। সেইজন্য ইনি চৈতন্যের অনেক লীলা চাক্ষুষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আচার্যের প্রথম পত্নী সীতাদেবীর আদেশে ইনি বৃদ্ধ বয়সে লাউড়ে প্রত্যাগমন করেন এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হন, আর তাঁহারই আদেশে অদ্বৈতপ্রকাশ রচনা করেন। তবে বইটি অকৃত্রিম কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হরিচরণদাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' অদ্বৈত আচার্যের উল্লেখযোগ্য জীবনী। গ্রন্থকার অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য ছিলেন। আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের আদেশে হরিচরণ অদ্বৈতমঙ্গল রচনা করেন।

অদ্বৈত আচার্যের প্রথম পত্নী সীতা দেবীর জীবনী শতাব্দীর দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছিল। বই দুইখানির নাম যথাক্রমে 'সীতাগুণকদম্ব' এবং 'সীতাচরিত্র'। প্রথমখানির রচয়িতা, বিষ্ণুদাস আচার্য, সীতা দেবীর শিষ্য ছিলেন। দ্বিতীয়খানি লোকনাথ বিরচিত। বই দুইখানিতে, বিশেষ করিয়া শেষের বইটিতে যথেষ্ট ভেজাল আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ছোটবড় বহু বৈষ্ণবতত্ত্বকথাসম্বত পুস্তিকা লেখা হইয়াছিল। লোচনদাস এইরূপ কতকগুলি ছোট বই রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'দুর্লভসার'। কবিবল্লভের 'রসকদম্ব'ও একখানি ভালো বই। এই বইটিতে অনেক নূতনত্ব আছে। কাব্য হিসাবেও রসকদম্ব উৎকৃষ্ট রচনা। রসকদম্ব-রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল ১৫২০ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে)। কবির পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী। ইঁহাদের নিবাস ছিল উত্তরবঙ্গে করতোয়া তীরে মহাস্থানের সমীপে আরোড়া গ্রামে।

৪. চণ্ডীমঙ্গল পাঞ্চালী

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল-পাঞ্চালী গান ধর্মকাণ্ডের উৎসব-আমোদ প্রকরণের মধ্যে বড় ব্যাপার ছিল। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে চৈতন্য যখন জন্ম লইলেন তখন নবদ্বীপ অঞ্চলের লোকে রাত জাগিয়া মঙ্গলচণ্ডীর গান শুনিয়া মনে করিত খুব ধর্মকর্ম করা গেল।

ধর্মকর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে[১]।

নবদ্বীপ-জীবনে চৈতন্য প্রায়ই শ্রীবাসের বাড়িতে ভক্তদের লইয়া সারারাত্রি জাগিয়া নামসঙ্কীর্তন করিতেন। শুনিয়া তাঁহার এক মদ্যপ প্রতিবেশী মনে করিয়াছিল যে মঙ্গলচণ্ডীর গান হয়। একদিন পথে চৈতন্যকে দেখিয়া

১ সারারাত জাগিয়া মঙ্গলচণ্ডীর গান শোনে। অথবা, রীতিমত অষ্টাহ (বন্দনা পালা হইতে জাগরণ পালা পর্যন্ত) চণ্ডীমঙ্গল গান শোনে।

সে বলিয়াছিল, তোমার ও গান তেমন সুবিধার নয়। যদি বল তো আমি খুঁজিয়া পাতিয়া ভালো চণ্ডীমঙ্গল-গায়ক আনাইয়া দিই।

কিন্তু চৈতন্যের সময়ে মঙ্গলচণ্ডীর গান পরবর্তী কালের বিস্তারিত ও সুসজ্জিত রূপ পাইয়াছিল কিনা জানা নাই। হয়ত তখন সংক্ষিপ্ত ব্রতকথা রূপেই ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি বলিয়া যে মানিক দত্তের নাম পাওয়া যায়, হয়ত তিনি সত্যকার মানুষ ছিলেন। তিনি গীতবাদ্যে চণ্ডীপূজার পদ্ধতি রচিয়াও থাকিবেন। কিন্তু তিনি যে চণ্ডীমঙ্গল লিখিয়াছিলেন একথা বলিবার মত কোন উপাদান নাই। মানিক দত্তের ভনিতায় একটি বড় চণ্ডীমঙ্গলের একটি মাত্র সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সে পুঁথির বয়স দেড় শত বৎসরের অনধিক। কাব্য মধ্যে চৈতন্যের বন্দনা আছে, সুতরাং রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের আগে নয়। তা ছাড়া প্রায়ই ভনিতায় দুই মানিক দত্তের নাম আছে। একজন প্রাচীন মানিক দত্ত, যাঁহার খোঁজখবর মিলিতেছে না। আর এক মানিক দত্ত প্রাপ্ত কাব্যের রচয়িতা, সম্ভবত ছদ্মনামে। এই কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা হওয়াই সম্ভব। তবে ইহার মধ্যে একটু অসাধারণ, প্রাচীন বস্তু আছে। তাহা হইতেছে প্রাচীন বা পৌরাণিক মানিক দত্তের দেবী-অনুগ্রহ লাভের আখ্যানটি।

মঙ্গলচণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা-প্রকাশই চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর মূলকথা। এই কাহিনী সংস্কৃত ভাষায় লেখা কোন প্রাচীন পুরাণে নাই। তবে অনুমান হয় যে বাঙ্গালা দেশে এই দেবমাহাত্ম্য-কাহিনী দুর্গাপূজা-অনুষ্ঠানের অঙ্গ রূপে বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটি ব্যাধ কালকেতুর রাজ্যলাভের কাহিনী, দ্বিতীয়টি বণিক্ ধনপতির বিপদুদ্ধারের উপাখ্যান। গল্প দুইটি সংক্ষেপ বলিতেছি।

দেবী চণ্ডী মর্ত্যলোকে পূজা পাইবার উদ্দেশ্য কলিঙ্গের রাজা বিক্রম-কেশরীর উপর চড়াও হইয়া তাঁহাকে দিয়া কলিঙ্গের বনমধ্যে কংস নদীর তীরে মন্দির করাইয়া পূজার যোগাড় করিলেন। দেবী বনের পশুদের অভয় দিলেন এবং তাঁহার বাহন সিংহকে পশুর রাজা করিলেন।

কালকেতু কলিঙ্গনিবাসী দরিদ্র ব্যাধ-ঘরের ছেলে, পশুপক্ষী শিকার করিয়া অতি দরিদ্রভাবে জীবিকানির্বাহ করে। মাতাপিতার মৃত্যুর পর সংসার বলিতে নিজে এবং স্ত্রী ফুল্লরা। ব্যাধকন্যা ফুল্লরা বেশ বুদ্ধিমতী ও গৃহকর্ম

নিপুণ। স্বামী বনের পশু মারিয়া আনে, স্ত্রী মাথায় বহিয়া লোকের ঘরে ঘরে ও হাটে-বাজারে মাংস ও ছাল বিক্রয় করে। কেহ নগদ কড়ি দিয়া কিনে, কেহ বা ধারে। কালকেতুর পরাক্রমে ও দক্ষতায় দেবীর আশ্রিত কলিঙ্গ-বনপশু নির্মূল হইতে চলিল। তাহারা দেবীর কাছে কাঁদিয়া গিয়া পড়িল। দেবী কালকেতুকে ব্যাধবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিবার উপায় ভাবিয়া এই স্থির করিলেন যে, কালকেতুকে রাজা করিয়া দিয়া তিনি তাহাকে পশু বধ হইতে নিবৃত্ত করিবেন এবং সেইসঙ্গে পৃথিবীতে আপন মাহাত্ম্য বিস্তার করিবেন। দেবীর মায়ায় কালকেতু মৃগয়ায় গিয়া দুই তিন দিন কিছুই পায় না। একদিন সে কিছু না পাইয়া অগত্যা একটি সোনারঙের ছোট গোসাপ ধরিয়া আনিল। ফুল্লরাকে ঘরে না দেখিয়া চালার খুঁটিতে গোসাপকে বাঁধিয়া রাখিয়া সে স্ত্রীকে খুঁজিতে বাহির হইল। কালকেতু চলিয়া গেলে দেবী সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরিয়া কুঁড়ের দাওয়ায় বসিয়া রহিলেন। ফুল্লরা সখীগৃহে চালের খুদ ধার করিতে গিয়াছিল। সে অন্যপথ দিয়া ঘরে ফিরিয়া দেবীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। বিস্ময় দমন করিয়া মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, সে কুলীনের মেয়ে, স্বামী বৃদ্ধ ও উদাসীন, ঘরে সর্বদা সতীনের কলহ। তাই সে গৃহত্যাগ করিয়া বনে বনে ফিরিতেছিল। বনে তাহাকে দেখিয়া ব্যাধ কালকেতু তাহাকে "নিজ গুণে বাঁধিয়া" ঘরে লইয়া তুলিয়াছে। শুনিয়া "আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে"। সে দেবীকে প্রাণপণে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, স্বামী যতই মন্দ হোক, ঘর যতই কলহক্ষুব্ধ হোক, স্বামীই পত্নীর একমাত্র গতি। স্বামিপরিত্যাগিনী পত্নীর ইহলোক নাই, পরলোকও নাই। আর যদি "সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে, অভিমানে ঘর ছাড় কেনি?"

তাহাতেও দেবী ভিজিল না দেখিয়া ফুল্লরা অন্য পথ ধরিল। নিজের বারোমাসের দুঃখের ফিরিস্তি দিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, তাহাদের ঘরে রহিলে তাঁহার দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। কিন্তু এত শুনিয়াও দেবী চলিয়া যাইবার ভাব দেখাইলেন না। তখন স্বামীর উপর ফুল্লরার রাগ হইল। দেবীকে আর কিছু না বলিয়া সে স্বামীকে খুঁজিয়া আনিতে চলিল। পথে দুইজনের দেখা। ফুল্লরার কাছে মেয়েটির কথা শুনিয়া কালকেতু বিষম ধাঁধায় পড়িল,—এ বলে কি? সে ত কোন মেয়েকে ঘরে আনে নাই।

দ্রুতবেগে ঘরে পৌঁছিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া কালকেতু হতবুদ্ধি হইয়া গেল। চমকের ঘোর কাটিলে সেও দেবীকে স্বামী-গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। সীতার উদাহরণ দিয়া কালকেতু বলিল, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা তোমাকে হীনজাতি ব্যাধ আমি কি উপদেশ দিব। তবে ভাবিয়া দেখ, পুরানো বস্ত্রের মত "অবলাজনের জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে।" এমন হিতবাণী শুনিয়াও মেয়েটি চুপ করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিবার জন্য ধনুকে তীর জুড়িল। কালকেতুর হাতের উপর দেবী দৃষ্টি দিলেন, তাহার হাত স্তব্ধ হইয়া গেল। শেষে দেবী আত্মপরিচয় দিয়া ব্যাধদম্পতিকে আশীর্বাদ করিলেন এবং একটি আংটি উপহার দিয়া ও নিজের স্বরূপ দেখাইয়া তাহাদের পূজা গ্রহণ করিলেন। আংটি ভাঙ্গাইয়া কালকেতু প্রচুর টাকা পাইল, আর সেই টাকায় জঙ্গল কাটাইয়া নূতন রাজ্য ও রাজধানী পত্তন করিল। নূতন রাজ্য গুজরাটে প্রজা বসিতেছে না, দেখিয়া কালকেতু দেবীকে জানাইল। দেবী নদনদীদের দিয়া কলিঙ্গে বান ডাকাইলেন। তখন বানভাসি প্রজারা দলে দলে আসিয়া জুটিল। তাহাদের মধ্যে নানাজাতির নানারকম ভালোমন্দ লোকের সঙ্গে আসিল ঠক ভাঁড়ু দত্ত। কালকেতুর কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়া মাতব্বর সাজিয়া ভাঁড়ু প্রজাদের পীড়ন করিতে লাগিল। টের পাইয়া কালকেতু তাহাকে অপমান করিয়া নিজের রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার বাসনায় ভাঁড়ু কলিঙ্গের রাজাকে উত্তেজিত করিয়া কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করাইল। কালকেতু বীরের মত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া একস্থানে লুকাইয়া রহিল। তখন ভাঁড়ু দত্ত ছলনা করিয়া ফুল্লরার কাছে সেই গুপ্ত স্থানের সন্ধান জানিয়া কালকেতুকে ধরাইয়া দিল। বিক্রমকেশরী কালকেতুকে বন্দী করিয়া কারাগারে পুরিল। কারাগারে নিতান্ত কষ্টে পড়িয়া কালকেতু দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করিতে লাগিল। দেবী রাজাকে স্বপ্নে শাসাইলেন। কালকেতুকে দেবীর বরপুত্র জানিয়া রাজা তখনি তাহাকে কারামুক্ত করিল। কালকেতু নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিল। বহুদিন রাজত্ব করিয়া আয়ুঃশেষে শাপভ্রষ্ট ব্যাধদম্পতী স্বর্গে ফিরিয়া গেল। ইহাই চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের প্রথম উপাখ্যান— "আখেটিক-খণ্ড"।

গাঙ্গুর নদীর তীরে উজানী নগরে এক ধনবান্ বণিক্ ছিল, নাম ধনপতি। প্রথম পত্নী লহনা নিঃসন্তান। এই অছিলায় ধনপতি লহনার খুড়তুতা

ভগিনী খুল্লনাকে দেখিয়া ও তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিল। বিবাহের অল্পকাল পরেই রাজার ফরমাশ খাটিতে তাহাকে বিদেশে গিয়া কিছুকাল থাকিতে হইল। এই অবসরে দাসী দুর্বলার ইঙ্গিতে ও ব্রাহ্মণী সখী লীলাবতীর মন্ত্রণায় লহনা ভগিনী-সপত্নীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতে থাকিল। অন্নবস্ত্রের কষ্টের কথা দূরে থাক, খুল্লনাকে মাঠে ছাগল চরাইতে বাধ্য করা হইল। বনমধ্যে ছাগল চরাইতে চরাইতে একদিন একটি ছাগল হারাইয়া যায়। ছাগল খুঁজিয়া না পাইলে সপত্নী তাহাকে যাহা-নয়-তাহাই করিবে, এই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া খুল্লনা ছাগল খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। এমন সময়ে দেখিল যে বনমধ্যে একস্থানে কতকগুলি মেয়ে ঘট পাতিয়া মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতেছে। (ইহারা চণ্ডীর অনুচরী বিদ্যাধরী। খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা শিখাইবার জন্যই ইহারা দেবীকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল।) ইহাদের কথায় খুল্লনা সেইখানেই পূজা করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত গ্রহণ করিল। তখনি দেবী প্রসন্ন হইলেন। অবিলম্বে হারানো ছাগল ফিরিয়া আসিল। তাহার পর ধনপতি দেশে ফিরিলে খুল্লনার দুখের রাত কাটিয়া গেল। কিন্তু সুখের দিনও স্থায়ী হইল না। খুল্লনা বনে বনে একাকিনী ছাগল চরাইয়াছে, সুতরাং তাহার চরিত্র শঙ্কনীয়,—এই বলিয়া ধনপতির কুটুম্বেরা ঘোঁট পাকাইল। খুল্লনা একের পর এক কঠিন পরীক্ষা দিয়া তাহার সতীত্ব প্রতিপন্ন করিল। কিছুদিন পরেই ধনপতিকে বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রপথে সিংহল যাত্রা করিতে হইল। খুল্লনা তখন সন্তানসম্ভাবিত। যাত্রার আগে শিবভক্ত ধনপতি পত্নীকে পূজা করিতে দেখিয়া ক্রোধে মঙ্গলচণ্ডীর ঘটপায়ে ঠেলিল। ধনপতির উপর দেবী ক্রুদ্ধ হইলেন। বাণিজ্যতরীগুলি অজয় ও ভাগীরথী বাহিয়া সমুদ্রে পড়িয়া যখন সিংহলের কাছাকাছি আসিয়াছে, তখন ধনপতি সমুদ্রগর্ভে কালিদহে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইল,—প্রস্ফুটিত সুবৃহৎ পদ্মের উপর বসিয়া এক সুন্দরী কন্যা একটি (বা দুইটি) হস্তীকে ধরিয়া একবার গ্রাস করিতেছে, পরক্ষণে উদ্গীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু এ অদ্ভুত দৃশ্য ধনপতি ছাড়া আর কেহই দেখিতে পাইল না। সিংহলে পৌঁছিয়া ধনপতি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথারীতি উপঢৌকন দিয়া তাঁহাকে খুশি করিল এবং জিনিসপত্র বেচা-কেনা করিতে লাগিল। দুরদৃষ্টক্রমে ধনপতি একদিন কথাপ্রসঙ্গে রাজার কাছে সমুদ্রবক্ষে সেই অপূর্ব "কমলে কামিনী" দৃশ্যের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন অসম্ভাব্য

ব্যাপার শুনিয়া রাজা হাসিয়া উঠিল। রাজার উপহাসে ধনপতির রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রতিজ্ঞা করিল যে, রাজাকে এই দৃশ্য দেখাইবেই, না দেখাইতে পারিলে আমরণ কারাবাস স্বীকার করিবে। বাজি রাখিয়া রাজা ও ধনপতি কালিদহে গেল, কিন্তু সে দৃশ্য দেখা গেল না। ধনপতিকে মিথ্যাবাদী ভণ্ড বলিয়া রাজা তাহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল। (এ সবই দেবীর চক্রান্ত, তিনি ধনপতিকে কষ্ট দিয়া আপন ভক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।) এদিকে উজানীতে খুল্লনা পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। পুত্রের নাম রাখা হইয়াছে শ্রীপতি (বা শ্রীমন্ত)। পিতৃহীন শিশু মাতার ও বিমাতার যত্নে বাড়িয়া উঠিল এবং গুরুর কাছে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। তার্কিক বালক একদিন পুরাণের কথাপ্রসঙ্গে তর্ক উঠাইয়া ব্রাহ্মণজাতির সম্বন্ধে একটু কটাক্ষ করায় গুরু ইঙ্গিতে তাহাকে জারজ বলিল। ইহাতে শ্রীপতি পিতার সন্ধানে যাইতে অধীর হইল। তাহার জেদে খুল্লনা সমুদ্রযাত্রায় সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিল না। শ্রীপতি পিতার মতই বাণিজ্যতরী লইয়া সিংহল উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সিংহলের উপকূলের নিকটে সেও সেই অদ্ভুত "কমলে কামিনী" দৃশ্য দেখিল, এবং সিংহলে পৌঁছিয়া শ্রীপতি পিতার মতই হঠকারিতা করিয়া রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। এবারে কথা রহিল, না দেখাইতে পারিলে প্রাণদণ্ড হইবে। বলা বাহুল্য, শ্রীপতিও রাজাকে সে দৃশ্য দেখাইতে পারিল না, এবং তাহার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল। ওদিকে ঘরে বসিয়া খুল্লনা প্রবাসী তনয়ের কল্যাণ কামনা করিয়া একমনে দেবীকে স্মরণ করিতেছে। এইবার পিতাপুত্রের প্রতি দেবীর প্রসন্নতা জাগিল। শ্রীপতিকে শূলে চড়াইবার জন্য যখন মশানে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন দেবী শ্রীপতির অতিবৃদ্ধপিতামহী রূপে আসিয়া প্রথমে কোটালের কাছে পরে রাজার কাছে নাতির প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। কোটাল ও রাজা রাজি হইল না। দেবী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ভূত-প্রেত-পিশাচ সেনাকে রাজধানী আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। অল্পকাল মধ্যেই রাজসৈন্য পরাজিত হইল। দৈবী মায়া বুঝিতে পারিয়া রাজা শ্রীপতিকে ছাড়িয়া দিয়া দেবীর প্রসন্নতা মাগিলেন। শ্রীপতি প্রথমেই পিতাকে মুক্ত করিতে কারাগারে গেল। অন্ধকারার মধ্যে পিতাপুত্রের প্রথম মিলন হইল। দেবীর আদেশে রাজা তাঁহার কন্যা সুশীলার সহিত শ্রীপতির বিবাহ দিলে

পর, পুত্র পুত্রবধূ এবং প্রচুর ধনরত্ন ও পণ্যদ্রব্য লইয়া ধনপতি দেশে প্রত্যাগমন করিল। বিক্রমকেশরীও তাঁহার কন্যাকে শ্রীপতির হাতে সমর্পণ করিলেন। দেবীর অনুগ্রহে পুত্র-পরিবার লইয়া ধনপতি সুখে দিন যাপন করিতে লাগিল। আয়ুঃশেষ হইলে খুল্লনার শাপমোচন হইল। সে স্বর্গে ফিরিয়া গেল। ইহাই চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের দ্বিতীয় উপাখ্যান—"বণিক্-খণ্ড"।

উপাখ্যান দুইটির উৎপত্তি এক নয়। কালকেতুর কাহিনী আসিয়াছে বাঙ্গালা দেশের জাঙ্গলপ্রত্যন্তের প্রাচীন কিংবদন্তী হইতে। হলুদে গোসাপ যে একদা কোন কোন জাতির মধ্যে ইষ্টদেবীর প্রতীক, অস্ত্র অথবা বাহন ছিল, এই কাহিনীতে তাহারি ইঙ্গিত রহিয়াছে। বিন্ধ্যবলয়ের (অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য-মধ্যভারত-মধ্যপ্রদেশ-ছোটনাগপুরের ও উড়িষ্যার) এবং বাঙ্গালার স্থাপত্যশিল্পে অঙ্কিত দেবীর গোধা-অস্ত্রে ও গোধা-আসনে এই অনুমানের সুনিশ্চিত প্রমাণ মিলে। নবম-দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বহু চণ্ডিকা-মূর্তির পাদদেশে গোধিকা অঙ্কিত দেখা যায়। কালকেতুকে বরদানকারিণী দেবী পৌরাণিক মহিষমর্দিনীর রূপ ধরিয়াছেন, কিন্তু আসলে তিনি পশুমাতা বনদেবী বিন্ধ্যবাসিনী। ঋগ্‌বেদে ইঁহাকে বহু-অন্নদাত্রী মৃগমাতা অরণ্যানী বলা হইয়াছে। মনে হয়, এই কাহিনীর মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ের আরণ্য অঞ্চলে বসতি স্থাপনের ও বনদেবী পূজা-প্রচলনের ইতিহাস লুকানো আছে। কলিঙ্গনিবাসী যোদ্ধা ব্যাধ জাতির ইষ্টলাঞ্ছন ("টোটেম") যে গোসাপ ছিল, তাহা জানিতে পারি কোনারকের একটি মূর্তি হইতে। মূর্তিটি এক যোদ্ধার, অবিকল কালকেতুর মত। যোদ্ধার ঢালে গোসাপের মূর্তি আঁকা আছে। ঠিক এমনি যোদ্ধার মূর্তি বিষ্ণুপুরের প্রাচীন মন্দিরগুলির গায়ে পোড়ামটিতেও উৎকীর্ণ আছে।

ধনপতির কাহিনী আসলে মেয়েলি ব্রতকথা ও রূপকথার ধরণে গড়া, অনেকটা মনসামঙ্গল-কাহিনীরই মত। দেবী প্রথমে বণিক্-গৃহিনীর পূজা পাইয়া, তাহার পর জবরদস্তি করিয়া গৃহপতির নতি আদায় করিয়াছেন। খুল্লনার পূজিত মঙ্গলচণ্ডীও বনদেবী, তবে ইনি গোধা-লাঞ্ছন পশুমাতা নহেন। ইঁহার সগোত্র হইতেছে শাখোটবৃক্ষবাসিনী বনদুর্গা। এ মঙ্গলচণ্ডী মেয়েলি ব্রতের দেবতা, আটগাছি দূর্বা ও আটটি ধান দিয়া পূজা করিতে হয়। ইনি তুষ্ট হইলে "হারা দেওয়ান"।

মাধব আচার্যের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫০১ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ)। কবির পিতার নাম পরাশর। নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে। বাঙ্গালা দেশ তখনও সবটা আকবরের অধীনে আসে নাই। অথচ মাধব আচার্য আকবরকে বিক্রমে অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তাই ইহা হইতে কাব্যটির রচনাকাল সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। মাধব আচার্যের কাব্য পূর্ববঙ্গেই প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গের কবির কোন পুথি পশ্চিমবঙ্গে মিলে নাই, আশ্চর্যের কথা। অনুমান হয় যে, মাধব আচার্য দেশত্যাগ করিয়া গিয়া পূর্ববঙ্গে বসতি করেন। মাধব আচার্য-প্রণীত একটি গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক গঙ্গামঙ্গল-কাব্য পাওয়া গিয়াছে। কাব্যটি ছোট। এই মাধব আচার্য এবং চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের রচয়িতা একই ব্যক্তি কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই।

মাধব আচার্যের চণ্ডীমঙ্গল মানিক দত্তের ও কবিকঙ্কণের-কাব্যের তুলনায় অনেক ছোট। ইহাতে শিবায়ন অর্থাৎ হর-গৌরীর কাহিনী নাই। কালকেতুর কাহিনীও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরামের উপাধি ছিল "কবিকঙ্কণ"। এই উপাধিনামেই তিনি সমধিক পরিচিত। নিঃসন্দেহ, মুকুন্দরাম প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। মুকুন্দরামের কাব্যে পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় রহিয়াছে। ব্যক্তি- ও সমাজ-জীবনের চিত্রাঙ্কনে পুরানো সাহিত্যে মুকুন্দরামের দক্ষতার তুলনা নাই।

মুকুন্দরামের কাব্যে একটি বেশি খণ্ড আছে। সেটি "দেবখণ্ড", প্রথমেই আছে। দেবখণ্ডটুকু আসলে শিবায়ন, শিব-সতী-পার্বতীর কাহিনী। সম্ভবত কবির এটি স্বাধীন বাল্যরচনা, পরে অপর দুই খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে।

মুকুন্দরামের পিতা হৃদয় মিশ্র, মাতা দৈবকী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ রমানাথ (মতান্তরে রামানন্দ)। বহুপুরুষ হইতে ইঁহাদের নিবাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলার দক্ষিনপূর্বসীমান্তে দামুন্যা বা দামিন্যা (এখন দামিনে) গ্রামে। গ্রামের উত্তরপ্রান্তবাহিনী স্রোতস্বিনীর তীরে গ্রামদেবতা চক্রাদিত্য ঠাকুর অধিষ্ঠিত ছিলেন। বংশানুক্রমে কবিরা চক্রাদিত্যের সেবক ছিলেন। মুকুন্দরাম বাল্যকাল হইতে ঠাকুরসেবার কাজ করিতেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন

গঙ্গা-সম নিরমল তোমার চরণজল
পান কৈনু শিশুকাল হৈতে
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন এক দিকে পাঠান-শক্তির অস্তগমন অপর দিকে মোগল-শক্তির উদ্‌গমন, তখন পশ্চিম বঙ্গে যে রাষ্ট্রসঙ্কট ও আর্থিক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল, তাহার জ্বলন্ত বর্ণনা মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীতে পাই। রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া মুকুন্দরাম সাত পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার বর্ণনায় ভুক্তভোগীর তপ্ত বেদনা স্পন্দমান। এই আত্মকাহিনীর পরিচয় দিতেছি।

সেলিমাবাদ-শহরবাসী গোপীনাথ নিয়োগীর তালুক দামুন্যায় কবিবংশ চাষবাস করিয়া স্বচ্ছন্দে ছয়-সাত পুরুষ বাস করিতেছিলেন। পরবর্তী কালে রাজা মানসিংহের সুশাসন স্মরণ করিয়া কবি দুঃখের সহিত বলিয়াছেন যে, যখন তিনি গৃহত্যাগ করেন তখন রাজা অধার্মিক, প্রজা দুর্গত, শাসনকর্তা খেয়ালী, কর্মচারীরা অত্যাচারী। কাহারও স্বস্তি নাই। ব্রাহ্মণ উপেক্ষিত, বৈষ্ণব লাঞ্ছিত, সওদাগর-ব্যাপারী উৎখাত—অবিচারের চূড়ান্ত। জমি লম্বালম্বি না মাপিয়া বড় দেখাইবার জন্য কোণাকোণি মাপা হইতে লাগিল। উর্বর জমির হারে পতিত ভূমির খাজনা ধার্য হইল। সর্বত্র ঘুষ দিতে হইত, এমন কি কাজ না পাইলেও। টাকা ভাঙ্গাইতে গেলে বাটা লাগিত আড়াই আনা। ঋণ করিলে টাকা-পিছু প্রত্যহ এক পাই করিয়া সুদ লাগিত। রোজ মাহিনা স্বীকার করিলেও মজুর মিলে না। অস্থাবর সম্পত্তির কিছুমাত্র দর নাই,— "ধান্য গোরু কেহ নাহি কিনে।" কবির মুরুব্বি গোপীনাথ নন্দীও "বিপাকে হইলা বন্দী, কোন হেতু নাহি পরিত্রাণে।" দেশ ছাড়িয়া সহজে পালানোর উপায় নাই। "পেয়াদা সবার কাছে প্রজা পালায় পাছে, দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।" প্রজাবর্গ ব্যাকুল হইয়া অগত্যা ঘরের কাঠকটোরা বেচিয়া খাজানা মিটাইতে চায়, কিন্তু দাম উঠে না—'টাকাকের বস্তু দশ আনা"।

গোপীনাথ নন্দীর তালুক বাজেয়াপ্ত হওয়ায় সেই তালুকের জমি, যাহা মুকুন্দরামেরা ভোগ করিতেছিলেন, তাহাও অধিকারচ্যুত হইল। সংসার

চালাইবার আর কোন উপায় রহিল না। ভিটার মায়া ত্যাগ না করিলে উপবাসে মরিতে হইবে। সুতরাং প্রতিবেশী ও বন্ধুদের পরামর্শে মুকুন্দরাম গ্রাম ছাড়িবার সংকল্প করিলেন। স্ত্রী শিশুপুত্র ভাই রমানাথ (পাঠান্তরে রামানন্দ) ও অনুচর ডামাল নন্দীকে সঙ্গে লইয়া কবি একদিন ঘর ছাড়িয়া চলিলেন। যা-কিছু টাকাকড়ি সব ভাইয়ের হাতে ছিল। তেলিয়া-ভেলিয়া গ্রামের উপকণ্ঠে বিস্তীর্ণ জলা মাঠ, সেখানে ডাকাইতের উপদ্রব। রাম রায় (পাঠান্তরে রূপ রায়) সে সামান্য টাকাকড়িও কাড়িয়া লইল। যদু কুণ্ডু নামে এক গৃহস্থ নিজের ঘরে তাঁহাদের আশ্রয় দিল। কবি বলিতেছেন

ভাই নহে উপযুক্ত রাম রায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা
লইয়া আপন ঘর নিবারণ কৈল ডর
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা।

তিন দিন যদু কুণ্ডের আতিথ্য উপভোগ করিয়া মুকুন্দরাম আবার পথে পা দিলেন। সামনেই পড়িল মুড়াই (এখন মুণ্ডেশ্বরী) নদী। সে নদী পার হইয়া কবি ভেঙুটিয়া গ্রামে পৌঁছিলেন। তাহার পর দ্বারকেশ্বর উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন পাতুল গ্রামে। এখানে বোধহয় কবির মামার বাড়ি ছিল। সেখানে মাতুলপুত্র গঙ্গাদাস যত্ন করিয়া কিছু দিন রাখিল। পরে (রূপ) নারায়ণ পরাশর ও দামোদর—এই তিন নদী পার হইয়া তাঁহারা গোচড়্যা গ্রামের উপকণ্ঠে হাজির হইলেন। দুপুরে এক পুকুরের পাড়ে আশ্রয় নেওয়া হইল। কবি ও তাঁহার বয়স্ক সঙ্গীরা পুকুরের জল পান করিয়া পেট ভরাইলেন, কিন্তু "শিশু কাঁদে ওদনের তরে"। তেল নাই সুতরাং রুক্ষ স্নান করিয়া আসিয়া মুকুন্দরাম শালুকের ডাঁটা ("নাড়া") নৈবেদ্য করিয়া শালুক ফুলে গৃহদেবতার পূজা করিলেন। তাহার পর ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমে নিতান্ত শ্রান্ত কবি সেইখানেই শুইয়া পড়িলেন এবং ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন,—যেন মায়ের রূপ ধরিয়া দেবী চণ্ডী তাঁহার শিয়রে আসিয়া বসিয়াছেন আর কানে মন্ত্র দিতেছেন এবং মন্ত্র দিয়া দেবী কবিকে আশীর্বাদ করিয়া "আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত"।

চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে মুকুন্দরাম মনে জোর পাইলেন। অতঃপর শিলাই নদী পার হইয়া ব্রাহ্মণভুম পরগনায় আরড়া গ্রামে গিয়া রাজা বীর-বাঁকুড়া

রায়ের সভায় উপস্থিত হইলেন। মুকুন্দরামের পাণ্ডিত্যে ব্যক্তিত্বে ও কবিত্বে প্রীত হইয়া বাঁকুড়া রায় তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দশ আড়া (অর্থাৎ সাড়ে বাইশ মণ) ধান দিবার হুকুম দিয়া তাঁহার হাতে পুত্র রঘুনাথের শিক্ষার ভার দিলেন। এখন হইতে মুকুন্দরামের আর অন্নচিন্তা রহিল না।

এইরূপে অনেক কাল কাটিয়া গেল। বয়ঃপ্রাপ্ত রঘুনাথ পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইলেন (১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) এবং কবিকে "গুরু করি করিল পূজিত"। দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা মুকুন্দরামের মনে ক্বচিৎ উদয় হয়। অনুচর ডামাল নন্দী এ স্বপ্নের কথা জানিত। সে প্রায়ই স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু কাব্য রচনা শেষ করিতে কবি আর সময় পান না। পিতার মৃত্যুর পর রঘুনাথ রাজা হইয়া তাঁহাকে পুনঃপুন অনুরোধ করিতে লাগিলে তবেই কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা শেষ করিলেন। রাজা রঘুনাথ খুশি হইয়া কবিকে সেকালের নিয়মমত বসনভূষণ ইত্যাদি দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কাব্যটি গান করিয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহারাও বঞ্চিত হইলেন না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল সর্বপ্রথম কামেশ্বর শিবের মন্দিরে গাওয়া হইয়াছিল এবং মূল গায়েন ছিলেন প্রসাদ,—একথা মুকুন্দরাম নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। অতঃপর মুকুন্দরাম আরড়াতেই বাস করিতে থাকেন।

আত্মজীবনীর মধ্যে মুকুন্দরাম "গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ" মানসিংহের নাম করিয়াছেন। মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদারি পান ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং কাব্যটি ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তাহার কাছাকাছি সময়ে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মনে হয়, দেশে থাকিতেই কবি কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথম খণ্ডটি সম্ভবত দেশেই লেখা। দেবীর স্বপ্ন পাইয়া দেবীমাহাত্ম্য খণ্ড দুইটি আরড়ায় রচিত ও যুক্ত হয়। আত্মকাহিনী আরও পরে লেখা।

মুকুন্দরামের কাব্যের প্রথম খণ্ড শিব-সতী-পার্বতীর উপাখ্যান। এই খণ্ডের আত্মকাহিনীতেই কবি লিখিয়াছিলেন "কবি হৈয়া শিশুকালে রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে"। কাব্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড দেবী চণ্ডীর কাহিনী এবং এই অংশই আসল। চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী দুইটিতে প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্গালাদেশের সাধারণ লোকের জীবনসংস্থানের বিবিধ চিত্র আঁকা আছে। দেউল-নির্মাণ হইতে নগরপত্তন, পাখী-মারা হইতে সমুদ্রবাণিজ্য, যুদ্ধযাত্রা হইতে গ্রাম্য দলাদলি, দাম্পত্যকলহ হইতে কুটুম্বের ঘোঁট, ব্যাধের সরলতা হইতে গৃহস্থের শাঠ্য, নিঃস্বের জীর্ণ কুটীর হইতে রাজার প্রাসাদ—জীবনের বহিরঙ্গ অনেক

ব্যাপারই মুকুন্দরামের কাব্যে গাঁথা পড়িয়াছে। এমন কি, বনের পশুও তাঁহার সহৃদয় লেখনীমুখে মানুষের মত ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত। কালকেতুর শিকারের দাপটে কলিঙ্গের বন উজাড় হইতে চলিয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া পশুরা দেবীর দেউলে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধরনা দিয়া পড়িল। সিংহ বলিতে লাগিল, তুমিই আমাকে রাজটীকা দিয়া পশুরাজত্বে অভিষিক্ত করিয়াছ, এখন কেন "অপরাধ বিনা মাতা দূর কৈলা দয়া"। ভালুকের কাতর নিবেদন, আমি সামান্য জীব, উই-পিঁপিড়া খাইয়া প্রাণধারণ করি। আমি তো বড়লোক নই, "নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক"। তবে কেন "সবংশে মজিলুঁ মাতা তোমার আশ্বাসে"। হস্তিনীর কাতর বিলাপ

> শ্যামলসুন্দর প্রভু কমললোচন
> ভুরু কামধনু সম মদনমোহন।
> কাননে করয়ে আলো কপালের চাঁদে
> সঙরি সঙরি তনু প্রাণ মোর কান্দে।
> বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর
> লুকাইতে স্থান নাহি বীরের গোচর।
> পলাইয়া কোথা যাই কোথা গেলে তরি
> আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি।

বিপদ সবচেয়ে বেশি নানাজাতি হরিণের। কাহারও ঝাড়ওয়ালা শিঙ, কেহ বা বায়ুগতি, কেহ বা ঘোড়ার মত বিশালদেহ।

> বারশিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকান[১]
> ধরণী লোটায়্যা কান্দে করি অভিমান।
> কেনে হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে
> হইনু আপন বৈরী আপনার মাংসে।[২]

মুকুন্দরাম যেন আপনার জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতাই পশুবাণীরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এমনি সহৃদয় মানবিকতায় কাব্যটি আকীর্ণ।

---

১ নানারকমের হরিণ। যাহার ডালপালাওয়ালা শিঙ, সে হরিণ বারশিঙ্গা (দ্বাদশশৃঙ্গ), তুলার মত পশমওয়ালা হরিণ তুলারু (তূলরূপ), ঘোড়ার মত বৃহৎকায় অর্থাৎ কৃষ্ণশার হইল ঘোড়ারু (ঘোটকরূপ), যাহার কান ঝুলিয়া থাকে সে হরিণ ঢোলকান্।
২ তুলনায় চর্যাগীতি, "অপর্ণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী"—নিজের মাংসের জন্য হরিণের শত্রুতা (হিংস্র প্রাণী ও মানুষের সহিত)।

৫. পাণ্ডববিজয় বা ভারত-পাঞ্চালী

ষোড়শ শতাব্দীতে মহাভারত-কাহিনী কাব্য সবই রাজসভা অথবা ধনিসভায় পঠিত হইবার জন্য লেখা হইয়াছিল। "কবীন্দ্র" পরমেশ্বরের 'পাণ্ডববিজয়' বাঙ্গালা সাহিত্যে সবচেয়ে প্রাচীন মহাভারত-পাঞ্চালী। কাব্যটি লেখা হয় হোসেন শাহার সেনাপতি লস্কর পরাগল খানের "মহানুগ্রহগৌরবাৎ"। পরাগল চাটিগ্রাম প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। পরাগলের পুত্র "ছুটি খান"-এর আদেশে শ্রীকর নন্দী জৈমিনীয়-সংহিতা অবলম্বনে অশ্বমেধ-পর্ব রচনা করিয়াছিলেন। পিতাপুত্র দুইজনেই হোসেন শাহার সেনাপতি ছিলেন, দুইজনেই "লস্কর" এবং "খান"। সাধারণ লোকে তাই পুত্রকে "ছোট খাঁ" বলিত। ছুটি-খান নামের ইহাই উৎপত্তি।

সেকালে সমগ্র মহাভারত-কাহিনীর চেয়ে মহাভারতীয় বিভিন্ন আখ্যানের বেশি আদর ছিল বলিয়া মনে হয়। হোসেন শাহার বংশের রাজ্যচ্যুতির পর নবজাগরিত কোচবিহার দরবার এই ধরণের রচনার খুব উৎসাহ দিতে থাকেন। বিশ্বসিংহের রাজ্যকালে তাঁহার এক পুত্র সমরসিংহের অনুরোধে পীতাম্বর দাস ১৪৬৮ ("রস ঋতু বেদ চন্দ্র") শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বন-পর্বের নল-দময়ন্তী কাহিনী অবলম্বনে একটি মাঝারি আকারের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। "ভারতের পুণ্যকথা রচিব সংক্ষেপে",—কবির এই উক্তি হইতে এমনও মনে করা যাইতে পারে যে, সমগ্র ভারত-পাঞ্চালী লেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পীতাম্বরের বৈষ্ণবোচিত অহঙ্কারহীনতা উপভোগ্য।

> ব্রাহ্মণের মুখে শুনি কথা পুণ্যবতী
> পয়ারপ্রবন্ধে রচোঁ হেন কৈল মতি।
> নহো আমি পণ্ডিত [না করোঁ] অহঙ্কার
> বুদ্ধির স্বভাবে হের রচিলোঁ পয়ার।

পীতাম্বরের আরো একটি রচনা মিলিয়াছে। সেটি ভাগবতের এক কাহিনী অবলম্বনে লেখা 'উষাহরণ' কাব্য।

বিশ্বসিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নরনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বীর সেনাপতি যুবরাজ শুক্লধ্বজ যুদ্ধে ত্বরিতকর্মের জন্য "চিলা রায়" নামে

খ্যাত ছিলেন। ইনি রামসরস্বতীকে দিয়া মহাভারতের বনপর্ব অনুবাদ করাইয়াছিলেন। একথা আগে বলিয়াছি। কোচবিহারের পরবর্তী রাজারা একে একে অপর পর্বগুলিকেও বাঙ্গালা পদ্যে রূপান্তরিত করাইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরও অন্তত দুইজন কবি অশ্বমেধ-পর্ব পাঞ্চালী লিখিয়াছিলেন। একজন "লস্কর" রামচন্দ্র খান। জাতি কায়স্থ, নিবাস উত্তররাঢ়ে দণ্ডসিমলিয়া গ্রামে। পিতার নাম কাশীনাথ (পাঠান্তরে মধুসূদন, মাতার নাম পুণ্যবতী। রামচন্দ্র ছিলেন হোসেন শাহার একজন সেনাপতি, দক্ষিণবঙ্গের ফৌজদার। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া চৈতন্য যখন নীলাচলে যাইতেছিলেন, তখন "দক্ষিণ রাজ্যের" অধিকারী এই রামচন্দ্র খান তাঁহাকে নির্বিঘ্নে উড়িষ্যাসীমান্তে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। পরে নিত্যানন্দের সহিত রামচন্দ্রের বিরোধ হইয়াছিল। সুলতানের কোপে পড়িয়া রামচন্দ্র ধর্মচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। রামচন্দ্র খান জৈমিনীয়-সংহিতার অশ্বমেধ কাহিনী অবলম্বনে একখানি পাঞ্চালী-কাব্য লিখিয়াছিলেন।

"দ্বিজ" রঘুনাথের অশ্বমেধ-পাঞ্চালী লেখা হয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে। উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেবের সভায় কাব্যটি পড়া হইয়াছিল। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দদেব যুদ্ধে নিহত হন। সুতরাং কাব্যটির রচনাকাল ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়। কবির সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই।

৬. মনসামঙ্গল

পাঞ্চালী কাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলের আদর সর্বত্র এবং সবচেয়ে বেশি ছিল। রাজসভার অথবা ধনিসভার আশ্রয়পুষ্ট কোন কবি মনসামঙ্গল রচনা করেন নাই। মনসামঙ্গল কবিরা জনসাধারণের কবি। তাঁহাদের কাব্য জনসাধারণের প্রীতিকামনায় লেখা। সেইজন্য মনসামঙ্গলের রচনা ও সমাদর কোন অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ বা কোন সম্প্রদায়বিশেষে অনুশীলিত ছিল না। চণ্ডীমঙ্গলেও জনসাধারণের প্রীতি ছিল কিন্তু সে জনসাধারণ সর্বশ্রেণীর নয়, শিক্ষিত অথবা সংস্কারপ্রাপ্ত শ্রোতারাই চণ্ডীমঙ্গলের পূর্ণরসগ্রাহী ছিল। এই কারণেই আমরা লক্ষ্য করি যে চণ্ডীমঙ্গলেও ঘরের কথা, সপত্নীকলহ ইত্যাদি আছে, কিন্তু সে বর্ণনা মনসামঙ্গলের বর্ণনার মত গ্রাম্যতাঘেঁষা নয়।

মনসামঙ্গলে গ্রাম্য ভাব মাঝে মাঝে আছে। তাহাই এই পাঞ্চালী-গানের সর্বজনীন সমাদরের পরিচয় দিতেছে।

বাঙ্গালা দেশের বাহিরে—উত্তর বিহারে, দক্ষিণ বিহারে ও আসামে—মনসার কাহিনী প্রচলিত আছে। অল্পস্বল্প বিভেদ থাকিলেও বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে মনসামঙ্গল-কাহিনী প্রায় একই রকম।

বাঙ্গালাদেশে যে মনসামঙ্গল লেখা হইয়াছিল তাহা অঞ্চল ধরিয়া দেখিলে তিন ভাগে পড়ে—উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ। উত্তরবঙ্গ বলিতে খাশ উত্তর ও মধ্য বঙ্গ এবং আসামের কামরূপ বুঝিতে হইবে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রসঙ্গে মনসামঙ্গলের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের ধারা। উত্তরবঙ্গের ধারায় বিশেষত্ব হইতেছে গোড়ায় দেবখণ্ডের অর্থাৎ শিবপার্বতীর কাহিনী সংযোগ। আর একটা বড় বিশেষত্ব হইতেছে মনসামঙ্গলের নামান্তর "পদ্মাপুরাণ" (—পদ্মা মনসার এক নাম)। পূর্ববঙ্গের কোন কোন কবি এ নাম ব্যবহার করিলেও কোন পশ্চিমবঙ্গের কবি ভুলিয়াও মনসামঙ্গল পাঞ্চালীকে পদ্মাপুরাণ বলেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের এবং সাধারণত উত্তর বঙ্গের কাব্যগুলি একজন কবিরই রচনা। পূর্ববঙ্গের কাব্যগুলি বহু কবির রচনার সঙ্কলন, কোনটিই কোন বিশেষ কবির রচনা নয়।

মনসামঙ্গলের মূল উপাখ্যান চাঁদো-লখিন্দর-বেহুলার গল্প একদা পশ্চিমবঙ্গেই উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে। চাঁদোর রাজধানী গাঙ্গুর নদীর উপর। এই নদী অজয়ে পড়িয়াছে, অজয় ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। সব কবিই এই গাঙ্গুর-অজয়-ভাগীরথী পথে চাঁদোর বাণিজ্যযাত্রা বর্ণনা দিয়াছেন।

কামরূপে দুইজন প্রাচীন কবির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাঁদের নাম মনকর ও দুর্গাবর। দুইজনেরই ভাষায় অসমীয়ার ছাপ আছে।

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কবি বিভূতি বোধ হয় তাঁতি ছিলেন। তাই নিজেকে "তন্ত্র" বিভূতি বলিয়াছেন। ইঁহার কাব্যের পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ অঞ্চলে দুইজন ভালো কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নারায়ণ দেব ও বংশীদাস। নারায়ণ দেব কায়স্থ, বংশীদাস ব্রাহ্মণ। নারায়ণ

দেবের বাস ছিল বোরগ্রামে। তাঁহার পূর্বপুরুষ পশ্চিমবঙ্গ হইতে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রতীরে বসতি করিয়াছিল। নারায়ণের উপাধি ছিল "কবিবল্লভ"। ভনিতায় এই উপাধিই বেশি ব্যবহৃত হইয়াছে। কামরূপ অঞ্চলেও নারায়ণ দেবের পাঞ্চালী সুপ্রচলিত ছিল। সেখানকার লোকে ইঁহার পদ্মাপুরাণকে "সুকবিনারায়ণী" বলিত। এই নামটি বিকৃত হইয়া এখন "সুকনান্নি"তে পরিণত।

বংশীদাস নারায়ণ দেবের পরবর্তী, সম্ভবত সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীর লোক। বংশীদাসের কাব্য নারায়ণ দেবের রচনার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। বংশীবদনের নিবাস ছিল পাটবাড়ী (বা পাতুয়ারী) গ্রামে। কবি দরিদ্র ছিলেন, মনসার পাঞ্চালী গাহিয়া কষ্টেসৃষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বংশীবদনের পত্নীর নাম সুলোচনা। একমাত্র সন্তান কন্যা চন্দ্রাবতী পিতার মত কবিত্বশক্তির অধিকারিণী ছিলেন। ইঁহার রচিত রামায়ণের কিছু কিছু ছড়া ময়মনসিংহ অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, মনসামঙ্গল-রচনায় বংশীবদন কন্যা চন্দ্রাবতীর সাহায্য পাইয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর সহিত জয়চন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণকুমারের বিবাহ স্থির হয়। জয়চন্দ্র কিন্তু এক মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করে। চন্দ্রাবতী আজীবন কুমারী রহিয়া যায়। এই কাহিনী আধুনিক কালে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত এক পল্লীগাঁথায় শুনিতে পাওয়া যায়।

বংশীদাস পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য ব্যগ্রতা দেখান নাই। অপরদিকে ইঁহার কাব্য গ্রাম্যতা দোষ হইতে একেবারে মুক্ত। তবে এই উৎকর্ষ কতটা বংশীবদনের আর কতটা আধুনিক কালের গ্রন্থ-সংস্কর্তার, তাহা নির্ধারিত হয় নাই।

পূর্ববঙ্গে রচিত মনসামঙ্গল-কাব্যের টুকরা টুকরা পালা বিস্তর পাওয়া গিয়াছে। ভনিতার সংখ্যাও অজস্র। তবে ইঁহাদের প্রায় বারো আনাই ছিলেন আসলে গায়ন মাত্র।

৭. বৈষ্ণবধর্মে নব নেতৃত্ব ও কীর্তন-পদ্ধতি

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশে নূতন করিয়া বৈষ্ণবধর্মের বন্যা নামিয়াছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা চৈতন্যের ধর্মকে শাস্ত্রবিধিতে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর এই শাস্ত্রবিধি বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজকে নিয়ন্ত্রিত

করিতে লাগিল। কৃষ্ণমূর্তির পূজা আগেই শুরু হইয়াছিল, এখন রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির পূজা প্রচলিত হইল। যাঁহাদের সহায়তায় বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্ত্রবিধান বাঙ্গালা দেশে আনীত হইল তাঁহাদের নেতা ছিলেন তিনজন, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দত্ত ও শ্যামানন্দ দাস।

শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ ছিলেন। পৈতৃক নিবাস ভাগীরথীর পূর্বকূল চাখন্দী গ্রামে। এ গ্রাম এখন ভাগীরথীগর্ভে বিলুপ্ত। শ্রীনিবাস বেশির ভাগ বাস করিতেন কাটোয়ার কাছে যাজিগ্রামে। শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্য-ভক্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরপরায়ণ। মাতাপিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে শ্রীনিবাস নবদ্বীপ শান্তিপুর খড়দহ পুরী ইত্যাদি বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন করিয়া শেষে বৃন্দাবনে উপনীত হন। তখন সনাতন রূপ ও রঘুনাথ ভট্ট পরলোকে। গোপাল ভট্টের কাছে শ্রীনিবাস দীক্ষা লইলেন এবং জীব গোস্বামীর কাছে ভাগবত ও বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যায়ন করিলেন। বৃন্দাবনেই নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম মিলন।

নরোত্তম বড়লোকের ছেলে। তাঁহার পিতৃব্য গৌড়-দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইঁহাদের জাতি কায়স্থ, নিবাস পদ্মার উত্তর তীরে (এখনকার রাজশাহী জেলার অন্তর্গত) গোপালপুর গ্রামে। পরে নরোত্তম একটু তফাতে খেতরী গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। নরোত্তম আবাল্য ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। কিশোরবয়সেই ইনি বৃন্দাবনগমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পিতামাতা বাধা দেওয়ায় তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে নরোত্তম অবিলম্বে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। সেখানে গুরু করিলেন লোকনাথ গোস্বামীকে। লোকনাথ অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য, চৈতন্যের অনুগৃহীত। তিনি আত্মলোপী নীরব সাধক ছিলেন। বৃন্দাবনে গোস্বামীদের মধ্যে তাঁহার বিশেষ গৌরব ছিল। নরোত্তমও ভাগবত ও বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ঝোঁক ছিল ভজনসঙ্কীর্তন ও লীলাকীর্তনের দিকে। শ্রীনিবাস ছিলেন পণ্ডিত, আর নরোত্তম ছিলেন ভাবুক ও কবিপ্রকৃতি।

শ্যামানন্দ জাতিতে সদ্‌গোপ। পৈতৃক নিবাস খড়্গপুরের কাছে ধারেন্দা গ্রামে। অম্বিকার গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দ শ্যামানন্দের গুরু ছিলেন। তাঁহার দীক্ষাগ্রহণ কোথায় হইয়াছিল, বৃন্দাবনে না দেশে, তাহা বলা যায় না। শামানন্দ কতকটা নরোত্তমের মত ভাবুক ছিলেন।

তিন বন্ধু পরে দেশে ফিরিয়া আসেন। একসঙ্গে আসিয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে এক সময়ে আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগ্রন্থগুলি বাঙালা দেশে প্রচার করিবার ভার জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে এই সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। শ্রীনিবাস দেশে ফিরিবার সময়ে গোরুর গাড়ী করিয়া সিন্দুক-বোঝাই পুঁথি আনিতেছিলেন। ধনরত্ন আছে মনে করিয়া ঝাড়িখণ্ডের জঙ্গলে দস্যুরা সিন্দুকগুলি লুট করে। দস্যুরা মল্লভূমের রাজা বীর-হাম্বীরের লোক। বীর হাম্বীরের ভাণ্ডারে সেই পুঁথিপত্র যেমন হাজির হইল অমনি শ্রীনিবাসও সেগুলির খোঁজে রাজদরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পুঁথিপত্র পাওয়া গেল। শ্রীনিবাস তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও বৈষ্ণবতায় রাজসভা জয় করিলেন। বীর-হাম্বীর সবংশে তাঁহার শিষ্য হইলেন।

পুঁথি লুটের কথা সত্য না হইতে পারে তবে বীর-হাম্বীরের সভাবিজয় সত্য ঘটনা। রাজা ও যুবরাজ বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মল্লভূমে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার দ্রুতগতি হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যেই বিষ্ণুপুরে মন্দিরশিল্পে ও কীর্তনসঙ্গীতে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা দিয়াছিল।

শ্রীনিবাস নিজে কোন গ্রন্থরচনা করেন নাই। তাঁহার রচিত পদ দুই একটি আছে। তবে তাঁহার শিষ্য অনেকেই পদকর্তারূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি।

শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। নরোত্তম সংসারত্যাগ করেন নাই, তবে বিবাহও করেন নাই। সংসারের মধ্যে থাকিয়া তিনি বৈরাগীর জীবন যাপন করিতেন। নরোত্তম কয়েকটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে খেতরীতে এক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই উৎসবে চারিদিক হইতে বৈষ্ণবসজ্জন নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সে উৎসবে নরোত্তম যে কীর্তনগানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা আমাদের সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আসর পাতিয়া রীতিমত পালাবন্দি পদাবলী কীর্তনগান এইই প্রথম। অর্থাৎ পালা অনুসারে "গৌরচন্দ্রিকা" (অর্থাৎ চৈতন্যবন্দনা) দিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলাগান রীতি এই উৎসবেই প্রথম হইয়াছিল। কীর্তনগানে মৃদঙ্গের যে তাল দেওয়া হয় তাহার বিকাশও এইখানে। এ কাজে মৃদঙ্গবাদক দেবীদাসের কৃতিত্ব স্মরণীয়। খেতরী

উৎসবে যে কীর্তনপদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল তাহাই সব চেয়ে পুরানো পদ্ধতি। খেতরী গড়ের-হাট পরগণার অন্তর্গত ছিল বলিয়া এই পদ্ধতি পরে "গড়েরহাটী," তাহা হইতে "গরানহাটী" এই বিকৃত নামে খ্যাত। (ইহার আগে অর্থাৎ চৈতন্যের সময়ে যে কীর্তন-গানের রীতি ছিল তাহা অনেকটা বিদ্যাপতির পদ-বাহিত মিথিলা-রীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তখন পালাবন্দি কীর্তন-গান অজ্ঞাত ছিল।) শ্রীখণ্ড অঞ্চলে যে সরল ও মধুরতর কীর্তনপদ্ধতি গড়িয়া উঠিল তাহাও পরগণার নাম অনুযায়ী "মনোহরশাহী" নামে খ্যাত। এখন যে ধরণের কীর্তনগান শোনা যায় তাহা এই পদ্ধতিরই। আরও দুইটি কীর্তন-পদ্ধতি সৃষ্ট হইয়াছিল। একটি মধ্যরাঢ়ের, "রানীহাটি" বা "রেনেটি" পদ্ধতি, আর একটি বিষ্ণুপুরের, "ঝাড়খণ্ড" পদ্ধতি। এই দুইটি নামও দেশনাম অনুসারে। কীর্তনগানের বিশিষ্ট সুরে ও তালে বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতির অভিনব বিকাশ দেখি। ইহাতে সাহিত্যরসের সঙ্গে সঙ্গীতরস সমানভাবে মিশিয়াছে এবং মিশিয়া গিয়া এক অনির্বচনীয় শিল্পরসের সৃষ্টি করিয়াছে।

আগেই বলিয়াছি, নরোত্তমের প্রকৃতিতে কবি-ভাবুকতা ছিল। সঙ্গীতে যেমন কাব্যরচনায়ও তেমনি তাঁহার অধিকার সহজাত ও অবাধ ছিল। তিনি যথেষ্ট বাঙ্গালা রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী আছে, প্রার্থনা-পদাবলী আছে, সাধনভজনের কড়চা বই আছে। নরোত্তমের পদাবলীতে ভাষা প্রসন্ন ও মনোগ্রাহী, ভাব স্নিগ্ধ ও কমনীয়। নরোত্তমের প্রার্থনা এখনও ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে পবিত্র ও নিত্যপাঠ্য হইয়া আছে।

শ্যামানন্দও কিছু পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন পদে "দুঃখী" বা "দুঃখিনী" ভনিতা আছে। "দুঃখী" তাঁহার ডাকনাম ছিল। শ্যামানন্দের ও তাঁহার প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের প্রভাবে বঙ্গ-উড়িষ্যা প্রান্তে এবং আশেপাশের জাঙ্গল অঞ্চলে—যেখানে সাধারণ লোকের জীবিকার একটা বড় উপায় ছিল, সামর্থ্য থাকিলে দস্যুবৃত্তি—সেখানে ঘরেবাহিরে বৈষ্ণবভাব বিস্তারিত হইতে পারিয়াছিল।

নরোত্তমের শিষ্যদের মধ্যে ভালো ভালো পদকর্তা ছিলেন। তাঁহাদের কথা পরে বলিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ শতাব্দী

১. মোগল শাসন—ঐতিহাসিক উপক্রমণিকা

শ্রীচৈতন্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন বাঙ্গালা দেশ স্বাধীন এবং সুলতান, হোসেন শাহার রাজত্ব। তাঁহার তিরোভাবের অল্পকাল পরে হোসেন শাহার বংশধর রাজ্যচ্যুত এবং বিহারের পাঠান শূর-বংশ রাজ্যাধিকারী হইয়াছিল (১৫৪০)। দেশে স্বাধীনতা অনেকখানি চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে দিল্লীতে মোগল-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের অধিকার লইয়া কয় বছর ধরিয়া মোগল-পাঠানের যুদ্ধ চলিল। অবশেষে পাঠানের অধিকার বাঙ্গালা দেশ হইতে বিলুপ্ত হইল। মোগল-শক্তির দ্বারা বিজিত হইয়া বাঙ্গালা দেশ ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর শাসনাধীনে আসে, কিন্তু পাঠান সুলতানদের সেনাপতিরা এবং সামন্ত রাজারা সহজে মোগল-শাসন মানিয়া লয় নাই। শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খান কর্‌রানীর রাজ্যপ্রাপ্তির সময় হইতেই দেশে উপদ্রব অশান্তি শুরু হইয়াছিল। স্থানীয় শাসনকর্তারা এবং খাজনা-আদায়কারী কর্মচারীরা প্রজাদের উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে মুকুন্দরাম তাঁহার আত্মকাহিনীর মধ্যে এইরূপ অত্যাচারের উজ্জ্বল বাস্তবচিত্র স্বল্পাক্ষরে আঁকিয়াছেন।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের এক প্রবল জোয়ার আসিল। ইহার আগে চৈতন্যের ভক্ত ও তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা ভক্তিধর্মের যে প্রসার হইতেছিল, তাহার মধ্যে জোরজবরদস্তি ছিল না। ভক্তিবাদের মূলতত্ত্ব বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকলেই মানিয়া লইয়াছিল। জনসাধারণ নিজের নিজের ধর্ম-উপাসনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণবীয়ভাবে, অর্থাৎ ভক্তিনম্র ও অহিংস হৃদয়ে, জীবনযাপন করার মধ্যে কোন অসঙ্গতি বোধ করে নাই। তাহার সাক্ষী মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। বাল্যে ইনি শিবের সেবক, যৌবনে চণ্ডীচরণপরায়ণ, কিন্তু আজীবন পরম-বৈষ্ণব।

মোগল-রাজত্বের অপেক্ষাকৃত আভ্যন্তর-উপদ্রবহীন সুশাসনের মাঝে আসিয়া লোকে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। ইহার আগেই চৈতন্যের

চারিত্র্যে বাঙ্গালী জাতির আত্মিক ও মানসিক জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল। এই অবকাশে বৈষ্ণবধর্মের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর সংস্কৃতি স্ফুটতর হইতে লাগিল। বাঙ্গালা সাহিত্য তখন নিজের পথ ধরিয়াছে। রাজার বা ধনীর সহায়তা এখন অনাবশ্যক। মোগল-শাসনের শৃঙ্খল বাঙ্গালা দেশকে স্বতন্ত্র রাজ্য না রাখিয়া উত্তরাপথের অংশভুক্ত করিয়া দিল। ইহার কিছুকাল আগে হইতেই চৈতন্য এবং তাঁহার ভক্ত বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ভারতবর্ষের অপর অংশের সহিত বাঙ্গালার সাংস্কৃতিক সংযোগ দৃঢ় করিয়াছিলেন। এখন রাষ্ট্র শাসন ও বাণিজ্যের মারফৎ অন্যরকম সংযোগ স্থাপিত হইল। তবে ইহার ফল অবিমিশ্রভাবে মঙ্গলজনক হয় নাই। বাঙ্গালার সংস্কৃতি স্বভাবত যে পথ ধরিয়াছিল তাহা এখন বাহিরের চাপে অপ্রশস্ত হইতে লাগিল। মোগলদরবারের ঐশ্বর্য-আড়ম্বর অচিরে বাঙ্গালী জমিদার-ধনীদের অনুকরণীয় হইল এবং তাহাতে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ—যাহা বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে কমিয়া আসিতেছিল তাহা—বাড়াইয়া দিতে লাগিল। শাস্ত্রশাসন যাঁহাদের হাতে ছিল সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা স্বাধীনতা রাখিয়া চলিতে লাগিলেন বটে কিন্তু ধনের শাসন দিন দিন মান্যতর হইতে থাকিল।

আগেই বহির্বাণিজ্য বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে, এখন অন্তর্বাণিজ্যও ধীরে ধীরে ক্ষেত্রী-শ্রেষ্ঠীদের হাতে চলিয়া যাইতে লাগিল। পোর্তুগীসদের সঙ্গে বাণিজ্যকর্ম ষোড়শ শতাব্দীতে শুরু হইয়াছিল, এ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে তাহা বন্ধ হইয়া গেল। নূতন নূতন ইউরোপীয় জাতি—ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজ দিনেমার—আসিয়া তাহাদের স্থান লইতে লাগিল। ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে কারবার প্রধানত বাঙ্গালীর হাতে ছিল। এই কারবারের ফলে গঙ্গাতীর-অঞ্চলবাসী কারিগর ও ব্যবসায়ীরা কিছু আর্থিক উন্নতি করিয়াছিল। সাধারণ লোক কৃষিকার্য লইয়া থাকিত। সেকালে জীবনযাত্রার যে মান ছিল তাহাতে কৃষিকার্যের দ্বারা স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইত। পোর্তুগীসরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। নিম্নবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এবং চাটিগাঁয়ে যে অল্পসংখ্যক লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই পোর্তুগীস পাদরীদের অথবা বণিক-নাবিকদের ভৃত্য ছিল। দুইএকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও পোর্তুগীস জলদস্যুদের হাতে পড়িয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই রকম

এক জমিদারপুত্র পাদ্‌রি হইয়া দোম্‌ আন্তোনিও নাম লইয়াছিলেন। বাঙ্গালা গদ্যে লেখা ইঁহার একটি রচনা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও খ্রীষ্টান পাদ্‌রির মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে হিন্দুধর্মের তুলনায় খ্রীষ্টীয় ধর্মের উৎকর্ষ দেখাইবার চেষ্টা আছে। বইটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা।

পোর্তুগীসরা এদেশে অনেক নূতন জিনিস আমদানি করিয়াছিল। সেসব অধিকাংশই আগ্রহের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। সেগুলি আমাদের সংসারযাত্রায় এখনও অত্যাবশ্যক হইয়া আছে। যেমন, ফল-আনাজের মধ্যে আলু টম্যাটো কপি লিচু আনারস, খাদ্যের মধ্যে পাঁওরুটি, নেশার দ্রব্য তামাক, ব্যবহারের দ্রব্য বালতি-গামলা হইতে আলপিন-ইস্ক্রুপ পর্যন্ত নানা জিনিস। ইঁটের ছোটখাট বসতবাড়ি তৈয়ারির রীতি পোর্তুগীসদের কাছ থেকেই পাওয়া। বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাহার নামও পোর্তুগীস ভাষা হইতে লইয়াছি। সে শব্দগুলি এখন বিদেশী বলিয়া চেনা দুরূহ। যেমন, বালতি গামলা তিজেল তোয়ালে আলমারি আলকাতরা বরগা জানালা মিস্ত্রি ইত্যাদি। মোট কথা পোর্তুগীসদের সঙ্গে কারবারের ফলে স্বল্পবিত্ত বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার মান—অবশ্য আধুনিক দৃষ্টিতে—উন্নত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় মোগল-শাসনের পূর্ব হইতেই যথেষ্ট আরবী-ফারসী শব্দ গৃহীত হইয়াছিল। মোগল-আমলে আগাগোড়া রাজকার্যের ভাষা ফারসী হওয়ায় এখন ফারসী শব্দের যথেচ্ছ আমদানিতে কোন বাধা রহিল না।

২. বৈষ্ণব-পদাবলী ও চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি সমস্যা

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ভক্তিগ্রন্থ বাঙ্গালা দেশে গৃহীত হইলে পর বৈষ্ণবসাহিত্যে রচনাধারায় পরিবর্তন দেখা দিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘গোবিন্দলীলামৃত’ কাব্যটিতে রূপগোস্বামীর অভিপ্রেত এবং তাঁহার ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ ও ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ গ্রন্থদ্বয়ে ব্যাখ্যাত রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাকাহিনী পরিগৃহীত হইয়া বাঙ্গালায় কৃষ্ণলীলাকাব্যে ও পদাবলীতে বিশেষভাবে অনুসৃত হইতে লাগিল। বাঙ্গালাদেশে যে কৃষ্ণকথা প্রচলিত ছিল, তাহা ভাগবতের অনুসরণে, তবে কিছু স্বতন্ত্রতাও ছিল। এদেশের

কৃষ্ণলীলাকাহিনীতে লৌকিকরসের অভাব ছিল না এবং কৃষ্ণ দেবতা হইয়াও এখানে মানুষের স্বভাব হারাইয়া ফেলেন নাই। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রদর্শিত কাহিনীতে কৃষ্ণলীলা নরলোকের সম্পর্ক বর্জন করিয়া গোলোকের অপ্রাকৃত নিত্যলীলায় পর্যবসিত। রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ— ইঁহারা কৃষ্ণলীলার যে "দাঁড়া" বাঁধিয়া দিলেন, তাহার বাহিরে কোন "বৈষ্ণব" কবির সরিবার পথ রহিল না। সেই দাঁড়া অনুসরণ না করিলে গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজের গ্রহণীয় হইত না। এমন এক বই সিলেটের কবি ভবানন্দের 'হরিবংশ'। এ কাব্যটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত প্রধানত দেশপ্রচলিত কাহিনী লইয়া লৌকিক ছাঁদে লেখা। রচনার দক্ষতা আছে। কিন্তু কাব্যটি গোস্বামী-শাস্ত্রসম্মত নয় বলিয়া বৈষ্ণব রসিকসমাজে গৃহীত হয় নাই।

গতানুগতিকতার ঠাটে কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্য আর আসর জমাইয়া রাখিতে পারিল না। ইতিমধ্যে পালাবাঁধা কীর্তনগানের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা বিদগ্ধজনের মনোহরণ করিয়াছে। এইজন্য সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখি যে, বৈষ্ণব কবিদের মনোযোগ প্রধানত পদাবলীরচনাতেই।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবসংস্কৃতির চারিটি প্রধান কেন্দ্র সৃষ্টি হইয়াছিল,— নবদ্বীপ-শান্তিপুর-খড়দহ-কালনা শ্রীখণ্ড-জাজিগ্রাম-কাটোয়া, খেতরী এবং বিষ্ণুপুর। সব কেন্দ্রেই সাহিত্যে, সঙ্গীতশিল্পে এবং শাস্ত্র-অনুশীলনে উৎসাহ জাগ্রত ছিল। তবে সাহিত্যে অর্থাৎ পদাবলীরচনায় শ্রীখণ্ড বরাবরই অগ্রণী। এখানে গীতিকবিতার চর্চা শুরু হইয়াছিল হোসেন শাহার আমল হইতে, সে কথা আগে বলিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীতে নরহরি নিজে ও লোচন প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য পদাবলী রচনা করিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার পর ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক কবি এই অঞ্চলে পদাবলীরচনায় আগ্রহ, তৎপরতা ও উৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন। ইঁহারা নরহরি-রঘুনন্দনের অথবা শ্রীনিবাসের শিষ্য-প্রশিষ্য ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান গোবিন্দদাস কবিরাজ। গোবিন্দদাস ও তাঁহার বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের দুই মুখ্য শিষ্য ছিলেন। রামচন্দ্র আবার নরোত্তমের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রামচন্দ্র-গোবিন্দের মাতামহ দামোদরের কবি-পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি ছিল। গৌড়-দরবারেও তাঁহার খাতির ছিল। দামোদরের একমাত্র সন্তান কন্যা সুনন্দা। তাহার বিবাহ হইয়াছিল চিরঞ্জীব সেনের সহিত। দুইটি

পুত্রের জন্মের পর চিরঞ্জীব মারা যান। পুত্র দুইজন রামচন্দ্র ও গোবিন্দ, মাতামহের গৃহে মানুষ হইয়াছিলেন। মাতামহ শাক্ত ছিলেন। তাই দুই ভাইও প্রথম জীবনে শক্তি-উপাসক ছিলেন। সেই সময়ে গোবিন্দদাস যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। পদটিতে অর্ধনারীশ্বর (অর্থাৎ অর্ধেক শিব ও অর্ধেক পার্বতী) মূর্তির বন্দনা। শিবশক্তির এই যুগলমূর্তিকে জগতের মাতাপিতা বলিয়া গোবিন্দদাস বন্দনা করিয়াছেন। কিরূপে দুই ভাই বৈষ্ণবধর্মের পথে চলিয়া আসিলেন সে কথা কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণিত আছে। রামচন্দ্র কবিরাজ একদিন দোলায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যও সে পথে চলিয়াছিলেন। সৌম্যমূর্তি রামচন্দ্রকে দেখিয়া শ্রীনিবাস তাঁহার সঙ্গীকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। পরিচয় পাইয়া শ্রীনিবাস বলিয়াছিলেন, আহা এমন মানুষ যদি বৈষ্ণব হইত তবে সোনায় সোহাগা হইত। এই কথা রামচন্দ্রের কানে যায়। তিনি শ্রীনিবাসের কাছে আসেন এবং শ্রীনিবাসের চারিত্র্যে ও ভক্তিমত্তায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্য হন। ছোট ভাই গোবিন্দকেও রামচন্দ্র বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা লইতে বলেন। কিন্তু গোবিন্দদাস ঘোর শাক্ত। তাঁহার পত্নীর নাম মহামায়া। পুত্রের নাম রাখিয়াছেন দিব্যসিংহ (অর্থাৎ দেবীর বাহন)। তখন গোবিন্দ রাজি হইলেন না। তাহার পর তিনি উৎকট রোগে পড়িলেন। একদিন শ্রীনিবাস আচার্য আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। তাহার পর হইতে গোবিন্দ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। সুস্থ হইয়া উঠিয়া পত্নী ও পুত্র সহ তিনি শ্রীনিবাসের কাছে মন্ত্র লইলেন। তখন হইতে গোবিন্দদাস কৃষ্ণলীলাপদাবলী রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু তখনও তিনি "কবিরাজ" হন নাই।

গোবিন্দদাসের পদবলী শ্রীনিবাস আচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণব মহান্ত অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনিতেন এবং যেমন যেমন লেখা হইত অমনি বৃন্দাবনে বৈষ্ণবসমাজের নেতা জীব গোস্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিতেন। পড়িয়া ও গান শুনিয়া জীব গোস্বামী খুব খুশি হইতেন। তিনি গোবিন্দদাসকে প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে "কবীন্দ্র" বলিয়া উল্লেখ করিয়া এক শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই হইতে গোবিন্দদাস "কবিরাজ" হইলেন।

গোবিন্দদাস সব চেয়ে বড় পদকর্তা। তিনি তিনশতেরও বেশি পদ রচনা করিয়াছিলেন। সে পদের ভাষা ব্রজবুলি। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে

সাহিত্যগুরু করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃতবিদ্যা আয়ত্ত ছিল এবং ছন্দের কান খুব সূক্ষ্ম ছিল। পদে পদে ঝঙ্কার তুলিয়া ধ্বনিময় চিত্র আঁকিতে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ নাই বলিলেই হয়। যেমন, কৃষ্ণের রূপবর্ণনা—

অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর
আধ-আধপদ চলনি রসাল
কাঞ্চনবঞ্চন বসন মনোরম
অলিকুলমিলিত ললিত বনমাল।
ভালে বনি আওত মদনমোহনিয়া
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
রঙ্গিমভঙ্গিম নয়ননাচনিয়া। ধ্রু। ...
রোচন তিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক
বেঢ়ল রমণীমন মধুকরমাল
গোবিন্দদাস-চিতে নিতি নিতি বিহরই
ইহ নাগরবর তরুণতমাল।।

ব্রজবুলি পদটি বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ করিলে এই রকম হইবে—
'রাঙা পায়ে মণিনূপুর বাজিতেছে, এক পা আধ পা করিয়া তিনি মোহন ভঙ্গিতে চলিতেছেন। সোনাকে হারাইয়া দিয়াছে এমন পীতবর্ণ তাঁহার পরিধানবস্ত্র। সুন্দর বনমালা (গলায়), তাহার ফুলে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর বসিয়াছে। মদনমোহন (কৃষ্ণ) কেমন সুন্দর সাজিয়া আসিতেছেন। রূপের সাগর যেন তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে ঢেউ তুলিতেছে। সুন্দর ভঙ্গিতে তাঁহার নয়ন চঞ্চলিত। ... (ললাটে) উজ্জ্বল তিলক। চূড়ায় মনোহর শিখিপুচ্ছ। গোপনারীর মন যেন মধুকরের মালা হইয়া (তাঁহার গলা) জড়াইয়াছে। তরুণ তমালতরুর মত এই নটবরমূর্তি গোবিন্দদাসের চিত্তে সর্বদা বিহার করিতেছে।'

গোবিন্দদাস তাঁহার কোন কোন পদে বন্ধুদের নাম করিয়াছেন। বসন্ত রায়ের মত তাঁহার কোন কোন বন্ধু ভালো পদকর্তা ছিলেন।

নরোত্তমের পিতৃব্যপুত্র ও শিষ্য সন্তোষ রায়ের অনুরোধে গোবিন্দদাস একটি কৃষ্ণলীলাত্মক সঙ্গীতনাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকটি এখন লুপ্ত। তবে নাটকের কয়েকটি গান তাঁহার পদাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

গোবিন্দদাস নামে শ্রীনিবাসের আর একজন ভালো কবিশিষ্য ছিলেন। এ গোবিন্দদাস ছিলেন ব্রাহ্মণ, কবিরাজ গোবিন্দদাস বৈদ্য। ব্রাহ্মণ গোবিন্দদাস বেশির ভাগ পদ বাঙ্গালাতেই লিখিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ দুই একটি পদ লিখিয়াছিলেন। দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ সপ্তদশ শতাব্দীর একজন মুখ্য পদকর্তা। ইঁহার গুরু ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দ (বা গোবিন্দগতি)। গুরুর প্রীতিকামনায় ঘনশ্যাম সংস্কৃতে একটি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে নিজের অনেক পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কীর্তনগান ও পদাবলী-সংগ্রহের মধ্য দিয়া যে বৈষ্ণবকবিরা এখনকার দিনে সুপরিচিত রহিয়াছেন তাঁহারা সংখ্যায় বেশি নহেন। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস বলরামদাস ও নরোত্তমদাস — এই কয়জনের পদাবলীর সঙ্গেই সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর পরিচয় আছে। তবে পদবলীর কবি বলিতে আমরা চণ্ডীদাসকেই প্রধান বলিয়া মানি। এ চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি "বড়ু" চণ্ডীদাস নহেন বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব-পদবলীতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটিমাত্র পদ কিছু পরিবর্তিত ভাবে মিলিয়াছে। চণ্ডীদাস ভনিতার অনেক ভালো ভালো পদ অন্য বৈষ্ণব-কবির নামেও মিলে। বিচার করিয়া দেখিলে এ সব কবির দাবি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যে অল্পসংখ্যক পদ অবশিষ্ট থাকে সেগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা ধরিলে অন্যায় হয় না। তবে আর এক চণ্ডীদাস ছিলেন ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিসময়ে। ইনি যে পদ লিখিয়াছিলেন তা ভালো মন্দ দুই রকমের। আর এক কবি চণ্ডীদাস ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ইনি নিজেকে "দীন" বলিয়াছেন। এই "দীন" চণ্ডীদাসের প্রচুর পদ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির অধিকাংশই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং প্রাচীনকালের বড় কবি চণ্ডীদাস বলিতে বড়ু চণ্ডীদাসকে নেওয়াই নিরাপদ। এই গেল চণ্ডীদাস-সমস্যা।

অতঃপর বিদ্যাপতি-সমস্যা। বিদ্যাপতি মিথিলানিবাসী ছিলেন। তাঁহার জীবৎকাল পঞ্চদশ শতাব্দী। সে কথা আগে বলিয়াছি। তাঁহার পদাবলী যে ভাষায় লেখা তাহাকে মৈথিলী অপেক্ষা ব্রজবুলি বলাই সঙ্গত। কেন না, পদগুলি প্রায় সবই বাঙ্গালা দেশে মিলিয়াছে এবং বাঙ্গালা পুঁথিতে

সেগুলি ব্রজবুলি রূপেই পাইয়াছি। বিদ্যাপতি সংস্কৃতে কয়েকখানি বই রচনা ও সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত নাটকও মিলিয়াছে। 'গোপীচন্দ্র'-নাটকের কথা পরে বলিব। 'কীর্তিলতা' অপভ্রংশে লেখা। ইহাতে বিদ্যাপতির পোষক-রাজাদের বংশকর্তার কীর্তিকাহিনী গদ্যে-পদ্যে বর্ণিত।

বিদ্যাপতি ছিলেন বড় পণ্ডিত। তাই তাঁহার পদাবলীতে সংস্কৃত কবিতার ভাব আকীর্ণ এবং সংস্কৃত অলঙ্কারের উজ্জ্বলতা বিকীর্ণ। বিদ্যাপতি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী অবলম্বনে পদ লিখিয়াছিলেন। চৈতন্য ও তাঁহার অনুসরণে বৈষ্ণব-রসিকেরা সে পদ পরম আনন্দে আস্বাদ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি বৈষ্ণবই ছিলেন না, যেহেতু কৃষ্ণ বা বিষ্ণু তাঁহার একমাত্র উপাস্য নহেন। তিনি যেমন রাধা-কৃষ্ণ পদাবলী লিখিয়াছিলেন, তেমনি শিব-দুর্গা পদাবলীও লিখিয়াছিলেন, এবং ধর্মসম্পর্ক বিরহিত শুদ্ধ আদিরসাত্মক পদাবলীও লিখিয়াছিলেন। যে ধরণের পদাবলীই হোক বিদ্যাপতির রচনায় ভক্তির বা ভাবুকতার প্রকাশ মুখ্য নয়, তাহা চিত্রবহুল এবং স্বল্পভাষী। এই বিষয়ে বিদ্যাপতির আসল পদাধিকারী হইতেছেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। একদা তিনিও শিব-দুর্গা পদাবলী লিখিয়াছিলেন। সে তাঁহার বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণের পূর্বে।

বৈষ্ণব-পদাবলী সঙ্কলনের মধ্যে বিদ্যাপতির নামে কতকগুলি বাঙ্গালা পদ মিলিয়াছে। সেগুলি সম্ভবত বাঙ্গালী কবির লেখা। সুতরাং একজন বাঙ্গালী বিদ্যাপতি ছিলেন। হয়ত তিনি শ্রীখণ্ডের কোন কবি। কয়েকটি পদে গঙ্গাতীরে চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকারের কথা আছে। এ কাহিনী সত্য নয়। পদগুলির রচয়িতা বোধকরি দুই বড় কবির মধ্যে ভাবসম্মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতেও বহু বৈষ্ণব-কবি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচনায় যদি কিছু যুগবৈশিষ্ট্য ফুটিয়া থাকে তবে তাহা ছন্দের মঞ্জুলতায়, ভাবের বৈচিত্র্যহীনতায় এবং ভাষার পুনরুক্তিতে। প্রধানত কীর্তন গানের প্রয়োজনেই এগুলির উৎপত্তি। তাই মৃদঙ্গের তাল-বোল স্মরণে রাখিয়াই কবিরা এসময়ে ব্রজবুলি পদের ও মাত্রামূলক ছন্দের বিষয়ে অত্যন্ত অবহিত থাকিতেন।

বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্কলন গ্রন্থাকারে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শুরু হয়। সঙ্কলনগুলি আসলে বৈষ্ণব-অলঙ্কারের বই। তাহার মধ্যে পদাবলী আছে বিভিন্ন রসের উদাহরণ হিসাবেই। শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাসের 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' (১৬৭৪) এই ধরণের প্রথম ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইঁহার পুত্র পীতাম্বর দাসও এই ধরণের দুইখানি ছোট বই লিখিয়াছিলেন। গোপালদাস-ভনিতায় রামগোপাল অনেকগুলি পদ লিখিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি এই সময়ে পদ্যে অনুদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের কাজে একজন লেখক বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যার শিষ্য যদুনন্দন দাস।

৩. বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থ

সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকখানি কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্য রচিত হইয়াছিল। সেগুলি প্রধানত বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ অনুসারে লেখা। ভাগবত হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বনে "দ্বিজ" ঘনশ্যাম একটি "চতুষ্কাণ্ডপরিমিত" কৃষ্ণলীলাকাব্য লিখিয়াছিলেন। বইটির সমাদর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পরশুরাম চক্রবর্তীর কাব্য পশ্চিমবঙ্গে কিছু সমাদৃত হইয়াছিল। কবিচন্দ্রের 'গোবিন্দমঙ্গল' দক্ষিণ রাঢ়ে সমধিক প্রচলিত ছিল। লেখক মল্লরাজ-সভাকবি ছিলেন। ভবানন্দের হরিবংশ একটি নূতন ধরণের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। উহার সহিত সংস্কৃত হরিবংশ-পুরাণের কোনই সম্পর্ক নাই। কবি সিলেট অঞ্চলের লোক ছিলেন। কাব্যটিতে সরল কবিত্বের পরিচয় আছে, তবে কৃষ্ণকীর্তনের মত, ভাবের দিক দিয়া সব সময় এখনকার পাঠকদিগের রুচিকর নহে। ভবানীদাস ঘোষের লেখা কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্য অপেক্ষাকৃত বহুল প্রচারিত ছিল। অভিরাম দত্তের 'গোবিন্দ বিজয়' ভাগবত-অনুসারী।

এইসময় ছোটবড় অনেকগুলি জীবনীগ্রন্থ লেখা হইয়াছিল। সেগুলিতে প্রধানত শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহান্তের কথাই আছে। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' বড় বই। কিন্তু বইটির প্রামাণিকতা সন্দেহজনক। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য যদুনন্দন দাসের 'কর্ণামৃত' বইটি আকারে ছোট, বিষয়ে প্রেমবিলাসের মত। এই

ধরণের আর একটি বই গুরুচরণ দাসের 'প্রেমামৃত'। শ্রীনিবাস আচার্যের পত্নীর আদেশে বইটি লেখা হইয়াছিল।

নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী ও পুত্র বীরচন্দ্রের মহিমা বর্ণন করিয়া এক বৃন্দাবন দাস 'নিত্যানন্দবংশবিস্তার' রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দ বীরচন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া একটি ছোট বই লিখিয়াছিলেন 'বীররত্নাবলী' নামে।

গোপীবল্লভ দাসের 'রসিকমঙ্গল' শ্যামানন্দের ও তাঁহার প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের জীবনী। গ্রন্থকার রসিকানন্দের শিষ্য ছিলেন। রসিকমঙ্গলে ঐতিহাসিক উপাদান কিছু আছে।

শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবী নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর মত বৈষ্ণবমহান্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইহার এক শিষ্য, কর্ণানন্দ-রচয়িতা, যদুনন্দন দাস সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনলস ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের লেখা কয়েকখানি কৃষ্ণলীলাকাব্য ও নাটক বাঙ্গালা পদ্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত', রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ('রসকদম্ব' নামে) ও 'দানকেলীকৌমুদী'। বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্যও এইভাবে অনুদিত হইয়াছিল।

নরোত্তম দাস এবং তাঁহার অনুসরণে কোন কোন বৈষ্ণব ছোট ছোট "কড়চা" বই লিখিয়াছিলেন বৈষ্ণব-সাধকদের শিক্ষার জন্য। এগুলির কোন কোনটিতে ভাঙ্গা গদ্যের ব্যবহার আছে।

বিবিধ পুরাণের অনুবাদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের উদ্যোগে তাঁহার সভাপণ্ডিত-কবি সিদ্ধান্তসরস্বতীর অনূদিত 'নারদীয়-পুরাণ' উল্লেখযোগ্য।

৪. মহাভারত ও রামায়ণ

প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদের মধ্যে কৃত্তিবাসের পরে কাশীরাম সমধিক প্রসিদ্ধ। কাশীরাম জাতিতে কায়স্থ, পদবী দেব। কাশীরামের পিতৃভূমি ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রাবনী বা ইন্দ্রানী পরগনার

মধ্যে সিঙ্গি (বা সিদ্ধি) গ্রামে। কাশীরামের পিতা সপরিবারে জগন্নাথ দেখিতে আসিয়াছিলেন। আর তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যান নাই, মেদিনীপুর জেলার সীমান্তে কোন গ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন। কাশীরামের উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে, আধুনিক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হরিহরপুরে ইঁহাদের গুরুবাড়ি ছিল। নিবাসগ্রামও ইহাই অথবা কাছাকাছি কোন গ্রাম ছিল।

কাশীরামেরা তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস বা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, মধ্যম কাশীরাম, কনিষ্ঠ গদাধর। তিন ভাইই লেখক ছিলেন। বড় ভাই শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর অল্পবয়সে বৈরাগী হইয়া যান। ইঁহার প্রণীত দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। একখানি 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'—ভাগবত অবলম্বনে লেখা বর্ণনামূলক কৃষ্ণলীলাকাব্য। দ্বিতীয়টির নাম 'ভক্তিভাবপ্রদীপ'। এখানি হইতেছে তাঁহার গুরুর লেখা 'ভক্তিভাবপ্রদীপ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। নিত্যানন্দের এক প্রধান পারিষদ সুন্দরানন্দের পুত্র জয়গোপাল ইঁহার গুরু ছিলেন।

সমগ্র মহাভারত-পাঞ্চালী এখন কাশীরামের নামে প্রচলিত হইলেও কাশীরাম চারি পর্বের বেশি রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

> আদি সভা বন বিরাটের কত দূর
> ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর।

এই লোকোক্তি যে অমূলক নয়, তাহা নন্দরাম দাসের উদ্যোগ-পর্বের একটি প্রাচীন পুঁথি হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। নন্দরাম লিখিয়াছেন—

> কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা
> ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা।
> ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিঁতো খুল্লতাত
> প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ।
> আয়ুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক
> রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক।
> ত্রিপথগা[১] যাই আমি কহিয়া তোমারে
> রচিবে পাণ্ডব-কথা পরম সাদরে।

নন্দরামের পিতার নাম নারায়ণ। নন্দরাম বোধ হয় কাশীরামের জ্ঞাতিভ্রাতার পুত্র।

---

১ গঙ্গা। অর্থাৎ গঙ্গাতীর, গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী অথবা প্রয়াগ।

নন্দরামও পাণ্ডববিজয় সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। প্রচলিত কাশীদাসি মহাভারতের শান্তি ও স্বর্গারোহণ পর্ব দুইটি কৃষ্ণানন্দ বসুর রচনা বলিয়া জানা গিয়াছে। অবশ্য পরবর্তী কালে সর্বত্র কাশীরামের ভনিতা বসিয়াছে।

কাশীরামের পাণ্ডববিজয় অবলম্বনে বাঙ্গালায় লেখা মহাভারতগুলির মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। রচনাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় অবধি ইহা সমান সমাদর ও মর্যাদা পাইয়া আসিতেছে। বাঙালীর নৈতিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উৎস কাশীরামের কাব্য। এ বিষয়ে কৃত্তিবাসের পরেই কাশীরামের গৌরব। তবে একবিষয়ে কাশীরামের জিত। এখন কৃত্তিবাসের মূল রচনা একেবারে নিখোঁজ, কাশীরামের রচনা প্রথম চারি পর্বের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য নয়।

কাশীরামের ভারত-পাঞ্চালীর আদি-পর্ব সম্পূর্ণ হয় ১৫২৪ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে)। ইহার দুই বৎসর পরে বিরাট-পর্ব শেষ হইয়াছিল। তাহার অল্প কিছুকাল পরেই কবি পরলোকগমন করেন।

কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের রচিত কাব্যের নাম 'জগন্নাথমঙ্গল' (সংক্ষেপে 'জগৎমঙ্গল')। এই গ্রন্থে পুরীর জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যসূচক পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনী কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও পাইয়াছি। জগন্নাথমঙ্গল-রচনা সমাপ্ত হয় ১৫৬৪ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে)। গদাধর দাস তখন কটকে থাকিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা আর একটি জগন্নাথমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। উত্তরপূর্ববঙ্গ-নিবাসী চন্দ্রচূড় আদিত্য সে কাব্যটি ১৫৯৮ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও অন্তত দুইজন কবি জগন্নাথমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

কাশীরাম ছাড়া আরও কয়েকজন কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রচনা পরে কাশীরামের রচনায় মিশিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণানন্দ বসুর পাণ্ডববিজয় কাব্যের শুধু শান্তি ও স্বর্গারোহণ পর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। অনেকে আবার জৈমিনীয়-সংহিতা অনুসারে অশ্বমেধ-পর্বই রচনা করিয়াছিলেন। কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের

সভাশ্রিত কবি বিশারদ চক্রবর্তী বন ও বিরাট পর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন ১৫৩৪ ("বেদ বহ্নি বাণ চন্দ্র") শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে)। নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ছিল। ইঁহার কাব্যের বিভিন্ন পর্বের অনেক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কাশীরামের কাব্যের তুলনায় নিত্যানন্দের কাব্য আকারে বেশ ছোট।

কোচবিহারের রাজাদের সভায় পড়িবার জন্য, মহাভারত অবলম্বনে একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে পীতাম্বরের ও রাম সরস্বতীর এবং সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় বিশারদ চক্রবর্তীর রচনার উল্লেখ করিয়াছি। পরেও এই কাজ চলিতে থাকে। মহারাজা বীরনারায়ণের রাজ্যকালে (১৬২৭-৩২) রামকৃষ্ণ কবিশেখর কিরাত-পর্ব রচনা করেন। মহারাজা প্রাণনারায়ণের আদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ সমগ্র মহাভারত-পাঞ্চালী রচনা শুরু করেন। এই কাজে সহায়তা ও অনুবর্তন করিয়াছিলেন দ্বিজ রামেশ্বর ও তৎপুত্র কৃষ্ণ মিশ্র। উত্তরবঙ্গে শ্রীনাথের গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দুই একখানি রামায়ণ-কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অদ্ভুত-আচার্যের রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অদ্ভুত-আচার্যের বই উত্তরবঙ্গে খুব সমাদর লাভ করিয়াছিল। এমন কি, কৃত্তিবাসের প্রচলিত সকল সংস্করণেও অদ্ভুত-আচার্যের গ্রন্থের কোন না কোন অংশ ঢুকিয়া গিয়াছে। কবির আসল নাম ছিল নিত্যানন্দ আচার্য। ইঁহার নিবাস ছিল পাবনা জেলায় অমৃতকুণ্ডা গ্রামে। অদ্ভুত-রামায়ণ অবলম্বনে পাঞ্চালী লিখিয়াছিলেন বলিয়া কবি "অদ্ভুতাচার্য" নামে প্রসিদ্ধ হন। এই কারণে পরে রামশঙ্কর আচার্যও তাঁহার কাব্যে অদ্ভুত-আচার্য ভনিতা ব্যবহার করিয়াছেন। "দ্বিজ" লক্ষ্মণ এবং কৈলাস বসুও অদ্ভুত-রামায়ণ অবলম্বনে রামকথা রচনা করিয়াছিলেন।

ভুলুয়ার রাজা জগৎমাণিক্যের সভাসদ্ ভবানীনাথ অধ্যাত্ম-রামায়ণ অবলম্বনে রামকথা লিখিয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছেন যে, রচনাকার্যে ব্যাপৃত থাকার কালে তিনি প্রত্যহ রাজসভা হইতে "দশ মুদ্রা" পাইতেন। সেকালে টাকা এখনকার মত শস্তা ছিল না। "মুদ্রা" সম্ভবত রূপার নয়, তামার।

৫. শিব দুর্গা ও মনসা মাহাত্ম্য

সপ্তদশ শতাব্দীতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাব্য ("মঙ্গল") রচনার দিকে খুব ঝোঁক পড়িয়াছিল। কতকগুলি নূতন "মঙ্গল"ও এই সময়ে প্রথম দেখা দিল। পুরাতন "মঙ্গল" এর মধ্যে মনসামঙ্গল বেশি লোকরোচক ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সব মনসামঙ্গল লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে একখানি সবচেয়ে সুলিখিত। কবির নাম কেতকাদাস, মাঝে মাঝে নিজেকে ক্ষেমানন্দও বলিয়াছেন। এই লইয়া একটা সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। কোনটি কবির আসল নাম? কেতকাদাস না ক্ষেমানন্দ? কেতকাদাস যদি নাম হয় তবে বুঝিতে হইবে যে কবিরা মনসার পূজারী ছিলেন ("কেতকা" মনসার নামান্তর)। আর যদি ক্ষেমানন্দ নাম হয় তবে বুঝিতে হইবে যে কবি মনসার উপাসক ছিলেন। আরও দুইএকজন মনসামঙ্গল রচয়িতা নিজেকে ক্ষেমানন্দ বলিয়াছেন, কদাপি "কেতকাদাস" বলেন নাই। সুতরাং আলোচ্য কবির নাম কেতকাদাস ধরিলে আর কাহারও সহিত গোলমাল হয় না। কেতকাদাসের নিবাস ছিল দক্ষির রাঢ়ে, দামোদরের তীরে কোন গ্রামে, সম্ভবত বর্ধমান ও হুগলী জেলার সীমান্তে, সেলিমাবাদের নিকটে। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা বারা খানের মৃত্যুর অল্প কিছু কাল পরে কাব্যটি রচিত বলিয়া বোধ হয়।

দেবদেবীমাহাত্ম্য-কাব্য ইষ্টদেবতার স্বপ্নাদেশে রচিত বলিয়া রাঢ়ের কবিরা দাবি করিতেন। মুকুন্দরামের পর হইতে যে সকল পশ্চিমবঙ্গের কবি "মঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন, দেবতার নিগ্রহ-অনুগ্রহ উপলক্ষ্য করিয়া বিস্তৃত আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণ দেওয়া তাঁহাদের একটা রীতি দাঁড়াইয়া যায়। এই বিবরণগুলি সবই মুকুন্দরামের আত্মবিবরণের ছাঁচে ঢালা। অর্থাৎ স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষের বা জমিদারের লাঞ্ছনায়, অথবা ঘরের লোকের তাড়নায় কবি ঘর ছাড়িতে বাধ্য হইতেছেন এবং দেবতা পথের সাথী হইয়া তাঁহাকে প্রথমে নিগৃহীত করিয়া পরে অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেছেন আর নিজের মাহাত্ম্যকাব্য রচনা করিতে বাধ্য করিতেছেন। কিন্তু মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক, তাহাতে দেবতার রুদ্রমূর্তি নাই। অনুকরণকারীদের রচনায় দেবতা প্রথমে গরম তাহার পর কবিকে কাবু করিয়া নরম। এই ধরণের

আত্মপরিচয় কেতকাদাসের কাব্যেও পাওয়া যায়। কেতকাদাসের আত্মপরিচয়ের পরিচয় দিতেছি। ইহাতে সেকালের গ্রাম্যজীবনের একটু ছবি ধরা পড়িয়াছে। আরম্ভ মুকুন্দরামের মত — "শুন ভাই পূর্বকথা"।

কবিরা বাস করিতেন বীরভদ্র (পাঠান্তরে বলিভদ্র) মহাশয়ের তালুকে। তিন নাবালক পুত্র রাখিয়া বীরভদ্রের মৃত্যু হইলে আস্কর্ণ (অর্থাৎ আস্‌করণ) রায় কর্তা হইল (নাম হইতে মনে হয় যে, ইনি অবাঙ্গালী ক্ষেত্রী বংশোদ্ভুত)। ছেলেদের গুরুমহাশয় প্রসাদের উপর তালুকের ভার পড়িল। প্রসাদ যেন মুকুন্দরামের সময়ের রায়জাদা উজীরের মত। তাহার গোমস্তাগিরিতে প্রজাদের ভিটামাটি উচ্ছন্ন হইতে বসিল।

সেলিমাবাদ সরকারের ফৌজদার বারা খান এই সময়ে যুদ্ধে নিহত হইলে অরাজকতার অন্ত রহিল না। তখন কেতকাদাসের পিতা শঙ্কর মণ্ডল গ্রাম পরিত্যাগ ছাড়া উপায় দেখিলেন না। ইঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আস্কর্ণ রায়ও বলিলেন—

শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি
গ্রাম ছাড় রাত্র্যের ভিতরে।

প্রসাদ খবর পাইয়া খুশি হইল। সে মুখে খুব আশ্বাস দিল কিন্তু সঙ্গে এক মণ ধানও লইতে দিল না।

শঙ্কর মণ্ডল সপরিবারে ভিটা ছাড়িলেন। তাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া রাতারাতি চলিয়া সকাল হইলে জগন্নাথপুরে পৌছাইলেন। সেখানে, মুকুন্দরামের আশ্রয়দাতা যদু কুণ্ডু তেলির মত, লম্বোদর ত্রেলি "উত্তরিতে দিল ঘর হাঁড়ি চালু সিধা গুয়া পান"। তাহার পর সেই গ্রামেই রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই ভারামল্ল (অর্থাৎ বিহারী মল্ল) তাঁহাদের অল্প কিছু ভূসম্পত্তি দিয়া বাস করাইলেন। একদিন কেতকাদাসের মা তাঁহার দুই পুত্রকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কি নিজেদের রাজার বেটা ভাবিয়াছ? না পরের বাড়ি মনে করিয়াছ? ঘরে এককুটাও খড় নাই। যাও, খড় কাটিয়া আন গিয়া।'

মাতার ভৎর্সনায় ছোট ভাই অভিরামকে লইয়া কেতকাদাস খড় কাটিতে চলিল। তখনও ছয় দণ্ড (অর্থাৎ ঘন্টা দুই) বেলা আছে। সন্ধ্যা হইতে

দেরি নাই, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দুই ভাই গ্রামের উত্তরে যে জলা মাঠ ছিল সেখান হইতে উলুখড় কাটিয়া আনিতে গেল।

সেখানে গিয়া দেখা গেল, পাঁচ ছয় জন ছেলে খোলা দিয়া জল সিঁচিয়া ডোবায় মাছ ধরিতেছে। দুই ভাই খড় কাটিবার কথা ভুলিয়া গিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া মাছধরা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কেতকাদাসেরও মাছ ধরিতে লোভ হইল। সে ছেলেদের কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল "মৎস্য ধর আমা লৈয়া"। ছেলেরা বলিল, "ইহা নাহি হয়"। তখন কেতকাদাস খুব অন্যায় কাজ করিল। ছেলেরা—

যত মৎস্য ধর্যাছিল সকল কাড়িয়া নিল
অল্পবুদ্ধি মনে নাহি ভয়।

কেতকাদাস তখনই ভাইকে দিয়া লুটের মাল ঘরে পাঠাইয়া দিল। ছেলেরা খানিকক্ষণ গালাগালি দিয়া শেষে পরাজয় মানিয়া যে যাহার ঘর চলিয়া গেল। কেতকাদাস একেলা সেই জলায় খড় কাটিতে রহিয়া গেল। আচম্বিতে ঝড় উঠিল। মাঠে দুইচারিজন যাহারা ছিল তাহারা আশ্রয়ের দিকে ছুটিল। কেতকাদাস কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে কোথা হইতে এক মুচি মেয়ে আসিয়া হাজির হইল (তিনি আর কেহ নন, মনসা)। কেতকাদাসের পরিচয় লইয়া মুচিনী একখানা কাপড় দেখাইয়া বলিল, এই কাপড়খানা কিনিবে? সঙ্গে টাকা আছে? কেতকাদাস বলিতেছেন—

বসন দেখাইয়া মোরে কপট চাতুরি করে
ফিরা়া চাহি নাহি দেখি পিছে।

মাঝমাঠে মুচিনীর এই কাণ্ড দেখিয়া তাহার তাক লাগিয়া গিয়াছে। পায়ে পিঁপিড়ার কামড়ে চটক ভাঙ্গিল। হেঁট হইয়া পিঁপিড়া সরাইয়া মাথা তুলিয়া দেখিল, মুচিনী নাই। তখন ভয় হইল। দেবী তখন নিজের স্বরূপ দেখাইয়া ভয় ভাঙ্গাইলেন আর বলিলেন, 'আমার এই যে রূপ দেখিলে, ইহা কাহাকেও বলিও না, বলিলে ভালো হইবে না। তুমি আমার মঙ্গল রচনা করিয়া গাহিয়া বেড়াও। তোমার ভালো হইবে।' মনসা কেতকাদাসকে যে স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন তাহা দেবী নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া কবি তাহা বর্ণনা করেন নাই।

কেতকাদাস শিক্ষিত কবি ছিলেন। তাঁহার শিক্ষার পরিচয় কাব্যটিতে যথেষ্ট আছে। চাঁদো সদাগরের ও বেহুলার চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। ছোট বড় কোন ভূমিকাই অতিমানুষ অথবা অমানুষ হয় নাই।

আর এক ক্ষেমানন্দ-রচতি (-ইনি নিজেকে কেতকাদাস বলেন নাই-) একটি নিতান্ত ছোট মনসামঙ্গল-কাব্য মানভূমের পুরুলিয়া অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত দুইটি পুঁথিই নাগরী অক্ষরে লেখা। কাব্য-হিসাবে বইটি নিন্দনীয় নয়। তবে রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে যাইবে না।

বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলের পুঁথি বীরভূম-বর্ধমান সীমান্ত ও মানভূম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ের সঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে বেশ মিল আছে। কবির নাম ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানিতে পারি যে, তিনি রাম-উপাসক ছিলেন। সম্ভবত রামায়ণও গাহিতেন। বিষ্ণু পালের কাব্য যে নিতান্ত সাধারণ শ্রোতার জন্য লেখা হইয়াছিল কাব্যটির ভাবে ও ভাষায় তাহার পরিচয় বেশ আছে। যাহাকে ইংরাজীতে বলে 'ফোক্ লিটারেচর' সেই জনপদ-সাহিত্যের প্রাচীন এবং দুর্লভ উপাদান ইহাতে খুব আছে। কৌতুকরসের যোগানও যথেষ্ট আছে। তবে সে রস নিতান্ত তরল। একটু উদাহরণ দিতেছি। কোন্দলের দেবতা নারদ সাজসজ্জা করিয়া কোন্দল ছড়াইতে বাহির হইতেছেন। নারদের ব্যবহার কিছুতেই মুনি-ঋষির মত নয়। প্রথমে তাঁহার বাহন ঢেঁকির সাজন বর্ণনা। ভাষায় স্থানীয় কথ্য ভাষার রূপ লক্ষণীয়।

> মুড়া ঝাঁটা বান্ধ্যে[১] দিল বলিঞা লেঙ্গুর[২]।
> পুবান তালাই[৩] দিল পালান ভিড়িঞা[৪]
> সামুকের খুলি[৫] দিল ঘুঙ্গুর বলিঞা।
> দুটাকে দুখানে কুলা দিল রে বান্ধিঞা
> পক্ষরাজ ঘোড়া জাবে উধাউ করিঞা।

---

১ বান্ধিয়া। ২ লেজ। ৩ তালপাতার চেটাই। ৪ আঁটিয়া। ৫ খোলা।

আলকুশির গুড়া দিল বগলে দাবিঞা[1]
ঢিকিতে[2] চাপেন মুনি দু কাঠি বাজাঞা।
যাত্রা করিঞা নারদ মুনি জায়
মুনিদের ছেল্যাগুলি ইধুলি[3] খেলায়।
তাহাদের চুলে ধর‍্যা ঢিকিতে ঢুসায়[4]
মাঞিও বাপু কর‍্যা[5] ছেল্যা ঘরকে পালায়।
ছেল্যার কান্দন শুনি রেস্যানি[6] বেরায়[7]
আলকুশি উড়াইঞা দিল তাদের গায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ও পশ্চিম রাঢ়ে আরও কয়খানি মনসামঙ্গল লেখা হইয়াছিল। কালিদাসের মনসামঙ্গল কবির বন্ধু কার্তিক ব্রাহ্মণের অনুরোধে লেখা হইয়াছিল। রসিক মিশ্র তাঁহার কাব্যকে প্রায়ই বলিয়াছেন 'জগতীমঙ্গল' (জগতী মনসার নামান্তর)। রসিকের উপাধি ছিল শ্রীকবিবল্লভ। "দ্বিজ" কবিচন্দ্রও মাঝে মাঝে তাঁহার মনসামঙ্গল-কাব্যকে 'জগতীমঙ্গল' এবং নিজেকে "ক্ষেমানন্দ" বলিয়াছেন। সীতারাম দাস ছিলেন কায়স্থ। ইঁহার মনসামঙ্গল-কাব্যের রচনাসমাপ্তিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক। সীতারাম অনেক বিষয়ে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কাব্যের স্পষ্ট অনুসরণ করিয়াছেন। কাব্যটিকে তিনি মাঝে মাঝে 'কমলাকীর্তন' বলিয়াছেন (কমলা মনসার নামান্তর)। সীতারাম দাস প্রথমে একটি ধর্মমঙ্গল-কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহার আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের মধ্যে জগৎজীবন ঘোষালের রচনা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। রচনায় গ্রাম্যতার বাড়াবাড়ি আছে। জগৎজীবন তাঁহার পূর্ববর্তী কবি "তন্ত্র" বিভূতির কাছে অত্যন্ত ঋণী।

"দ্বিজ" রামদেব ও "দ্বিজ" হরিরামের কাব্য ছাড়া আর কোনও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয় নাই। "দ্বিজ" জনার্দন-বিরচিত ব্রতকথাজাতীয় নিতান্ত ক্ষুদ্র মঙ্গলচণ্ডী-পাঁচালী। রামদেব ত্রিপুরা অঞ্চলের লোক ছিলেন। কাব্যটি উল্লেখযোগ্য।

---

১ গুঁজিয়া। ২ ঢেঁকিতে। ৩ বসিয়া বসিয়া একরকম খেলা। ৪ ঠুকিয়া দেয়। ৫ মা বাবা বলিয়া ডাকিয়া। ৬ ঋষিআনী, ঋষিপত্নী। ৭ বাহির হইয়া আসে।

এই সময়ে রচিত দেবীমাহাত্ম্যসূচক অন্য সকল রচনাই মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী (বা চণ্ডী) অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। "দ্বিজ" কমললোচনের 'চণ্ডিকামঙ্গল' (বা 'চণ্ডিকাবিজয়'), অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের 'দুর্গামঙ্গল' এবং রূপনারায়ণ ঘোষের 'দুর্গামঙ্গল' এই জাতীয় গ্রন্থ। কমললোচনের নিবাস ছিল রঙ্গপুর জেলার ঘোড়াঘাট পরগণায়। ভবানীপ্রসাদ এবং রূপনারায়ণ দুইজনেই ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন। গোবিন্দদাসের 'কালিকামঙ্গল'ও এই ধরণের কাব্য। উপরন্তু ইহাতে বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান, মীননাথের কাহিনী এবং বিদ্যাসুন্দরের গল্প আছে। ইনিও পূর্ববঙ্গের লোক।

শিবের গৃহস্থালীবিষয়ক অথবা শিবমাহাত্ম্যসূচক ছোট বড় বই কয়েকখানি এই সময়ে লেখা হইয়াছিল। "দ্বিজ" রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' নিতান্ত ছোট বই। ইহাতে শিবচতুর্দশীর কাহিনীটুকুই আছে। ইনি চাটিগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। রামকৃষ্ণ রায়ের 'শিবায়ন' (বা 'শিবমঙ্গল') বেশ বড় বই। কবির উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। নিবাস আধুনিক হাওড়া জেলায় রসপুর গ্রামে। রচনায় বৈশিষ্ট্য আছে।

৬. নবদেবতা-মঙ্গল

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন ও অভিজাত দেবতা বলিতে এই পাঁচ জন—বিষ্ণু, শিব, চণ্ডী, মনসা ও ধর্ম। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম তিন দেবতার প্রাধান্য বেশি কেননা ইঁহাদের মাহাত্ম্য সংস্কৃত পুরাণে গীত, বাঙ্গালা দেশের বাহিরে স্বীকৃত এবং ইঁহারা সমাজশাসক ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত। মনসা ও ধর্ম অল্পবিস্তর দেশীয় দেবতা বলিয়া ইঁহাদের পূজা বিশেষ করিয়া জনপদসমাজেই বেশি স্বীকৃত ছিল। পাঁচ দেবতার মাহাত্ম্যগাথা অথবা লীলাকথা অবলম্বনে গেয় আখ্যায়িকা কাব্য ("মঙ্গল") পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল। সে কথা আগে আলোচনা করিয়াছি।

ছোটখাট দেবতা অনেক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিষ্ণুশিবের মতই প্রাচীন দেবতা। এসব দেবতার পূজা সাধারণত মেয়েলি ব্রত অথবা সর্বজনীন সামাজিক উৎসব রূপেই প্রচলিত ছিল। ধর্মভাবের অথবা ভক্তিরসের গাঢ়তা বেশি না থাকায় ইঁহারা প্রথম শ্রেণীর দেবতা হইতে না পারিয়া

ক্রমশ নামিয়া গিয়াছেন। উদাহরণ হিসাবে ইন্দ্রের নাম করিতে পারি। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র সব চেয়ে বড় দেবতা। তাঁহার মাহাত্ম্য বিষ্ণু-রুদ্রের চেয়েও বেশি। একদা ইন্দ্রের প্রাধান্য যে বিষ্ণুর উপরে ছিল বিষ্ণুর "উপেন্দ্র" নামে তাহার স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে। ইন্দ্র ছিলেন বিজয়ের এবং পুষ্টির দেবতা। আমাদের দেশে পুষ্টি বলিতে কৃষিশ্রী। সুতরাং ইন্দ্র স্বভাবতই কৃষির, অর্থাৎ বৃষ্টির ও শস্যের দেবতায় পরিণত হইলেন। ইন্দ্রদেবতার এই পরিণতির চিহ্নাবশেষ রহিয়া গিয়াছে "ইঁদ" নামে এবং তাঁহার পূজার পরিণাম হইয়াছে কুমারী মেয়েদের 'ইতু' ব্রতে ('ইতু' আসিয়াছে "ইদু" হইয়া ইঁদ হইতে)। তাহাও এখন লুপ্তপ্রায়।

চিরকাল ধরিয়া আমাদের দেশের সাধারণ লোকে অপদেবতাকেও ভয়েভক্তির অর্ঘ্য দিয়া আসিয়াছে। পূজা পাইতে পাইতে কোন কোন অপদেবতা উপদেবতায় উন্নীত হইয়াছিলেন। এইরকম কোন কোন উপদেবতা মনসা ও ধর্ম ঠাকুরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। বাকিগুলি অপদেবতা-উপদেবতা রূপে ঘরের আনাচেকানাচের অন্ধকারে অথবা বাহিরের বনেবাদাড়ের ঝোপঝাড়ে লুকাইয়া পূজা আদায় করিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের একজন কলিকাতা-সন্নিকটবাসী লেখক তিনটি উপদেবতার "মঙ্গল" লিখিয়া তাঁহাদের পূজ্য দেবতাসভার উচ্চশ্রেণীতে তুলিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণরাম দাস। নিবাস নিমতা।

কৃষ্ণরামের লেখা পাঁচখানি "মঙ্গল" পাওয়া গিয়াছে—'কালিকামঙ্গল', 'ষষ্ঠীমঙ্গল', 'রায়মঙ্গল', 'শীতলামঙ্গল' ও 'কমলামঙ্গল'। কালিকামঙ্গল প্রথম রচনা। ইহাতে দেবী কালীর মাহাত্ম্যখ্যাপক বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটি সায়িস্তা খানের সুবেদারির সময়ে (১৬৬৯-৭০ অথবা ১৬৭৯-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, সম্ভবত প্রথম দফাতেই) রচিত। কবির বয়স তখন বিশ বৎসর। দ্বিতীয় রচনা ষষ্ঠীমঙ্গল ষষ্ঠীর ব্রতকথা এবং ক্ষুদ্র নিবন্ধ, ১৬০১ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত। তৃতীয় রচনা রায়মঙ্গল। ইহাতে দক্ষিণ বঙ্গের অনূপ ও জাঙ্গল অঞ্চলে ভয়ে পূজিত ব্যাঘ্রাধিদেবতা দক্ষিণরায়ের ও সেইসঙ্গে এই অঞ্চলের মুসলমানদের সম্মানিত পীর বড়-খাঁ গাজী সাহেবের মাহাত্ম্যকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। আনুষঙ্গিকভাবে এই অঞ্চলের কুম্ভীরদেবতা কালুরায়ের কথাও আছে।

দক্ষিণরায়ের পূজা সুন্দরবন অঞ্চলে অর্থাৎ চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশে ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে, এবং এই প্রদেশে বড়-খাঁ গাজী গান এখনও উৎসব উপলক্ষ্যে গীত হয়। একদা দক্ষিণরায়-কালুরায় এবং বড়-খাঁ গাজীর মাহাত্ম্যগাথা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গে অজ্ঞাত ছিল না। নিম্নবঙ্গে যখন জঙ্গল কাটিয়া বসবাস ও আবাদ শুরু হয়, তখন প্রধান বিপদ ছিল—ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর। পরেও যাহারা কাঠ কাটিতে, মধু আনিতে ও নুন জমাইতে যাইত তাহাদেরও বাঘ-কুমীরের ভয় ছিল। আশেপাশের চাষীদেরও ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলে এই দুই নূতন দেবতার পূজার প্রচলন দ্রুত হইয়াছিল। দক্ষিণরায় আসলে বাঘদেবতা নয়, দক্ষিণ দিকের ক্ষেত্রপাল। নামের অর্থ, দক্ষিণ দিকের অধিপতি। বাঘ ইঁহার বাহন। প্রথমে কালুরায় (অর্থাৎ কালো রাজা) দক্ষিণ-ক্ষেত্রপালেরই নাম ছিল (উত্তর দিকের ক্ষেত্রপাল ছিলেন গোরা বা গোরাচাঁদ)। পরে তিনি স্বতন্ত্র দেবতা হইয়াছেন। এখন দক্ষিণরায় গোরা, কালুরায় কালো। বড়-খাঁ গাজী গোরা ক্ষেত্রপালেরই অন্য সংস্করণ। তাই তাঁহার নামান্তর পীর গোরাচাঁদ।

কৃষ্ণরামের আগে এবং পরে কেহ কেহ রায়মঙ্গল লিখিয়াছিলেন। সে সব রচনা মূল্যহীন। কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল ১৬০৮ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হয়। কাব্যটির কাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি।

বড়দহের (আসলে বরদা পরগণার) বণিক্ দেবদত্ত জলপথে সিংহল হইতেও দূরবর্তী তুরঙ্গ শহরে বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর ধনপতি যেমন সমুদ্রবক্ষে কালিদহে "কমলে কামিনী" দৃশ্য দেখিয়াছিল, দেবদত্তও সেইরূপ আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়াছিল,—সাগরমধ্যে রাজদহে চর পড়িয়াছে, তাহার উপর রম্য বসুধা। তাহাতে সোনার ঘরে সিংহাসনে নারায়ণ (অর্থাৎ দক্ষিণরায়) বসিয়া, বাম পাশে পত্নী লীলাবতী (বা নীলাবতী)।

তুরঙ্গ-পাটনে পৌঁছিয়া কথায় কথায় এই দৃশ্যের প্রসঙ্গ দেবদত্ত রাজার কাছে তুলিল এবং তাঁহাকে দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু দেবদত্ত প্রতিজ্ঞামত রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাইতে পারিল না। ফলে সে আজীবন কারারুদ্ধ হইল। এভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল। দেবদত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার কোন বার্তা না পাইয়া সে নিজেই তুরঙ্গ শহরে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে। জাহাজ

গড়িবার জন্য রতাই নামক "বাউল্যা" অর্থাৎ কাঠুরিয়াকে বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিতে হুকুম করিল। সেই বনে দক্ষিণরায়ের প্রিয় একটি বড় গাছ ছিল (অর্থাৎ এই গাছের তলায় দক্ষিণরায়কে পূজা দেওয়া হইত)। সে গাছটি কাটাতে দক্ষিণরায়ের এক অনুচর রায়ের নিকট গিয়া অভিযোগ করিল। ক্রুদ্ধ হইয়া রায় বড় বড় ছয় বাঘকে পাঠাইলেন। তাহারা রতাইয়ের ছয় ভাইকে মারিয়া ফেলিল। রতাই ভ্রাতৃশোকে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে দক্ষিণরায় দৈববাণী দিলেন যে, তাঁহার প্রিয় তরু ছেদন করিয়া অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তিনি তাহার ছয় ভাইকে বধ করিয়াছেন। রতাই যদি পুত্রবলি দিয়া দক্ষিণরায়কে পূজা করে তবে তাহার ছয় সহোদর পুনর্জীবিত হইবে। রতাই শুনিয়া তদ্দণ্ডেই দক্ষিণরায়কে পূজা করিয়া পুত্রকে বলিদান দিল। তখন দক্ষিণরায় আবির্ভূত হইয়া রতাইয়ের পুত্র ও ছয় ভাইকে বাঁচাইয়া দিলেন।

রতাই কাঠ লইয়া আসিল। হনুমান এবং বিশ্বকর্মা আসিয়া নৌকা গড়িয়া দিল। পুষ্পদত্ত সাত ডিঙ্গা ভাসাইয়া সমুদ্রযাত্রা করিল। মাতা সুশীলার স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া দক্ষিণরায় পুষ্পদত্তকে সঙ্কটে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পথে পুষ্পদত্ত পীর বড়-খাঁ গাজীর মোকাম এবং দক্ষিণরায়ের পূজাস্থান দেখিল। এ বিষয়ে পুষ্পদত্ত কিছুই জানে না বলিয়া জানিতে কৌতুহল প্রকাশ করিলে কর্ণধার পীর ও দক্ষিণরায়ের কাহিনী, তাঁহাদের বিরোধ ও মিলনের ইতিহাস, সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

ধনপতি নামে পূর্বে এক সদাগর ছিল। সে বাণিজ্যে যাইবার পথে এই স্থানে নামিয়া শুধু দক্ষিণরায়ের পূজা করিল। পীরের পূজা না করায় অনেক ফকীর আসিয়া তাহাকে পীরের পূজা করিতে বলিল। বণিক্ কুবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া ফকীরদের মারিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহারা গাজীর নিকট গিয়া নালিশ করিল যে, দক্ষিণরায় আর তাঁহার ব্যাঘ্র-অনুচরদের প্রতাপে আর কেহ পীরকে সম্ভ্রম করিতেছে না, তাহারা অশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। গাজী ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, দক্ষিণরায়কে বাঁধিয়া আন। গাজীর আদেশে কালানল বাঘ ও ফকীরেরা গিয়া দক্ষিণরায়ের প্রতিমা ও পূজাস্থানের ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণকে মারধর করিয়া তাড়াইয়া দিল। বটে বেনে আসিয়া দক্ষিণরায়কে এই কথা জানাইলে দক্ষিণরায় তাঁহার

ব্যাঘ্র-সৈন্য লইয়া গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। গাজীর সৈন্যও সব বাঘ। রায়ের সেনাপতি বাঘ হীরা, গাজীর সেনাপতি বাঘ দাউদ খান। উভয় দলে যুদ্ধ বাধিল, গাজীর দল হারিয়া পলাইয়া গেল। গাজী তখন স্বয়ং রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। উভয়ের মধ্যে ঘোর লড়াই বাধিল। পরাজিতপ্রায় হইয়া গাজী রুখিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাত হাজার বাঘ মারিয়া অবশেষে রায়ের গলায় কোপ বসাইলেন। দক্ষিণরায়ের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধড়ে লাগিয়া যেমন ছিল তেমনিই হইল। পুনরায় যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধের প্রকোপে পৃথিবী রসাতলে যায় দেখিয়া অবশেষে ঈশ্বর অর্ধ-কৃষ্ণ অর্ধ-পয়গম্বর বেশে আবির্ভূত হইলেন।

অর্ধেক মাথায় কালা[1] একভাগ চূড়া টালা[2]
বনমালা ছিলিমিলি[3] সাথে
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধ নীলমেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাথে।
এইরূপ দরশন পাইয়া সে দুইজন
ধরিয়া পড়িল দুই পায়
তুলিয়া অখিলনাথে বুঝাইয়া হাথে হাথে
দুইজনে দোস্তানি[4] পাতায়।

দুইজনের মধ্যে সৌহার্দ্য সংস্থাপন করিয়া দিয়া ঈশ্বর তাঁহাদের অধিকার এইভাবে ভাগাভাগি করিয়া দিলেন—

এখানে দক্ষিণরার সব ভাটি অধিকার
হিজুলিতে কালুরার থানা
সর্বত্র সাহেব পীর সবে নোঞাইবে শির
কেহ তারে না করিবে মানা।

এই কাহিনী শুনিয়া পুষ্পদন্ত সে স্থান হইতে নৌকা ছাড়িয়া দিল। সমুদ্রে পড়িয়া রামেশ্বর ছাড়াইয়া কিছু দূরে সমুদ্রবক্ষে পিতার মত সেও সাগর মাঝে সোনার পুরীতে সেই আশ্চর্য রায়-অবতার দৃশ্য দেখিল। তাহার

১ টুপি। ২ পাগড়ি। ৩ ফকীরের জপমালা। ৪ বন্ধুত্ব।

পর গল্পের পরিণতি চণ্ডীমঙ্গলের অনুসরণ করিয়াছে। পুষ্পদত্ত রাজার কাছে প্রতিজ্ঞায় হারিয়া গিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। শেষে দক্ষিণরায়ের শরণ লওয়ায় তিনি আসিয়া পিতাপুত্রকে উদ্ধার করিলেন। তাহার পর যথারীতি রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পিতার সহিত পুষ্পদত্ত স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

কাব্য হিসাবে রায়মঙ্গল অকিঞ্চিৎকর। ইহার যে কিছু মূল্য তা বিষয়বস্তুর বিচিত্রতার, অর্থাৎ "ব্যাঘ্রবিদ্যার"র জন্য। দক্ষিণরায়-গাজীর সংঘর্ষে ও মিলনে হিন্দু-মুসলমানের ভাগবত সংঘাতের ও মিলনের কিছু প্রতিবিম্বন হয়ত আছে। রচনায় নূতনত্ব, গাজীর মুখে হিন্দীর ব্যবহার। যেমন, দক্ষিণরায়ের দূত লোহাজঙ্গ বাঘকে গাজীর ভর্ৎসনা—

কোপে কহেন গাজী কাঁহাকা আম্বক পাজি
জঙ্গুলি হয়েগা মহাদাপ
হররোজ চালু কেলা সাড়ে পাঁচ খায় ডালা
গোসাঞিও আপকি কহে আপ।

অর্থাৎ—'কোথাকার আহাম্মক পাজি! জংলি হইয়া মহাদর্প! প্রত্যেক দিন তো সাড়ে পাঁচ ডালা চাল-কলা খায়, আবার নিজেকে নিজে ঈশ্বর বলে!'

বাঘেদের পরাক্রম ও চাতুর্যের বর্ণনা কৌতুকাবহ। যেমন, দক্ষিণরায়ের কাছে হুড়কো-খসালিয়া (অর্থাৎ খিলখোলা) বাঘের জবানবন্দি—

হুড়ুকা-খসালে বাঘ তারপর কয়
রাত্রিযোগে হুড়ুকা খসাই তয়তয়[১]।
ঘরের ভিতর গিয়া আমি বড় রাড়[২]।
একে একে সমস্তগুলির ভাঙ্গি ঘাড়।

পুঁথি খণ্ডিত বলিয়া শীতলামঙ্গলের রচনাকাল জানা যায় নাই। বইটিতে দেবী শীতলার এবং তাঁহার পুত্র ব্যাধিরাজ বসন্তরায়ের মাহাত্ম্যকাহিনী আছে। কাহিনী তিনটি। প্রথমটিতে সপ্তগ্রাম অঞ্চলে প্রথম পূজাপ্রতিষ্ঠার কথা। বসন্তরায় বর্ধমান-নিবাসী বৈষ্ণব ব্যাপারী সাজিয়া মানিকপাটন সপ্তগ্রামে

১ সন্তর্পণে। ২ প্রচণ্ড।

ব্যাপারে চলিয়াছে। তাঁহার অনুচর ব্যাধিরা তিল মুগ মাষ মসুরি তেল হলুদা শসা-কাঁকুড় ইত্যাদি বিবিধ পণ্যদ্রব্য সাজিয়াছে। সেগুলি ছালায় করিয়া বলদের পিঠে চাপানো হইয়াছে আর বসন্তরায়ের প্রধান পাঁচ অনুচর গোরুগুলি তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। সবার পিছনে আছে ঘোড়ার পিঠে বসন্তরায়।

বলদেতে দিয়া ছালা গলাএ ত দিয়া মালা
পঞ্চপাত্র চালাইয়া যায়
হাতে লয়্যা পাকা দড়ি ছো ছো করি মারে বাড়ি
চল বাছা বলিয়া চালায়।
হয়বরে ব্যাধিরাজে চলিলা সবার পাছে
বেপারির হইয়া প্রধান
মায়ায় গমন হটে[১] জগাতর মূড়াঘাটে[২]
অবিলম্বে চলে গুণধাম।

ঘাটে মাশুল না দিয়া কিছু না বলিয়া ব্যাপারীরা চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া থানাদার ("জগাতি") মদনদাস কায়স্থ তাহাদের আটক করিল এবং জিনিসপত্র পেয়াদা দিয়া লুট করাইল। সেই সব দ্রব্য খাইয়া জগাতি ও তাহার লোকজন নানারকম কঠিন রোগে পড়িল এবং কাতরোক্তি করিতে লাগিল। তখন্ বসন্তরায় দেখা দিয়া ভর্ৎসনা করিল। তাহার পর আত্মপরিচয় দিয়া বলিল—

আমার ঘটে পূজা কর না পাইবে দুখ
অনেক বাড়িবেক তোর নানাজাতি সুখ।

মদনদাস শীতলা ও বসন্তরায়ের মন্দির তুলিয়া ঘটে পূজা স্থাপন করিল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাহিনীতে শীতলা-বসন্তরায়ের প্রতিমাপূজা প্রবর্তনের বৃত্তান্ত। একদিন নারদ আসিয়া শীতলাকে বলিল পৃথিবীতে তোমার পূজা তো তেমন প্রচার হইতেছে না। বিশেষ করিয়া তিন ব্যক্তি তোমার পূজা প্রচারের প্রধান অন্তরায়, একজন কাজী আর দুইজন রাজা।

---

১ উদ্ধতভাবে। ২ অর্থাৎ শুল্ক আদায়ের প্রথম ঘাটে।

নারদের কথায় দেবীর অনুচর ব্যাধিরা রুষ্ট হইয়া প্রথমে মুসলমানপাড়ায় হানা দিল। যখন মানুষ জন্তু সবাই রোগের প্রকোপে ছটফট করিতেছে তখন শীতলার প্রধান অনুচর জ্বরবাণ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া কাজীর কাছে গিয়া বলিল, শীতলার পূজা কর ভালো হইবে। কাজী তৎক্ষণাৎ রাজী হইল। বলিল—

বিচার করিয়া দেখি কোরাণ পুরাণ একি
সারদা বসতি সর্বঘটে
হিন্দু কি মোছোলমানে পয়দা একই স্থানে
আচারেতে জুদা জুদা[1] বটে।

গ্রামের মধ্যে উত্তম মন্দির তুলিয়া শীতলার ও বসন্তরায়ের মূর্তি গড়াইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার ব্যবস্থা করা হইল। সকলে ভালো হইয়া গেল। এ কাহিনীটি মনসামঙ্গলের হাসন-হোসেন পালার ছাঁচে গড়া।

তৃতীয় কাহিনীতে উজানির সাধু হৃষীকেশ বাড়িতে বাপমাকে রাখিয়া রাজা চন্দ্রশেখরের আদেশে হিরণ্যপাটনে চলিয়াছে। তাহার যাত্রাপথ ধনপতি-শ্রীপতির মতই। কালি-দহ পার হইয়া সিংহল বামে রাখিয়া রাজদহ তুরঙ্গ পাটন পিছে রাখিয়া সাধুর তরী মায়াদহে পড়িল। সেখানে তাহাকে ছলিতে শীতলা মায়া পাতিল।

সমুদ্রের মাঝে হৈলা পুরী
অপূর্ব রঙ্গের ঘর সিংহাসন মনোহর
নাচে গায় বারো বিদ্যাধরী।......
সেই তো পুরের মাঝে বিশাল বঁইচির গাছে
ফুটিয়াছে তাহাতে প্রবাল
সহচরীগণ মেলা বসিয়া তাহার তলা
শীতলা সহিত শিশুজাল।

এই দৃশ্য শুধু হৃষীকেশই দেখিল। হিরণ্যপাটনে পৌঁছিয়া সে কথায় কথায় রাজাকে মায়াদহের দৃশ্যের কথা বলিল। রাজা বলিল, দেখাইতে

১ পৃথক পৃথক।

হইবে। না দেখাইতে পারিলে প্রাণদণ্ড। হৃষীকেশ রাজাকে সেখানে লইয়া গেল। সে নিজে সে দৃশ্য দেখিতে লাগিল কিন্তু রাজা দেখিতে পাইল না। রাজা হৃষীকেশের নৌকা লুট করাইয়া তাহার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিল। কারাগারে পড়িয়া হৃষীকেশ প্রাণভয়ে দেবীকে ডাকিতে লাগিল। তখন শীতলা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইল। নারদ আসিয়া বলিল, ছার মানুষের বিরুদ্ধে তোমার অভিযান শোভা পায় না। তখন শীতলা ব্যাধিদের পাঠাইয়া দিল। রাজা হার মানিতে বাধ্য হইল। শেষে শীতলার পূজা করিয়া হৃষীকেশের হাতে কন্যা সঁপিয়া দিয়া তবে সে নিস্তার পাইল। পত্নী ও পণ্যসম্পদ্ লইয়া হৃষীকেশ দেশে ফিরিল। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশটুকু পাওয়া যায় নাই। এ কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলের বণিক্-খণ্ডের অনুকরণ।

কমলামঙ্গলের কাহিনী রূপকথা হইতে নেওয়া, এবং সেই কারণে পাত্রপাত্রী অনেকটা স্বভাবসঙ্গত। কাহিনী মোটামুটি এই। — গৌড়-রাজ্যে জাহ্নবীর কূলে সনত-নগরবাসী দুই বন্ধু ব্রাহ্মণ জনার্দন ও গন্ধবেনে বল্লভ দেশভ্রমণে বাহির হইয়া বনপথে কাঞ্চীপুরের উদ্দেশে চলিয়াছে। তাহাদের ভক্তিপরীক্ষার্থে লক্ষ্মীদেবী প্রথমে বাঘিনী হইয়া তাড়া দিলেন। লক্ষ্মীর দোহাই দেওয়াতে তৎক্ষণাৎ বাঘিনী অন্তর্হিত হইল। একটু গিয়া সরোবর পাইয়া দুই বন্ধু ঘোড়া হইতে নামিয়া জল খাইতে গেল। অমনি জল হইতে এক সাপ বাহির হইয়া ঘোড়া গিলিয়া ফেলিল। ঘোড়া হারাইয়া তাহারা লক্ষ্মীর নাম করিয়া কাঁদিতেছে, তখন লক্ষ্মী ব্রাহ্মণীর বেশে আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে একটি পাখীও উড়িয়া আসিল। তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া লক্ষ্মী বলিলেন, আমার পোষা পাখী আছে, সে সাপ মারিবে। পাখী ছোঁ মারিয়া জল হইতে সাপটাকে তুলিল এবং তাহার পেট চিরিয়া দিল। পেটের মধ্য হইতে সাপে গেলা সব জীবজন্তু জীবিত অবস্থায় বাহির হইয়া আসিল। বল্লভও তাহার ঘোড়া পাইল। সাপ আবার জলে নামিল। বল্লভ লক্ষ্মীর কাছে নিবেদন করিল, "সঙ্কটে সত্বর আসি দিবে দরশন"। তখন লক্ষ্মী তাঁহার কান হইতে পদ্মফুল লইয়া তাহাকে দিলেন।

দুই বন্ধু ঘোড়ায় চড়িয়া আগাইয়া চলিল। অনেক গ্রাম দেখিতে দেখিতে তাহারা এক জনহীন বিরাট রাজবাড়ীতে গিয়া পৌছিল। ভিতরে ঢুকিয়াই তাহারা দেখিল, এক বিশালকায় রাক্ষসী। তাহাকে দেখিয়া জীবনের আশা

ছাড়িয়া তাহারা লক্ষ্মীকে স্মরণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রাক্ষসীকে প্রণাম করিয়া জোড় হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের পরিচয় লইয়া রাক্ষসী অভয় দিয়া বলিল, দিন কত এখানে অতিথি হইয়া থাক, তাহার পর যথেচ্ছ যাইও। রাক্ষসীর বাসনা, পালিত রাজকন্যাকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দিবে। পরের দিন রাজকন্যার সঙ্গে দুই বন্ধুর দেখা হইল। দেখা হইবামাত্র রাজকন্যা ও জনার্দন পরস্পরের প্রেমে পড়িল। গান্ধর্বমতে তাহাদের বিবাহ হইল। কিছুদিন পরে দুই বন্ধু রাক্ষসীর কাছে বিদায় লইতে গেল। রাক্ষসী বলিল, যাবে যাও। তবে এই তো তোমাদের দেশে ফিরিবার পথ, তখন দেখা করিতে ভুলিও না। রাক্ষসীকে প্রণাম করিয়া দুই বন্ধু ঘোড়ায় চড়িয়া উত্তরমুখে কাঞ্চীদেশের দিকে বাহির হইয়া পড়িল। অনেক দূর গিয়া সমুদ্রের কূলে পথ শেষ হইল। দুই বন্ধু ভাবিয়া আকুল, ঘোড়ায় চড়িয়া সমুদ্র পার হইবে কিসে? তখন তাহারা লক্ষ্মীকে স্মরণ করিতে লাগিল, "কেন আর দুঃখ দেহ বিদেশে আনিয়া"। লক্ষ্মী সদয় হইলেন।

কমলা দেবীর মায়া দেখ সর্বজন
নদীমধ্যে জাঙ্গাল[1] হইল ততক্ষণ।
বামেতে সাগর আর সাগরের বংশ
ডাহিনে কমলাদহ নদী এক অংশ।
ঘোড়ায় চড়িয়া দোঁহে জাঙ্গাল বাহিয়া
কমলাদহেতে গেল নিকট হইয়া।

জাঙ্গাল দিয়া যাইবার কালে দেবী ভক্তকে ছলনা করিবার জন্য মায়া পাতিলেন। সমুদ্রগর্ভে কমলাদহে সবুজ ধানখেত, তাহার মধ্যে দেবী ধানের আভরণ পরিয়া পদ্মের উপর বসিয়া আছেন। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া দুই বন্ধু বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহাদের পথচলা থামিল না।

কাঞ্চীপুরে পৌঁছিয়া দুই বন্ধু গাছের তলায় বিশ্রাম করিতেছে এমন সময় শহরকোটাল তাহাদের বিদেশী রাজার চর মনে করিয়া ধরিয়া লইয়া রাজার সমুখে গেল। রাজার কাছে নিজ পরিচয় দিলে রাজা বলিল, তোমরা নিজের কথাতেই ধরা পড়িতেছ। গৌড় হইতে সদাগরেরা ডিঙ্গায় চড়িয়া

---

১ প্রশস্ত পথ।

বহু দিনে বহু ক্লেশে আসে, আর তোমরা বলিতেছ যে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছ। এ কি সম্ভব? বল্লভ তখন রাজাকে তাহাদের পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলিল এবং রাজাকে ধান্যেশ্বরী মূর্তি দেখাইতে ও সমুদ্র হইতে পদ্ম তুলিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিল। বলা বাহুল্য কার্যকালে সে কিছুই দেখাইতে পারিল না। বল্লভ বীরের মত বলিল, "হারিনু এখন রাজা যে হয়ে উচিত"।

শুনিয়া রাজার মন নরম হইল। রাজা বলিল, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ স্বীকার কর, তাহা হইলে ছাড়িয়া দিব। বল্লভ বলিল, প্রাণ রাখিবার জন্যও আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা সত্য। রাজা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিল। কোটাল প্রাণদণ্ডের যোগাড় করিতেছে, বল্লভও মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিতেছে। মশানের কাছে রম্য সরোবর দেখিয়া বল্লভ জল খাইতে চাহিল। কোটাল দাড়ি মুচড়াইয়া বলিল, বেটা পালাইতে চাহিস বুঝি। কোটালের ছোট ভাই হরিহর দাদাকে বুঝাইয়া বল্লভকে ঘাটে লইয়া গেল। হরিহর তাহার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিয়া ইষ্ট স্মরণ করিতে বলিল। সে অনুযোগ করিল, কেন তুমি সংসার সমুদ্র পার হইয়া এই যমের পুরীতে অকালমরণ বরণ করিতে আসিলে!

জনার্দন তখনও বল্লভের সঙ্গ ছাড়ে নাই। তাহাকে অদূরে দেখিয়া বল্লভ হাত তুলিয়া হরিবোল বলিয়া বিদায় মাগিল। জনার্দন বলিল, হতাশ হইতেছ কেন? লক্ষ্মীর ফুলের কথা ভুলিয়া গিয়াছ? তখন বল্লভ স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া দেবীদত্ত ফুল হাতে লইয়া স্তব করিতে লাগিল। সখী লীলাবতীর পরামর্শমত লক্ষ্মীদেবী তখন বৃদ্ধার বেশে মশানে আবির্ভূত হইলেন। সঙ্গে সেই পাখী। সে পাখী গরুড়। সে কোটালের দল ধ্বংস করিল। রাজসৈন্যও লণ্ডভণ্ড হইল। রাজলক্ষ্মী রাজার রাজ্য ছাড়িল।

> ধান্য আর চালু যত ছিল ঠাঞিও ঠাঞিও
> শূন্যাকার সে সকল এক মুঠা নাঞিও।.....
> রহিল শরীরমাত্র শূণ্য ঘর দ্বার
> খায় পরে হেন দ্রব্য কিছু নাই আর।

অনুপায় হইয়া রাজা বল্লভকে ধরিয়া বসিল, দেবীকে প্রসন্ন করিয়া দাও, তোমাকে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা দিব। বল্লভ বলিল, লক্ষ্মীকে

ধ্যান কর। রাজার ধ্যানে প্রসন্ন হইয়া দেবী তাহাকে ধান্যেশ্বরী মূর্তি দেখাইলেন। দক্ষিণ মশানের রণক্ষেত্রে—

রুধিরের নদীমধ্যে পড়িল জাঙ্গাল
চৌদিকে ধান্যের ক্ষেত নানা পরকার।
কেহ দায়[১] কেহ বুনে কেহ করে মাপ
কমলে বসিল পরি ধান্যের কলাপ[২]।

মশানেতে সেই সর্প-সরোবরও দেখা গেল। তাহার পর দেবীর অনুগ্রহে মরা সব বাঁচিয়া উঠিল, রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিল। বল্লভের রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হইল। তাহার পর দেশে প্রত্যাবর্তনের পালা। পথে রাক্ষসীর কাছে গিয়া জনার্দন পত্নীকে সঙ্গে করিয়া লইল। বিদায়ের ক্ষণে সকলে রাক্ষসীকে প্রণাম করিয়া ভয়ে চুপ করিয়া আছে। তখন—

কন্যাকে ডাকিয়া কিছু বলে নিশাচরী
পুষিনু তোমার তরে অতি যত্ন করি।
তুমি ত আমার তরে সতত সেবিলে
জনকজননীহত্যা মনে না করিলে।
ব্রাহ্মণেরে বিভা দিনু যাহ নিজ ঘরে
করিহ স্বামীর সেবা পরম আদরে।
অপরাধ আমার সকল কর ক্ষমা।
নিন্দাবাদ না করিহ ভাগ্যবতী রামা।
বলিতে বলিতে দুটি চক্ষে জল ঝরে
কন্যার গলায় গিয়া মমতায় ধরে।

অবশেষে দুই বন্ধু সস্ত্রীক দেশে ফিরিয়া আসিল। বল্লভের পিতা লক্ষ্মীর মন্দির গাঁথাইয়া সোনার মূর্তি স্থাপন করিয়া ধুমধামে পূজা করিতে লাগিল।

১ কাটে। ২ অর্থাৎ ধান্য-অলঙ্কারসমূহ পরিয়া দেবী পদ্মের উপর বসিলেন।

৭. দৌলৎ কাজী ও আলাওল

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবপদাবলী-গানের যেন প্লাবন বহিয়াছিল। বৈষ্ণবভাবধারায় তখন দেশের চিত্তভূমি পরিষিক্ত। তাহাতেই গীতি-কাব্য প্রাচুর্যে পুষ্পিত ও বিকশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার মুসলমানেরা অনেককাল পূর্ব হইতেই মনে প্রাণে বাঙ্গালী। সুতরাং মুসলমান কবিরাও যে বাঙ্গালায় ও ব্রজবুলিতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা রচনায় অগ্রসর হইবে তাহা অবশ্যই স্বাভাবিক। সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা ভালো মুসলমান পদকর্তা পাইতেছি। ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নসীর মামুদ, সৈয়দ মর্তুজা, আলি রাজা এবং আলাওল।

সপ্তদশ শতাব্দীর আগেকার মুসলমান লেখকদের সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা অন্তত দুইজন খুব শক্তিশালী কাব্য-রচয়িতা পাইতেছি,— দৌলৎ কাজী এবং আলাওল। দুইজনেই আরাকানের রাজার ও রাজসভাসদের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

আরাকানের সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রপাত হয় চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হোসেন শাহা কর্তৃক চাটিগাঁ বিজিত হইবার পর তবে এই যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। তখন হইতে চাটিগাঁ ও নিম্নবঙ্গের সংলগ্ন অঞ্চল হইতে শিক্ষিত মুসলমানেরা আরাকানে গিয়া রাজসভা জাঁকাইয়া বসিতেছিলেন। হোসেন শাহার সময়ে চাটিগ্রামে বাঙ্গালা সাহিত্যের বেশ চর্চা ছিল। ইহারও ঢেউ আরাকানে পৌঁছিয়াছিল।

এই সব কর্মচারীর প্ররোচনায় এবং গৌড়-দরবারের অনুকরণে আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সমাদর ও পোষকতার সূত্রপাত। আরাকান রাজসভার মারফৎ ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত আরব্যউপন্যাসজাতীয় গল্প, রূপকথা ও লৌকিক কাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানি হইয়াছিল। এই আখ্যানকাব্য সবই গেয় ছিল না। কয়েকটি গেয়, বাকিগুলি আবৃত্তিযোগ্য। অপর বিশেষত্ব, এসব কাব্যে দেবতামাহাত্ম্য বর্ণনা নাই।

আরাকান রাজসভায় সংবর্ধিত সব বাঙ্গালী কবিই মুসলমান। ইঁহাদের মধ্যে দৌলৎ কাজী প্রাচীনতম। আরাকানরাজ শ্রীসুধর্মার (রাজ্যকাল ১৬২২-

৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) কর্মচারী আশ্‌রফ খানের আদেশে ইনি 'সতী ময়না' (নামান্তর 'লোরচন্দ্রানী') কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিবার আগেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। অনেক কাল পরে, ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, আলাওল বাকি অংশ রচনা করিয়া দিয়া কাব্যকাহিনী সম্পূর্ণ করেন।

দৌলৎ কাজী তাঁহার কাব্যের কাহিনীভাগ সংগ্রহ করিয়াছিলেন হিন্দীকবি সাধনের কাব্য হইতে। কাহিনী সংক্ষেপে বলি।

গোহারী দেশের রাজা লোর। তাঁহার পত্নী ময়নামতী অনিন্দ্য সুন্দরী। একদিন সভায় এক যোগী আসিয়া রাজাকে মোহরা দেশের রাজকন্যা চন্দ্রানীর ছবি দেখাইল। চন্দ্রানীর বিবাহ হইয়াছে। স্বামী বামন, তবে বীর এবং রাজসেনাপতি। যোগী রাজাকে বুঝাইল, চন্দ্রানী স্বামীর ঘর করে না। সুতরাং লোর স্বচ্ছন্দে তাহাকে হরণ করিয়া আনিতে পারে। প্রলুব্ধ হইয়া লোর মোহরায় গেল এবং যোগীর উপদেশমত কাজ করিয়া চন্দ্রানীর সাক্ষাৎ পাইল। লোর ও চন্দ্রানী পরস্পরকে ভালোবাসিয়া ফেলিল। বামনের অনুপস্থিতিতে লোর চন্দ্রানীর প্রাসাদে গিয়া তাহাকে হরণ করিয়া পলাইল। বামন খবর পাইয়া তাড়া করিল। বনের মধ্যে দুই বীরে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে বামন নিহত হইল। এদিকে চন্দ্রানীও সাপের কামড়ে মারা যাইতে যাইতে এক সন্ন্যাসীর কৃপায় বাঁচিয়া উঠিল। তাহার পিতা আসিয়া তাহাকে ও লোরকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেল এবং তাহাদের বিবাহ দিল। রাজা জামাতার হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

এদিকে লোরের বিরহে ময়না অত্যন্ত কাতর হইয়া আছে। তাহাকে ভর্তৃহীন দেখিয়া অনেক রাজারাজরা পাণিপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু কেহই আমল পায় নাই। এক ধনী সওদাগরের পুত্র, নাম ছাতন, ময়নার পুরানো ধাত্রীকে হাত করিয়া ফুসলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সতী ময়নাকে সে বিচলিত করিতে পারে নাই।

ময়না দেশেবিদেশে স্বামীর খোঁজ করিতে লাগিল। শেষে খোঁজ পাওয়া গেলে ময়না এক ব্রাহ্মণকে দূতরূপে পাঠাইল। তাহার সঙ্গে অভিজ্ঞানরূপে পোষা শুক পাখীকেও পাঠাইল। ব্রাহ্মণের কৌশলে লোরের মনে পূর্বস্মৃতির উদয় হইল। তখন তাহার পুত্র বড় হইয়াছে। তাহার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া চন্দ্রানীকে লইয়া লোর গোহারীতে ময়নার কাছে ফিরিয়া আসিল।

দৌলৎ কাজী বেশ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। কাব্যশক্তিও উচ্চশ্রেণীর ছিল।

আরাকানের দ্বিতীয় বড় কবি সৈয়দ আলাওল পণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ এবং বহু গ্রন্থের লেখক ছিলেন। আলাওল তাঁহার কাব্যগুলিতে নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা রোমাঞ্চক বলিতে পারি। কবির পিতৃভূমি এবং জন্মস্থান ছিল বাঙ্গালা দেশে ফতেহাবাদ পরগনায় জালালপুর গ্রামে। দেশের বর্ণনায় কবি পঞ্চমুখ।

গৌড়মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ দেশ
আলিম ওলমা হিন্দু বৈসয়ে বিশেষ।
বহুল দানিশমন্দ খলিফা আলিম
আলিম জনের কথা দিতে নাহি সীম।
হিন্দুকুলে ব্রাহ্মণ সজ্‌জন যতী সতী
মধ্যেতে গোপাট আর শিব ভাগীরথী।

দেশের শাসনকর্তা তখন মজলিশ কুতুব। আলাওল তাঁহারই এক অমাত্যের পুত্র। একদা পিতাপুত্রে নৌকা করিয়া যাইবার সময়ে পোর্তুগীস্ জলদস্যু ("হার্মাদ") দ্বারা আক্রান্ত হন। দুই পক্ষে লড়াই হয়। পিতা যুদ্ধে মরিয়া শহীদ হন। পুত্র না মরিয়া দুঃখ করিয়াছেন, "না পাইল শহীদ-পদ আছে আয়ুলেশ।" হার্মাদেরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আরাকানে বেচিয়া দিল। রাজার লোক কিনিয়া তাঁহাকে অশ্বারোহী সৈন্যদলে নিযুক্ত করিল। ক্রমে ক্রমে আলাওলের পাণ্ডিত্যের এবং সঙ্গীত-নৈপুণ্যের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। আরাকানে ছোটবড় অনেকেই তাঁহাকে খাতির করিতে লাগিল। অচিরে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি মাগন ঠাকুরের সহিত আলাওলের সৌহার্দ জন্মিল। মাগন ঠাকুর নিজে গুণী ও গুণবোদ্ধা ব্যক্তি ছিলেন। বহু কবি পণ্ডিত নট গায়ন তাঁহার সাহায্য পাইত। মাগন ঠাকুরের মারফৎ রাজমন্ত্রী সুলেমানের সঙ্গেও আলাওলের ঘনিষ্ঠতা হইল। মাগনের ও সুলেমানের অনুরোধে আলাওল কয়েকখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে আলাওলের কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার খাতির সর্বত্র, বহু লোক তাঁহাকে গুরু করিয়াছে। এইভাবে অনেক কাল কাটিয়া

গেল। একদিন শাহা শুজা ভাই আওরঙ্গজেবের তাড়নায় বাঙ্গালা দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া আরাকানের রাজার আশ্রয় লইল। তাহার পর শীঘ্রই আলাওলের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিল। আবার একদিন অকস্মাৎ রাজরোষে পড়িয়া শুজা নিহত হইল। তখন কুচক্রীর পরামর্শে রাজা শুজার বন্ধু বলিয়া আলাওলের যথাসর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিলেন। আলাওল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

দীর্ঘকাল কারাগারে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কবি অবশেষে একদিন মুক্তি পাইলেন। কিন্তু তখন তিনি সহায়সম্পত্তিহীন। তাঁহার শরীর মন দুইই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সংসারযাত্রায় পদে পদে অপরের প্রত্যাশা। মানী কবির সেইটাই প্রধান দুঃখ, "মন্দকীর্ত্তি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ"।

কিন্তু বাহিরের উদাসীনতা সত্ত্বেও গুণীর মান কবির যশ বেশিদিন চাপা থাকে না। সৈয়দ মুসা নামক একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষকে আলাওল এখন বন্ধুরূপে পাইলেন। বন্দী হইবার পূর্বে মাগন ঠাকুরের আদেশে আলাওল একটি কাব্যের পত্তন করিয়াছিলেন। খালাস পাইয়া কবি যে দশায় পড়িলেন, তাহা কাব্যচর্চার পক্ষে কিছুতেই অনুকূল ছিল না। অবশেষে দীর্ঘ নয় বৎসর পরে সৈয়দ মুসার অনুরোধে আলাওল সে কাব্য সমাপ্ত করিলেন।

রোসাঙ্গের কাজী সৈয়দ মসুদ শাহা সূফী-সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। আলাওল ইঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। বোধ করি এই গুরুরই সাহায্যে কবি আবার ভাগ্যের প্রসন্নতা ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। রাজসভায় অনেক গুণিব্যক্তি থাকিলেও আলাওলের খ্যাতি সর্বাধিক হইল।

একদিন এক সম্ভ্রান্ত রাজামাত্য গুণীদের আমন্ত্রণ করিয়া উত্তমরূপে খাওয়াইলেন। সকলে তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল যে তিনি ধন্য, যেহেতু তিনি হিন্দুদের মতই লোকহিতে ব্যয়ে মুক্তহস্ত।

> হিন্দুজাতি নানা দুঃখে উপর্জএ মাল[১]
> মন্দির পুষ্করণী দেয় কতেক জাঙ্গাল।
> সুজনে বাড়ায় বৃত্তি অনুরূপ পুণ্য
> অন্তকালে নাম রহে সেই ধন্য ধন্য।

---

১ ধনসম্পত্তি উপার্জন করে।

রাজামাত্য বলিলেন, যতই ভালো হোক, পূর্তকীর্তি কেবল স্বদেশেই খ্যাতি লাভ করে, এবং সেগুলি চিরস্থায়ীও নয়। কবির রচনার সঙ্গে গাঁথা পড়িলেই তবে রাজার নাম চিরস্মরণীয় হয়। তাই তিনি তখনই আলাওলকে আদেশ করিলেন, "মম নামে গ্রন্থ রচ কহিনু বিশেষ।" কবি মুশ্‌কিলে পড়িয়া গেলেন, একে তাঁহার বৃদ্ধকাল, তাহার উপর রাজার দায়, সর্বোপরি মন নীরস, কবিত্বের স্ফূর্তি নাই। রাজামাত্য বুঝিলেন, আলাওলকে সংসারপোষণচিন্তা হইতে মুক্তি না দিলে কবিত্বস্ফূর্তি হইবে না। তখন তিনি কবির উপযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অতঃপর আলাওল প্রাচীন ফারসী কবি নিজামীর 'ইস্‌কন্দর-নামা' কাব্য অবলম্বনে 'সেকেন্দর-নামা' রচনা করিলেন। ইহাতে আলেকজান্ডারের পারস্য-জয় কাহিনী বর্ণিত আছে।

সৈয়দ আলাওলের প্রথম রচনা 'পদ্মাবতী' ইহার শ্রেষ্ঠ কাব্য। আরাকানরাজ থদো মিন্‌তারের (রাজ্যকাল ১৬৪৫-৫২) মহামন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে পদ্মাবতী লেখা হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মালিক মুহম্মদ জায়সী অবধী (অর্থাৎ পূর্বী হিন্দী) ভাষায় যে 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহাই আলাওলের কাব্যের বিষয়। কিন্তু বইটি জায়সীর অনুবাদ মাত্র নয়। আলাওল পদ্মাবতীর কাহিনী অল্পস্বল্প বদলাইয়াছেন। শেষে কিছু সংযোজনও আছে।

হিন্দু পুরাণ-কথা আলাওলের ভালোভাবেই জানা ছিল। পদ্মাবতীকাব্যে রামায়ণ-মহাভারত কাহিনীর উল্লেখ অনেকবার আছে। তখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাও তাঁহার অপরিচিত ছিল না। বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব পদ্মাবতীর গানগুলিতে বিশেষভাবে পড়িয়াছে। গোরক্ষনাথের ও গোপীচন্দ্রের উপাখ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীরও আভাস আছে। সংস্কৃত অলঙ্কার- ও সঙ্গীত-শাস্ত্রে আলাওলের বেশ দখল ছিল। সর্বোপরি আলাওল ছিলেন সূফী-সাধক। তাই তাঁহার এই রোমান্টিক কাব্যটিতে প্রচলিত কাব্যকলার সঙ্গে অধ্যাত্ম-অনুভূতির সংযোগ হইয়া অভিনব রসসৃষ্টি হইয়াছে। নিজের সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

প্রেমকবি আলাওল প্রভুর ভাবক
অন্তরে প্রবল পুণ্য প্রভুর আশক।

কবির কথার আমরাও প্রতিধ্বনি করিতে পারি :

তাঁহার পিরীতিরসে চন্দনতুলন যশে
বশ হৈল গুণিগণমন
হীন আলাওল-বাণী সুরস পয়ারখানি
পদে পদে অমৃতসিঞ্চন।

থদো মিন্তারের পরবর্তী রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার মন্ত্রী সুলেমানের অনুরোধে আলাওল দৌলৎ কাজীর অসমাপ্ত 'লোরচন্দ্রানী' সম্পূর্ণ করেন (১৬৫৯)। 'সৈফুল্‌মুল্‌ক্ বদিউজ্‌জমাল,' 'হপ্ত পয়কর' এবং 'সেকন্দর-নামা'— আলাওলের এই তিনখানি কাব্যের কথাবস্তুও ফারসী হইতে গৃহীত। শেষ বই দুইটির মূল নিজামীর লেখা। প্রথম বইটি মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আরব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু মাগন ঠাকুরের মৃত্যু ও কবির কারাবাসের জন্য কাব্যটি অসমাপ্ত রহিয়া যায় এবং অবশেষে দীর্ঘ নয় বৎসর পরে সৈয়দ মুসার অনুরোধে সমাপ্ত হয় (১৬৬৮)। 'হপ্ত পয়কর' শ্রীচন্দ্র সুধর্মার সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের অনুরোধে লেখা। তৃতীয় কাব্যটি মজলিস নবরাজে আদেশে রচিত (আনুমানিক ১৬৭১)। আলাওলের পঞ্চম গ্রন্থ 'তোহ্‌ফা' বা 'তত্ত্ব-উপদেশ' (১৬৬৩) ইউসুফ গদা রচিত ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ। ইহার বিষয় হইতেছে মুসলমান ধর্মের বিধিবিধান ও নিত্যকৃত্য।

সৈফুল্‌মুল্‌ক্ বদিউজ্‌জমাল এবং সেকন্দর-নামা—এই দুইটি আলাওলের সর্বশেষ রচনা। আলাওলের মন তখন অধ্যাত্মচিন্তায় তৎপর। তাই সৈফুল্‌মুল্‌কের উপসংহারে পাঠকের কাছে তিনি এই কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

যদি মোর কবিরসে সুখ লাগে মনে
আশীর্বাদ কর মোরে ফকিরি কারণে।
ঈশ্বরেতে মুক্তি মাগ আমার লাগিয়া
পড়িও ফতেহা একমুষ্টি অন্ন খাইয়া।

সেকন্দর-নামার প্রায় প্রত্যেক পদের ভনিতার শেষে আলাওল গুরুর দোহাই দিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে আলাওলের বেশ অধিকার ছিল। তিনি শুধুই কবিপণ্ডিত ছিলেন না, সাধকও ছিলেন। আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁহার আদিরসাত্মক কাব্যগুলিকে একটি শান্ত শ্রী দিয়াছে। আলাওলের রচনা-রীতি সরল। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে এবং আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য নাই। দৌলৎ কাজীর মত আলাওলও অনেকগুলি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন।

সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরাগলপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। হোসেন শাহার সেনাপতি পরাগল খানের নামেই এই গ্রামের নাম। কবিও পরাগলের বংশধর ছিলেন। বৈষ্ণবপদাবলী ছাড়া সৈয়দ সুলতানের লেখা তিনখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে—'জ্ঞানপ্রদীপ', 'নবীবংশ' এবং 'শবে মেয়েরাজ' (নামান্তর 'ওফাৎ রসুল' বা 'হজরৎ মহম্মদ-চরিত')। জ্ঞানপ্রদীপ যোগসাধনার বই। নবীবংশ বিরাট কাব্য, ইহাতে বারোজন নবী অর্থাৎ অবতার-মহাপুরুষের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নবীদের মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এবং কৃষ্ণ আছেন। হরিবংশ-পুরাণের অনুকরণে রচিত এই কাব্যটিতে কবি বিশেষ হৃদয়বত্তা ও সমদর্শিতা সহকারে হিন্দু ও ইস্‌লাম ধর্ম সমভূমিতে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় কাব্যখানি একেবারে স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, নবীবংশেরই "খিল" পর্ব অর্থাৎ শেষ খণ্ড।

শেখ চাঁদের 'রসুলবিজয়' কাব্যেও হজরৎ মহম্মদের জীবনী বর্ণিত। কাব্যটি বিশেষত্বহীন নয়। শাহা মহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' ভালো রচনা। পুঁথির লিপিকাল ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্যের রচনাকাল তাহার একশত বৎসরের বেশি না হওয়াই সম্ভব। মহম্মদ খানের 'মক্‌তুল্‌হোসেন' কাব্যে (রচনাকাল ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বিবিধ পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী সঙ্কলন করিয়া মহম্মদ খান প্রথমে একখানি "উপদেশ পাঞ্চালিকা" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বইটির নাম 'সত্যকলিবিবাদ-সংবাদ' বা 'যুগ-সংবাদ'। রচনাকাল ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৮. ধর্মঠাকুরের পুরাণকথা

ধর্মঠাকুরের পূজা বাঙ্গালা দেশে কতকাল হইতে প্রচলিত আছে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। একদা ধর্মদেবতার অনুষ্ঠান বাঙ্গালার বাহিরে, বিহারে এবং উত্তরপ্রদেশে, অজ্ঞাত ছিল না। ধর্মদেবতার উদ্ভবের ইতিহাস বড় বিচিত্র। বৈদিক বরুণ যম ও আদিত্য প্রভৃতি দেবতা পরবর্তী কালের বিষ্ণু ও শিবের এবং অজ্ঞাতকুল অন্য দেবতার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া ধর্মঠাকুরে পরিণত হইয়াছেন। ধর্মদেবতার গাজন-অনুষ্ঠানে অনেক রকম সংস্কৃতির ও সাধনার ধারা মিশিয়াছে। ধর্মপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্ব ও কাহিনী এদেশে বরাবর প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে, বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলে এবং আরও অনেক পুরানো বাঙ্গালাকাব্যের উপক্রমণিকায় আমরা ধর্মঠাকুরের পৌরাণিক কাহিনীর পরিচয় পাই। কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মর্যাদা সমাজের সব স্তরে ক্রমশ বাড়িতে থাকায় ধর্মপূজার প্রসার কমিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের মত উচ্চবর্ণের ব্যক্তির পক্ষে ধর্মপূজা করা ও ধর্মের গান গাওয়া একদা গর্হিত কাজ ছিল। কিন্তু তাহার আগে ধর্মপূজা সমগ্র বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল। পূর্ববঙ্গে এখন ধর্মঠাকুরের চিহ্ন নাই, কিন্তু তাঁহার গাজনের রেশ রহিয়া গিয়াছে চৈত-পরবের "পাট" পূজায়। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ধর্মদেবতার পূজা কেবল রাঢ় অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া দারকেশ্বর-দামোদর ও অজয় নদের মধ্যবর্তী ভূভাগে, সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কলিকাতাতেও ছিল। তাহার এক প্রমাণ ধর্মতলা স্ট্রীট নামে।) এখনকার দিনে ধর্মঠাকুরের প্রসিদ্ধ স্থান প্রায় সবই এই অঞ্চলে। ধর্মপূজকদের পুরাণের মতে সর্বাপেক্ষা পবিত্র নদী বল্লুকা। ইহার তীরে ধর্মের আদিস্থান অবস্থিত ছিল। বল্লুকা দামোদরের প্রাচীন উপনদী বাঁকার শাখানদী ছিল। এই নদীর শুষ্ক খাত বর্ধমান জেলার উত্তরপূর্বাংশে মেমারির নিকটবর্তী স্থানে এখনও স্পষ্ট লক্ষিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ধর্মঠাকুর শিব অথবা বিষ্ণু অথবা উভয়ের সহিত একীভূত হইতে থাকেন, এবং ধীরে ধীরে ধর্মপূজা বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজার মধ্যে হারাইয়া যাইতে থাকে। ধর্মঠাকুরের কোন প্রতিমা নাই, তাঁহার পদচিহ্নই উপাস্য। এই পদচিহ্ন আঁকা থাকে কূর্মমূর্তির পিঠে। কোন কোন স্থানে কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ড অথবা অন্য কোন দ্রব্য ধর্মঠাকুরের প্রতীকরূপে পূজিত

হয়। এখন অনেক স্থানে ধর্মঠাকুর শিবরূপে পূজিত হইতেছেন। এই সব স্থানে ধর্মের গাজন শিবের গাজনে পরিণত হইয়াছে। শিবের গাজন হয় চৈত্রসংক্রান্তিতে, ধর্মের গাজন মাঘ হইতে শ্রাবণ পর্যন্ত যে-কোন মাসের পূর্ণিমাতে হইতে পারে। ধর্মের গাজনে মৎস্য মাংস মদ পিঠা ইত্যাদি নৈবেদ্য দিতে বাধা নাই। শিবের গাজনে নৈবেদ্য সম্পূর্ণভাবে নিরামিষ।

ধর্মপূজাবিষয়ে যে সব নিবন্ধ পাওয়া যায় সেগুলি দুই শ্রেণীতে পড়ে। এক শ্রেণীর নিবন্ধে ধর্মদেবতার শাস্ত্র ও বিধান এবং ধর্মপূজার মন্ত্র ও ছড়া আছে। এগুলিকে ধর্মপূজকের কড়চা অথবা ধর্মপুরাণ বলা যাইতে পারে। অপর শ্রেণীর নিবন্ধ হইতেছে ধর্মমঙ্গল কাব্য। ইহাতে সাধারণ শ্রোতার জন্য ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যখ্যাপক পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এগুলি ধর্মঠাকুরের গাজনের সময়ে বারো দিন ধরিয়া রামায়ণ চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদির মত গাওয়া হইত।

ধর্মপুরাণ ধর্মপূজাবিধির সংহিতা। ইহার তিন ভাগ— (ক) সৃষ্টিবর্ণনা, (খ) ধর্মপূজাপ্রবর্তনকাহিনী, এবং (গ) ধর্মপূজাপদ্ধতি। প্রথম দুই ভাগকেই শূন্যপুরাণ বলা যাইতে পারে। কোন কোন পুঁথিতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অংশকেই "শূন্যশাস্ত্র" বলা হইয়াছে। শূন্য ধর্মদেবতার নামান্তর, যেহেতু তিনি অ-রূপ এবং অ-বর্ণ। তাই তিনি নিরঞ্জন।

ধর্মপুরাণে যে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা সংস্কৃত শাস্ত্রপুরাণে পাওয়া যায় না। অনুমান হয় যে, এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এই সব কাহিনী চলিয়া আসিয়াছে। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে বর্ণিত সৃষ্টির আদিকথার সঙ্গে এই কাহিনীর বেশ মিল আছে। ধর্মপুরাণে কথিত সৃষ্টিকাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি।

সৃষ্টির পূর্বে কিছুই না, কেবল শূন্য। শূন্যরূপ অনাদি ধর্ম জগৎ সৃষ্টি করিতে কামনা করিলেন। এই কামনা হইতে এক স্ফটিকধবল বিম্বের উৎপত্তি হইল। সেই বিম্ব-ডিম্বের মধ্যে ধর্ম ভর করিলেন। কালক্রমে ডিম্ব ফুটিয়া অনাদি ধর্ম সাকার আদিদেবরূপে প্রকাশিত হইলেন। ডিমের জলে ব্রহ্মাণ্ড জলময় হইয়া গেল। নিরুপায় হইয়া ধর্ম সেই জলে ভাসিতে লাগিলেন। তাহার পর ধর্মঠাকুর হাই তুলিলেন। তাহাতে উলূক পক্ষী জন্মিল। ধর্ম

তাহার উপর বসিলেন। পাখী উড়িতে লাগিল। বহু যুগ কাটিয়া গেল, জলময় ব্রহ্মাণ্ডে উলূক বসিবার ঠাঁই পায় না। তখন ধর্ম গায়ের এককণা ময়লা তুলিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। তাহা হইতে ত্রিকোণ পৃথিবীর উৎপত্তি হইল। পৃথিবী যাহাতে ধর্মের পদভর সহিতে পারে সেজন্য পৃথিবী কূর্মের পৃষ্ঠে স্থান পাইল। তাহার পর ধর্মঠাকুর বল্লুকা নদী সৃষ্টি করিলেন। তাহার তীরে অক্ষয় বট। উলূক বট গাছে বসিল। তাহার পিঠ হইতে ধর্মঠাকুর নামিয়া পড়িলেন। এখন দেবতা ও জীব-জগৎ সৃষ্টি করিতে হইবে। ধর্মঠাকুর নিজের অঙ্গ হইতে আদ্যাদেবীকে সৃষ্টি করিলেন। ইঁহার নাম কেতকা। উলূকের কথায় তিনি কেতকাকে বিবাহ করিলেন এবং বিবাহ করিয়াই বল্লুকার তীরে গিয়া যোগধ্যানে বসিলেন। উলূক বটগাছের ডালে বসিয়া রহিল। এদিকে ধর্মের বিরহে কেতকা চঞ্চল হইয়াছেন। তাঁহার বাসনা হইতে কামের উৎপত্তি হইল। ধর্মের ধ্যানভঙ্গ করিতে দেবী কামকে বল্লুকায় পাঠাইয়া দিলেন। অকালে ধর্মের ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় "বল্লুকায় কালকূট বিষ উপজিল"। উলূক মাটির ভাঁড়ে করিয়া সেই বিষ কেতকাকে দিল। ধর্মের বিরহে দেবীর মন আরও উচাটন হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবার বাসনায় সেই কালকূট পান করিলেন। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা হইল না। দেবী আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে বিষপান করিলেন বৃথাই। "ত্রিদেবা জন্মিয়া গেল দেবীর উদরে।" সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণে যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবের জন্ম হইল। তিন ভাই পিতাকে না দেখিয়া কাতর হইয়া মাতাকে তাঁহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বল্লুকায় উদ্দেশ করিতে বলিয়া দিলেন। পুত্রদের আগমন বুঝিয়া ধর্ম সাকার দেহ ত্যাগ করিলেন। পিতাকে দেখিতে না পাইয়া তিন ভাই সেইখানে বল্লুকার জলে নামিয়া তপস্যায় বসিলেন। একাসনে তপস্যায় বারো বৎসর কাটিয়া গেলে তবে ধর্মের দয়া হইল। তখন পুত্রের মন বুঝিবার জন্য ধর্মঠাকুর "ছয় মাসের মড়া হইয়া জলে ভেসে যায়।" ব্রহ্মা ছিলেন সকলের ভাটিতে। তাঁহার কাছে সেই পচা মড়া ভাসিয়া আসিলে তিনি জল ঠেলিয়া দূর করিয়া দিলেন। তাহার পর মড়া-রূপী ধর্ম বিষ্ণুর কাছে গেলে তিনিও ঠেলিয়া দিলেন। শেষে শিবের কাছে গেলে তিনি পিতার শব বলিয়া চিনিতে পারিয়া ভাইদের ডাকিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের কথা বিশ্বাস না করিয়া শিবকে মড়া জলে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। তখন বটগাছ হইতে উড়িয়া আসিয়া

উলূক মড়াকে ধর্মঠাকুর বলিয়া সনাক্ত করিল। তখন তিন দেব উলূককে মৃতদেহ সংকারের স্থান নির্ধারণ করিতে বলিলে উলূক ভাবিয়া দেখিল, "আপোড়া পৃথিবী সংসারের মধ্যে নাই", তবে দক্ষিণদিকে সমুদ্রের কুলে বারো আঙ্গুল অদগ্ধ স্থান আছে। কিন্তু সেখানেও হইবে না, কেন-না, সেস্থানে কলিযুগে ধর্মঠাকুর অবতার হইবেন বলিয়া নির্ধারিত আছে। শেষে উলূক এই উপায় বলিয়া দিল যে, শিবের জানুর উপরে দাহ হইতে পারে যদি বিষ্ণু কাষ্ঠ হইতে পারেন। বিষ্ণু তখনি রাজি হইলেন। আর নিজে কোন কাজে লাগিবেন না ভাবিয়া ব্রহ্মা দুঃখে নিশ্বাস ছাড়িলেন। ব্রহ্মার নিঃশ্বাসে কাঠে আগুন ধরিয়া গেল। ধর্মের সৎকার হইতেছে, মনে মনে জানিতে পারিয়া কেতকা আসিয়া অনুমৃতা হইলেন। ধর্মের নাভিপদ্ম বল্লুকার জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল, এবং আদ্যাদেবীর অস্থি শিব গলায় বান্ধিয়া রাখিলেন। তিন দেবতার এই পরীক্ষায় সৃষ্টিকাহিনীর প্রথম পর্ব শেষ।

ধর্মপূজাপ্রবর্তন কাহিনী-ভাগের দুইটি অংশ— (১) সদা-খণ্ড এবং (২) সাংজাত-খণ্ড। এই ভাগ কোন কোন পুঁথিতে "গীতপুরাণ"—অর্থাৎ ধর্মপুরাণের গীত অংশ—বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সদা-খণ্ডে ধর্মঠাকুরের প্রথম উপাসক সদা ডোমের ধর্ম পূজার এই কাহিনী বলা হইয়াছে।

ঘোর কলিকালে তাঁহার পূজা যাহাতে প্রচলিত হয় সেজন্য ধর্মঠাকুর উদ্বিগ্ন হইলেন। উলূক পরামর্শ দিল, ধর্মপূজা প্রচার করিতে আদিত্যকে পৃথিবীতে পাঠান হউক। ধর্ম সম্মত হইলেন। আদিত্য জাজপুরে জন্মগ্রহণ করিলেন। নাম হইল রামাঞি পণ্ডিত। রামাঞি পণ্ডিত ধর্মপূজা প্রবর্তন করিবার আগে ধর্ম নিজেই চলিলেন আদিভক্ত সদা ডোমের কাছে পূজা আদায় করিতে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া উলূককে চেলা করিয়া ভাঙ্গা ছাতা মাথায় দিয়া ধর্ম কাঞ্চননগর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে বেনাপুকুরের পাড়ে সদার কুটীরের সমুখে ভাঙ্গা ছাতা সারাইবার ব্যপদেশে গিয়া উপস্থিত। "সদা সদা" বলিয়া হাঁক দিয়া ঠাকুর বলিলেন, মাঠে ঝড়ের মুখে পড়িয়াছিলাম বলিয়া ছাতা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমাকে ভিক্ষার জন্য সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় তাই ছাতা নহিলে চলে না। তুমি ছাতাটি সারাইয়া দাও। উপযুক্ত দাম দিব। তিনি আরও শুনাইয়া দিলেন যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, তিন দিন উপবাসে গিয়াছে। সদা সযত্নে ছাতা সারাইয়া

দিয়া তাহাতে বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া দিল। ধর্মঠাকুর খুশি হইয়া সদার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন, তুমি যে ছাতা সারাইয়া দিলে তা দেবতারই যোগ্য বটে।

ছাতা পাইয়া সন্ন্যাসী দাম হিসাব করিবার ছলে খুব দেরি করিয়া শেষে সদার গৃহে উপবাসের পারনা করিতে চাহিলেন। সদা বিপদ গণিল। ঘরে এক পোয়াও চাল নাই যাহাতে অত্যন্ত সামান্যভাবেও অতিথিসেবা করা যায়। ডোমনী পরামর্শ দিল, "থাকুক সন্ন্যাসী, চল পলাইয়া যাই।" স্ত্রীর পরামর্শে ভুলিয়া সদা পলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ধর্মের মায়ায় দিশাহারা হইয়া আবার কুটীরেই ফিরিয়া আসিল। সদা ভাবিল, দিনের বেলায় পালানো ভুল হইয়াছে। তা ছাড়া আমরা জাতিতে ডোম, পালানো কাজ আমাদের আসে না।

ঘরে ফিরিয়া তাহারা দেখিল "বিচিত্র-নির্মাণ পাখা কুড়্যার ভিতরে।" সদা বলিল, এ পাখা কোথা হইতে আসিল, "আমার হাতের কীর্তি নহে পাখাখান"। ডোমনী বলিল, আমার বাপের হাতের কাজের মত বোধ হইতেছে। আমাদের ঘরে না দেখিয়া বোধ হয় তিনি চলিয়া গিয়াছেন। সদা বলিল, এখন ওসব কথা থাকুক। তুমি রাজাকে পাখা বেচিয়া আইস, আমরা অতিথিসেবা করি। ডোমনী রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাছে গিয়া বহুমূল্যে পাখা বেচিয়া জিনিসপত্র কিনিয়া আনিল।

ধর্মঠাকুর পূজায় বসিলেন, সদাও ফুলজলে ধর্মপূজা করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর ফুলজল শূন্যে চলি যায়
সদার পুষ্প জল পড়ে সন্ন্যাসীর পায়।

পূজা শেষ হইলে সন্ন্যাসী ঠাকুর সদাকে বলিলেন, "এই মতে পূজ নিত্য ধর্মের চরণ।" ডোমনী সিধা যোগাড় করিয়া দিলে সদা ঠাকুরকে বলিল, আপনি জল তুলিয়া আনিয়া রন্ধন চড়াইয়া দিন। ঠাকুর উত্তর করিলেন, আমি বড়ই দুর্বল হইয়াছি, নিজের হাতে রান্না করিতে পারিব না। আমি

ভক্তের অধীন হয়্যা সংসারেতে ফিরি
অন্নব্রহ্ম হয়্যাছে রন্ধন নাই করি।

তাহার পর ঠাকুর কথার ছলে ডোমনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য কর‍্যা কও তোমার বালকের নাম কি?" সদা কাতর হইয়া বলিল, "সংসারের মধ্যে মোর বেটাবেটি নাই।" শুনিয়া

কানে হাত দিয়া সন্ন্যাসী বলেন হরি হরি
আঁটকুড়ার ঘরেতে পারনা নাই করি।

সদার মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল, ধিক্কারে সে গলায় কাটারি দিতে গেল। ঠাকুর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ধর্মের দোহাই যদি কাতি নেওগলে।" তাহার পর সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, ধর্মের কাছে মানসিক কর, তাহা হইলে ধর্মের দয়ায় এবং আমার আশীর্বাদে তুমি পুত্র লাভ করিবে। তখন আমি আসিয়া তোমার গৃহে পারনা করিব। ডোমনী বলিল, যদি পুত্র হয় তবে "পুত্র কেট্যা অবশ্য পূজিব ধর্মরায়।" সন্ন্যাসী বলিলেন, যখন মানসিক শোধ দিবে "সেইকালে আসি আমি করিব পারনা।" বালক হইলে তাহার নাম লুইয়া (বা লুইধর) রাখিতে বলিয়া ধর্মঠাকুর অন্তর্ধান করিলেন।

যথাসময়ে সদা ডোমের পুত্র লুইধর জন্মগ্রহণ করিল। তাহার বয়স যখন বারে তখন একদিন সে রাজা হরিশ্চন্দ্রের চোখে পড়িল। সে সর্বদাই গুলতাই বাঁটুল তীর ধনুক লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। রাজা সদা ডোমকে ডাকাইয়া বলিল, উপযুক্ত পুত্রকে কেন ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছ? আজ হইতে আমি তোমার পুত্রকে গ্রামের উত্তরে যে বাগান আছে সেখানকার রক্ষক নিযুক্ত করিলাম। তাহার "ফি-রোজ মাহিনা হইল সিকা সিকা।" রাজার শিরোপা পাইয়া লুইয়া গুলতাই বাঁটুল লইয়া রাজার বাগান রক্ষা করিতে লাগিল।

একদিন ধর্মের উলূক ফুলের সুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া সেই বাগানের উপরে উড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক গাছের উপর বসিল। সঙ্গে সঙ্গে লুইধরের নির্ঘাত বাঁটুল আসিয়া তাহার বুকে বাজিল। কাতর হইয়া উলূক গিয়া ধর্মের চরণে নালিশ করিল। তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া দিয়া—

ঠাকুর বলেন বাণী শুন হে উলূক মুনি
সেই লুয়্যা আমারে মাননা
আমার মনে নাই ছিল লুয়্যা ভালো জানাইল
চল বাছা যাব দুইজনা।

সদার ভক্তি ও সত্যনিষ্ঠার পরীক্ষা লইতে ধর্মঠাকুর পৃথিবীতে নামিয়া আসিলেন।

সন্ন্যাসীর বেশ হৈল দেব নৈরাকার।
ব্যাঘ্রছাল পরিধান শিরে জটাভার।
বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হৈল আসা ধরি হাথে
কশা হাতে চলিল উলূক চেলা সাথে।

সদার কুটীরদ্বারে আসিয়া ঠাকুর ডাক দিলেন। ঘরের ভিতর হইতে সদা সন্ন্যাসীর স্বর চিনিতে পারিয়া ভাবিল, "পারণের সন্ন্যাসী আইল এত দিনে।" তবে বুড়া সন্ন্যাসী নিশ্চয় আগেকার সব কথা ভুলিয়া গিয়াছে।

ডোমনীর সহিত যুক্তি করিয়া সদা ঘরে লুকাইয়া রহিল, কোন সাড়াশব্দ দিল না। সন্ন্যাসীর ঘন ঘন ডাকের উত্তরে ডোমনী বলিল, ঘরে কেহ নাই। সদার চালাকি বুঝিয়া উলূক চেঁচাইয়া বলিল, "ঘরে যদি থাক সদা প্রতিফল পাবে।" তখন ধর্মের অনুমতি লইয়া উলূক ঝড় তুলিয়া সদার কুঁড়ে উড়াইয়া লইয়া বল্লুকার জলে ফেলিয়া দিল এবং সদার সন্ধানে গিয়া দেখিল, সে টাটের তালপাতার নীচে লুকাইয়া আছে। ধরা পড়িয়া সদা সন্ন্যাসীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল। ঠাকুর বলিলেন, আমাকে দেখিয়া কেন ঘরের ভিতর লুকাইয়া রহিলে? সদা উত্তর করিল, বেগারের ভয়ে। এই পথ দিয়া সাধুসন্ন্যাসীরা যায়, তাহারা আমাকে দিয়া বোঝা বহাইয়া লয়। সন্ন্যাসী বলিলেন, কাল একাদশীর উপবাস গিয়াছে। আজ আমি ক্ষুধায় ব্যাকুল। তোমার ঘরে মাংস ভাত খাইয়া পারনা করিব।

কি ঘটিল অনুমান করা কঠিন নয়। সন্ন্যাসী মৎস্যমাংসে তুষ্ট হন নাই। শেষে লুইধরকে কাটিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিতে হইয়াছিল। দম্পতীর প্রতিজ্ঞা পালিত হইলে খুশি হইয়া সন্ন্যাসী আত্মপরিচয় দিয়া লুইধরকে পুনর্জীবিত করিয়া ও সকলকে বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র-কাহিনী সদা-খণ্ডের শেষাংশের অনুরূপ। অনুমান হয় যে, কাহিনীর মূল রূপে, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের রোহিতাশ্ব-শুনঃশেফ উপাখ্যানের মত, সদার পুত্র লুইধর হরিশ্চন্দ্রের পুত্র লুইচন্দ্রের পরিবর্তে বলি হইবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল এবং শেষে ছাগ অনুকল্প দিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল।

লুইধরের কাহিনী অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাতাকর্ণের কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে।

সাংজাত-খণ্ডে রামাই পণ্ডিতের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মের আদেশ পাইয়া আদিত্যদেব ব্রাহ্মণবংশে বিশ্বনাথ মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে মুনি পরলোক গমন করিলেন। রামাই তখন বালক মাত্র। মুনি বিশ্বনাথ ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী এবং কঠোরভাষী ও বাক্‌সিদ্ধ। এইজন্য মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিরা তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁহারা এখন ঘোঁট পাকাইলেন যে, মুনির সৎকারকার্যে তাঁহারা রামাইকে কোনরূপ সাহায্য করিবেন না। উপযুক্ত সময়ে সৎকার না হইলে মুনির শব বাসিমড়া হইবে এবং তাহা হইলে রামাইকে জাতিচ্যুত করা যাইবে। রামাই আসিয়া পিতার পরলোকগমন সংবাদ জানাইলে "কপটে মার্কণ্ড মুনি কান্দিতে লাগিল।" মার্কণ্ডেয় সকল মুনির কাছে এই খবর দিতে বলিলেন। খবর দিতে দিতে প্রাতঃকাল হইয়া গেল, এবং "প্রাতঃকালেতে মুনির সৎকার করিল।" তাহার পর মার্কণ্ডেয়কে সভাপতি করিয়া মুনিরা বৈঠক বসাইলেন। মার্কণ্ডেয় সভা উদ্বোধন করিয়া বলিলেন, লোকটা কাহাকেও খাতির করিত না, সুতরাং উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে। মার্কণ্ডেয়ের এই নীচতায় একজন মুনি তাঁহাকে রূঢ় কথা শুনাইয়া দিলেন, "মড়াকে খাঁড়ার ঘা খুব ত মর্দ্দানা।" আর এক মুনি বলিলেন, এখন রামাইকে ঠেকানো দায় হইবে। তাহার বাপ তবু দুই একজনকে খাতির করিত। রামাইয়ের কাছে সকলকেই মাথা নীচু করিয়া থাকিতে হইবে। রামাইয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা মুনি নানা কথা বলিতে লাগিলেন। শেষে সকলে একমত হইয়া রামাইকে পতিত বলিয়া একঘরে করিলেন।

কিছুদিন কাটিয়া গেলে পর রামাইয়ের পইতা লইবার সময় হইল। রামাইয়ের মা তাহাকে মার্কণ্ডেয়ের কাছে গিয়া পইতা লইতে বলিলেন। রামাই মার্কণ্ডেয়ের কাছে গেলে মার্কণ্ডেয় তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, তুমি উপবীত ধারণ করিবার আগেই বেদ পড়িয়া অন্যায় করিয়াছ। এখন অকাল যাইতেছে, বেদ পঠনপাঠন নিষিদ্ধ। তোমাকে পাঁচছয় বৎসর চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। অন্য মুনিদের কাছে গেলে তাঁহারাও সেই কথাই বলিলেন। রামাই কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল। তাহার

পর মায়ের আদেশে রামাই উপবীত লইতে মাতুলালয়ে চলিল। পথে যাইতে যাইতে মনে হইল মামারাও যদি পতিত বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে, তবে তো মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। তখন রামাই কাতরভাবে ধর্মকে স্মরণ করিতে লাগিল। ঠাকুর ভক্তের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে রামাইয়ের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে "তাম্র-উপবীত" দিয়া ধর্মপূজার পদ্ধতি বলিয়া দিলেন। রামাই আনন্দিতচিত্তে গৃহে ফিরিয়া ধর্মপূজায় নিরত হইল।

রামাইয়ের ধর্মপূজার কথা মার্কণ্ডেয়ের কানে গেল। তিনি রামাইকে উপহাস করিয়া বলিলেন, তুই নিজেও অধঃপাতে গেলি আর বাপেরও নাম ডুবাইলি। ভেড়ুয়া তুই, শালগ্রাম সেবা ছাড়িয়া সেই ঠাকুরের পূজা ধরিলি—

মদমাস দিয়া পূর্ণিত করিয়া
সদা ডোম পূজে যারে।

মার্কণ্ডেয়ের কথা রামাইয়ের মর্মভেদ করিল। ঠাকুর তাহার মনের বেদনা জানিয়া বলিলেন, তুমি দুঃখ করিও না। আমি তোমার সহায় রহিয়াছি। আজ হইতে তুমি বাক্‌সিদ্ধ হইলে।

ধর্মঠাকুরের নিন্দা করায় মার্কণ্ডেয়ের সর্বাঙ্গে ধবল দেখা দিল। মার্কণ্ডেয়ের পত্নী বলিলেন, নিশ্চয়ই কেহ তোমাকে শাপ দিয়াছে। মুনি বলিলেন, রামাই ছাড়া তো কেহ আমার কাছে আসে নাই। আর, রামাই ভেক ধরিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগে। তাহাকে আবার ভয় কিসের। ব্রাহ্মণী বলিলেন, অমন কথা বলিও না। "রামাঞি পণ্ডিত যেই সেই ধর্মরাজ।" তুমি রামাইয়ের তোষণ কর গিয়া। মুনিরা মার্কণ্ডেয়কে ঝুড়িতে বসাইয়া কাঁধে করিয়া রামাইয়ের কাছে লইয়া গেলেন। মার্কণ্ডেয় তাহার কাছে কাকুতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রামাইয়ের দয়ায় মার্কণ্ডেয়ের রোগ দূর হইল। মুনিরা সকলে রামাইকে ভক্তি করিতে লাগিলেন।

কাহিনী অনুসারে, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিরা রামাইয়ের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও উচ্চবর্ণের সমাজে রামাই প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। তবে ধর্মঠাকুরের পূজায় রামাই ছিল এক এবং অদ্বিতীয় পুরোহিত। হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্মপূজায় রামাই পৌরোহিত্য করিয়াছিল।

কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে রামাই কেশবতী নামে এক নীচুজাতের নারীকে বিবাহ করিয়াছিল। ইনিই রামাইয়ের একমাত্র পুত্র ধর্মদাসের মা।

রামাই পণ্ডিতের কাহিনী ইতিহাস নয়, গল্প। ধর্মপুরাণে রামাইয়ের ভনিতা আছে। তাহাতে এক পূর্বতন রামাঞির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ধর্মপুরাণের রচয়িতা রামাই ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিত রামাঞি হইতে পারেন না। হরিশ্চন্দ্র রাজাও ঐতিহাসিক নয়। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের শুনঃশেফ-আখ্যানে যে ইক্ষাকুবংশীয় বেধস্-পুত্র রাজপুত্র হরিশ্চন্দ্র উল্লিখিত তাহার মত এই হরিশ্চন্দ্রও গল্পেরই পাত্র।

ধর্মপূজাপদ্ধতি পুঁথিগুলিতে ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজার এবং "ঘরভরা" গাজনের বিধি বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ধর্মপুরোহিতদের কড়চা বই। প্রসঙ্গক্রমে সূর্যের ছড়া এবং ধর্মের বা শিবের চাষ প্রভৃতি প্রাচীন কাহিনীও ধর্মপূজার অঙ্গ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রামাঞি ধর্মপূজার আদি পুরোহিত বলিয়া ধর্মপূজাপদ্ধতির ছড়া এবং মন্ত্রগুলি রামাই পণ্ডিতের নামের ছাপ পাইয়াছে। কিন্তু আদিতে যে কোন এক ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক একটি ধর্মপূজাপদ্ধতি অথবা ধর্মায়ণসংহিতা রচিত হয় নাই তাহার একটি বড় প্রমাণ আছে। যতগুলি ধর্মপূজাপদ্ধতি দেখিয়াছি তাহাতে বিষয়ের সম্পূর্ণ মিল থাকিলেও ছড়াগুলির মধ্যে ভাষার এতটা সাদৃশ্য নাই যাহাতে সেগুলিকে কোন একটিমাত্র মূল গ্রন্থের পাঠভেদ বলিয়া নেওয়া যাইতে পারে। ধর্মপূজা মূলে ছিল পুত্রেষ্টি ব্রত (বা যজ্ঞ)। পুত্রধনে গৃহ পূর্ণ হয় তাই ধর্মের মানসিক পূজার নাম "ঘরভরা"। এই লৌকিক পূজার পদ্ধতি বরাবর মুখে মুখে চলিয়া আসিয়া পরবর্তী কালে বিভিন্ন ধর্মপূজকের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যতগুলি ধর্মপূজাপদ্ধতির পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনটিই দেড়শত বৎসরের বেশি পুরানো নয়। তবে ধর্মপূজার ছড়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে গ্রন্থবদ্ধ হইলেও ইহার মূল বস্তু বহু প্রাচীন। যেমন—

ভালো গো ডোমের ঝি সরোবর রাখ
সুহংস চরিয়া যায় তাহা নাই দেখ।
পখুর পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িয়া
ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া।

ব্রাহ্মণ বড়ুয়া নয় নিরঞ্জন রায়
দেখিতে দেখিতে হংস শূন্যেতে লুকায়।
হংসা হংসী দুই জনে আকাশের জ্যোতি
হংস চরিয়া যায় দোজ প্রহর রাতি।

এই ছড়ার মধ্যে কাহ্ন পাদের—

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া
ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্মণ নাড়িয়া।

ইত্যাদি চর্যাগীতিটির মিল সুস্পষ্ট। আরও দেড়-হাজার বছর পিছাইয়া গেলে বৃহদারণ্যক উপনিষদের কয়েকটি শ্লোকে ইহার প্রাচীনতম উৎসের সন্ধান পাই।

সাহিত্য হিসাবে ধর্মপূজাবিধানগুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই। নানা কারণে এই শ্রেণীর কড়চা বইয়ের মধ্যে "শূন্যপুরাণ" নামে ছাপা বইটি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তিনটি বিভিন্ন ধর্মপূজাবিধান কড়চা মিলাইয়া নগেন্দ্রনাথ বসু 'শূন্যপুরাণ' নামে বাহির করেন (১৯০৭)। বইটির বানান পরিচিত ধরণের নয় বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে বইটি খুবই প্রাচীন। কেহ বলিয়াছিলেন একাদশ শতাব্দী, কেহ বলিয়াছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দী, অপরে বলিয়াছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে নয়। কিন্তু শূন্যপুরাণ তো একখানি বই নয়। ইহাতে কতকগুলি মন্ত্র ছড়া এবং কাহিনীর টুক্‌রামাত্র সঙ্কলিত আছে। এগুলি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত ও লিপিবদ্ধ। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রতিপন্ন হয় যে এই রচনাগুলি দুই শত বৎসরের বেশি পুরানো নয়। পুঁথিও সেই সাক্ষ্য দেয়।

ধর্মপূজাপদ্ধতি গ্রন্থে এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের যে বর্ণনা পাই তাহা বিচার করিলে ধর্মঠাকুরের ইতিহাসের দুইটি পৃথক্ সূত্রের সন্ধান মিলে। প্রথম সূত্র হইতেছে বৈদিক বরুণ যম ও সূর্য দেবতার পূজা, যাহার সহিত সুপ্রাচীন অনার্য প্রস্তরপূজা ও কূর্মপূজার সংযোগ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সূত্র হইতেছে বিদেশী (সম্ভবত মুসলমান) যোদ্ধৃশক্তির পূজা, যাহার সহিত পূর্ববর্তী কালে ইরাণ হইতে আমদানি সূর্যপ্রতিমা পূজার সংমিশ্রণ হইয়াছে। প্রথম সূত্রে পাই রথারোহী ধর্মঠাকুরের কূর্মাকৃতি শিলাপ্রতিমা বা আসন

ও তদুপরি অঙ্কিত পদদ্বয়। দ্বিতীয় সূত্রে পাই শ্বেত-অশ্বারোহী বুট-পরা সিপাহীবেশী যোদ্ধা পুরুষ। (অর্বাচীন পুরাণের কল্কি-অবতারে ইহার পূর্বাভাষ।) প্রথম মূর্তিতে ঠাকুর হইতেছেন শস্যের ও প্রজারক্ষার দেবতা, দ্বিতীয় মূর্তিতে তিনি আরোগ্যের দেবতা এবং কল্কি-অবতারের মত অধার্মিকদ্বেষ্টা ও ধার্মিকপোষ্টা।

ধর্মঠাকুরের উপর রাজশক্তির আরোপ সম্ভবত মুসলমান-প্রভাবের পূর্বেই শুরু হইয়াছিল। স্থানীয় ধর্মঠাকুরের নামের শেষাংশ প্রায়ই "রায়" (যেমন কালুরায় খুদিরায় বাঁকুড়ারায় চাঁদরায় ইত্যাদি)। ইহা লক্ষণীয়। কোন কোন প্রাচীনস্থানের ধর্মঠাকুরের নাম "যাত্রাসিদ্ধি" এবং "অনুকূল-কোলা"। ইহাতে অনুমান হয় যে ধর্মঠাকুর অংশত ছিলেন ডোম বা অনুরূপ যোদ্ধা জাতির রণদেবতা। তুর্কী-অভিযানের পরে ইনি সহজেই সিপাহীতে পরিণত হইয়াছিলেন।

ধর্মপূজাপদ্ধতির শেষাংশে যে "ছোট জালালি" বা "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক ছড়া পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমান হয় যে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার অন্তর্গত জাজপুরে ধর্মের গাজনের সময়ে একদা মুসলমান আক্রমণকারীরা পূজা নষ্ট করিয়া পূজাস্থান ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহাদের অধিনেতা কোন ফকীর সম্ভবত নিজেকে ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত বলিয়া জাহির করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ধর্মোপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারণা হইয়া যায় যে, স্বয়ং ধর্মঠাকুরই গৌড়ের সুলতানরূপে আবির্ভূত।

> হাঁসা[১] ঘোড়া খাসা জোড়া[২] পায়ে দিয়া মোজা[৩]
> অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা।
> হিন্দুকুলে বোলাইলে ধর্ম অবতার
> মোমিনকুলে[৪] বোলাইলে খোদায় খোন্‌কার।

হিন্দু ও মুসলমান-ধর্মের মিলনের প্রথম প্রচেষ্টা ইহারই মধ্যে দেখিতেছি। বহুকাল পরে এই অবোধ প্রচেষ্টা সত্যনারায়ণ-পাঁচালীতে জাগ্রতভাবে দেখা দিয়াছিল।

---

১ হাঁসের মত শাদা। ২ উত্তম বস্ত্রের পোষাক। ৩ বুটজুতা। ৪ উচ্চবংশীয় মুসলমান।

৯. ধর্ম্মমঙ্গল-কাহিনী ও ধর্ম্মমঙ্গল-কবি

ধর্ম্মমঙ্গলগুলি যথার্থই কাব্য। সব ধর্ম্মমঙ্গলের একই বিষয়বস্তু.—ধর্ম্মের বরপুত্র লাউসেনের বিচিত্র বীরকর্ম ও পরিশেষে পশ্চিম-উদয়রূপ অসাধ্যসাধন কাহিনী। এইগুলির মূলে আছে কতকগুলি উপকথা বা লৌকিক গল্প এবং হয়ত অল্পস্বল্প পৌরানিক স্মৃতিকণা। ধর্ম্মমঙ্গলের পাত্রপাত্রী ও ঘটনাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। বিচারে বিশ্বাস টিকে না। ধর্মমঙ্গলগুলি সবই দক্ষিণরাঢ়ের কবির রচনা, এবং প্রায় সবগুলিই লেখা হইয়াছিল দামোদরের দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে, বর্ধমান জেলার অথবা বর্ধমান-হুগলী-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর এই পাঁচটি জেলার সমবেত কেন্দ্র অঞ্চলে। দক্ষিণরাঢ়ের কবিদের একটা বড় বিশেষত্ব আছে। ইঁহাদের প্রায় সকলেই মুকুন্দরামের অনুসরণে আত্মবিবরণের সঙ্গে দেবতার অনুগ্রহলাভ-কাহিনী ও কাব্যরচনার ইতিহাস ("গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণ") কিছু না কিছু দিয়াছেন। কোন ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতাই ইহার অন্যথা করেন নাই।

ধর্মমঙ্গল-কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি।

গৌড়েশ্বরের অধীন ঢেকুর গড়ের সামন্তরাজা কর্ণসেনের ছয় (মতান্তরে চারি) পুত্র বিদ্রোহী প্রজা ইছাই ঘোষকে দমন করিতে গিয়া নিহত হইলে বৃদ্ধ কর্ণসেন গৌড়ে চলিয়া আসেন এবং গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিবাহ করেন। এমন বিবাহে গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহাপাত্র (অর্থাৎ মন্ত্রী) মাহুদ্যার ঘোর অমত ছিল। রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের উপাসিকা ছিলেন। তিনি পিতৃগৃহে বর্ষীয়সী সহচরী সামুলার (পাঠান্তরে সাফুলা) কাছে ধর্মপূজা শিখিয়াছিলেন। সুকঠোর তপস্যা ("শালে ভর") করিবার পর ধর্ম্মের অনুগ্রহে রঞ্জাবতী লাউসেনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। রঞ্জাবতীর পুত্র হইয়াছে শুনিয়া গৌড়রাজমন্ত্রী মাহুদ্যার হিংসা জন্মিল। এখন হইতে তাহার চেষ্টা হইল, কি করিয়া শিশুকে নষ্ট করা যায়। দেবানুগৃহীত লাউসেন মহাপাত্রের সকল চক্রান্ত বিফল করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিল এবং লেখাপড়ায় ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিল। এখন গৌড়ে গিয়া রাজার দরবারে নিজের পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া উপযুক্ত সম্মান ও পুরস্কার লাভ করিতে হইবে। পুত্রের নির্বন্ধাতিশয্যে কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী লাউসেনকে গৌড়ে যাইতে অনুমতি দিল। পোষ্যভ্রাতা কর্পূরধবলকে সঙ্গে লইয়া লাউসেন গৌড়ের উদ্দেশে

বাহির হইল। পথে প্রথমেই পড়িল জালন্দার গড়। এখানে কামদল বা কামদ (অর্থাৎ "কেঁদো") বাঘ রাজাপ্রজাকে উদরস্থ করিয়া একেলা বাস করিতেছিল। লাউসেন তাহাকে হত্যা করিল। তাহার পর তারাদীঘিতে কুম্ভীরকে বধ করিয়া জামতিতে এক অসতী নারীর কোপে এবং গোলাহাটে এক গণিকার ছলনায় পড়িয়া পরে ধর্মের কৃপায় হনুমানের সহায়তায় নিস্তারলাভ করিল। অবশেষে দুই ভাই গৌড়ে পৌঁছিল। মহাপাত্রের অশেষ চক্রান্ত বিফল করিয়া লাউসেন রাজার দর্শন পাইল এবং নিজের বাহুবল দেখাইয়া রাজার কাছে পুরস্কার লাভ করিল। দেশে ফিরিবার পথে কালু ডোমের ও তাহার স্ত্রী লখ্যার সৌহার্দ্য ও আনুগত্য লাভ করিল। কালু ডোম সপরিবারে তাহার সঙ্গে চলিয়া আসিয়া দক্ষিণ-ময়না রাজ্যে বসতি করিল।

এদিকে মহাপাত্রের একমাত্র চিন্তা হইয়াছে, কি করিয়া লাউসেনকে বিনষ্ট করা যায়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে রাজাকে বলিয়া লাউসেনকে কামরূপ রাজ্য বিজয় করিতে পাঠাইল। লাউসেন কামরূপে গিয়া সেখানকার রাজাকে পরাজিত করিল এবং রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিল। পথে তাহার আরও দুইটি স্ত্রী লাভ হইল।

পুনরায় লাউসেনকে পাঠানো হইল। এবারে অভিযান কঠিনতর। সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা কানড়া অশেষ রূপগুণসম্পন্না। কানড়াকে বিবাহ করিতে কিছুকাল হইতে গৌড়েশ্বরের বাসনা। কিন্তু এই বাসনা পূর্ণ করিবার পক্ষে বহুতর বাধা। কানড়া দেবীর অনুগৃহীত। যে-সে লোক যাহাতে তাহাকে বিবাহ করিতে না পারে সেজন্য দেবী একটি লোহার গণ্ডার দিয়া বলিয়াছিলেন, যে খাঁড়ার ঘায়ে গণ্ডারের মাথা কাটিয়া ফেলিতে পারিবে সেই কানড়ার স্বামী হইবে। রাজা বা মহাপাত্রের সাধ্য ছিল না এ কাজ করে। দেবীর অনুগ্রহে লাউসেন লৌহ-গণ্ডারের শিরচ্ছেদ করিয়া কানড়াকে বিবাহ করিল এবং নববিবাহিত স্ত্রী ও তাহার পরিচারিকা ধুমসীকে লইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল। যথাসময়ে লাউসেনের পুত্র জন্মিল। তাহার নাম হইল চিত্রসেন।

অতঃপর লাউসেনের তৃতীয় অভিযান। অজয়তীরবর্তী ঢেকুর গড়ের বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষ বাসুলী দেবীর বর পাইয়া বিশেষ স্পর্ধিত হইয়াছিল। লাউসেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা এই ইছাইকে দমন করিতে গিয়াই নিহত হইয়াছিল। এখন ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে লাউসেনকে প্রেরণ করা

হইল। অজয় নদের তীরে দুই বীরে ভীষণ যুদ্ধ হইল। ইছাই দেবীর আশ্রিত, লাউসেন বিষ্ণুর। উভয় পক্ষে একাধিকবার জয়পরাজয়ের পর পরিশেষে লাউসেন বিজয়ী হইল। ইছাই মারা পড়িল। ইছাইয়ের পিতা সোম ঘোষ গৌড়েশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিল।

আবার লাউসেনের ডাক পড়িল। গৌড়ে ভীষণ বৃষ্টি ও জলপ্লাবন উপস্থিত, লাউসেনকে এই দৈবদুর্যোগ কাটাইয়া দিতে হইবে। ধর্মের কৃপায় লাউসেন বৃষ্টি ও জলপ্লাবন প্রশমিত করিল।

এখনও লাউসেনের নিস্তার নাই। এইবার তাহাকে যে সঙ্কটে ফেলা হইল তাহা শুধু উৎকট নয়, অসম্ভব। লাউসেনকে বলা হইল পশ্চিমগগনে সূর্যোদয় দেখাইতে হইবে। না পারিলে তাহার মাতাপিতাকে শূলে দেওয়া হইবে। কি করে, বাপমাকে গৌড়েশ্বরের কাছে জামিন রাখিয়া লাউসেন মাতার পুরাতন সহচরী ধর্মের উপাসিকা সামুলাকে লইয়া ধর্মের পরম পীঠস্থান হাকন্দে (বা হাকণ্ডে) গমন করিল। সেখানে সুতীব্র তপশ্চর্যাতেও সূর্যের পশ্চিমোদয় করাইতে না পারিয়া অবশেষে ছিন্নমস্ত হইয়া আত্মাহুতি দিল। তখন ধর্ম সন্তুষ্ট হইলেন। পশ্চিমদিগন্তে সূর্যোদয় হইল। এই অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষী রহিল বাজনদার ("বাইতি") হরিহর।

ইতিমধ্যে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া মহাপাত্র ময়নাগড় আক্রমণ করিয়াছে। লাউসেনের প্রাসাদরক্ষী সৈন্যের নেতা কালু ডোম উৎকোচে বশীভূত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে স্ত্রীর ভর্ৎসনায় প্রবুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিল এবং সপুত্র নিহত হইল। তখন কালুর স্ত্রী অন্তঃপুর রক্ষা করিবার জন্য একাই যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু সে মারা পড়িল। রানী কলিঙ্গাও যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিল। সব শেষে রানী কানড়া সহচরী ধুমসীকে লইয়া যুদ্ধে নামিলে তখন মহাপাত্র পরাজিত হইয়া গৌড়ে ফিরিয়া গেল।

হাকন্দ হইতে লাউসেন গৌড়ে ফিরিল। মহাপাত্র হরিহরকে প্রচুর ঘুষ দিতে চাহিল, যাহাতে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। ঘুষ লইতে রাজি হইয়াও হরিহর শেষ পর্যন্ত সত্য সাক্ষ্যই দিল যে, সে স্বচক্ষে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখিয়াছে। লাউসেনের জয়জয়কার হইল। ক্রোধোন্মত্ত মহাপাত্র হরিহরের

বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়া তাহাকে শূলে চড়াইল। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া নির্ভীক হরিহর মৃত্যুবরণ করিল।

বাপমায়ের সঙ্গে লাউসেন দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে কালু লখ্যা এবং অন্যান্য সকলে যুদ্ধে মরিয়াছে। তিনি তখন ধর্মের স্তব করিতে লাগিলেন। যাহারা প্রাসাদরক্ষায় প্রাণ দিয়াছিল তাহারা সকলেই ধর্মের অনুগ্রহে একে একে বাঁচিয়া উঠিল। অতঃপর লাউসেন নিরুদ্বেগে ময়নায় রাজত্ব করিতে লাগিল। তাহার পর যথাকালে পুত্র চিত্রসেনের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া লাউসেন সপরিবারে স্বর্গে চলিয়া গেল।

ধর্মমঙ্গল-কাহিনী প্রধানত উপকথার সমষ্টি। ইহাতে কৃষ্ণলীলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত যথেষ্ট আছে। লাউসেন কৃষ্ণের মত বিচিত্রকর্মা, কর্পূরধবল ছোট ভাই হইলেও যেন বলরাম, আর মহাপাত্র তো দ্বিতীয় কংস। বিষয়বস্তুতে মহাকাব্যের উপযুক্ত প্রসার এবং বৈচিত্র্য আছে। প্রধান চরিত্রগুলি বেশ পরিস্ফুট। এক কবি ধর্মমঙ্গলকে "গৌড়কাব্য" বলিয়াছেন। আমরাও বলি, ইহা রাঢ়বঙ্গের জাতীয় কাব্য।

ধর্মমঙ্গল কাহিনী খুব প্রাচীন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে সকল ধর্মমঙ্গল কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার কোনটিকেই সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে ফেলা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, খেলারাম চক্রবর্তী নামে কোন এক কবি ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাব্যই প্রাচীনতম ধর্মমঙ্গল। কিন্তু খেলারামের কাব্যের কোন পুঁথি আমরা পাই নাই। খেলারাম বলিয়া কেহ ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন এমন অনুমানের কোন সমর্থন এখনও মিলে নাই।

সকল ধর্মমঙ্গল কাব্যেই ময়ূরভট্টকে ধর্মের গানের আদি কবি বলা হইয়াছে। ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল বা ধর্মপুরাণ পাওয়া যায় নাই, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন খাঁটি কথা বলিবার উপায় নাই। মনে হয়, সংস্কৃত সূর্যশতকের কবি ময়ূরভট্টই ইনি। সূর্যদেবতাকে বন্দনা করিয়া ময়ূরভট্ট নাকি কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতা এবং তিনিও কুষ্ঠরোগ ভালো করেন। হয়ত এইসূত্রে ময়ূরভট্টের নাম ধর্মঠাকুরের শাস্ত্রের সঙ্গে বিজড়িত হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে তিনচারিখানি নিশ্চিতভাবে এবং একখানি

সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল। বাকিগুলি পরবর্তী শতাব্দীতে লেখা। শ্যাম পণ্ডিতের বই হয়ত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হইয়াছিল। শ্যাম পণ্ডিত বর্ধমান-বীরভূমের সীমান্তের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। তবে ইঁহার কাব্যের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

অদ্যাবধি যতগুলি সম্পূর্ণ ধর্মমঙ্গল কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থ অবিসংবাদিতভাবে সর্বপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পরবর্তী প্রায় সব ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাই ময়ূরভট্টের সঙ্গে রূপরামকেও আদি-কাব্যকর্তার সম্মান দিয়াছেন।

রূপরাম তাঁহার কাব্যের রচনাসমাপ্তিকাল নির্দেশ করিয়াছেন এই হেঁয়ালিতে—

> শাকে সীমে জড় হৈলে যত শক হয়
> তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।
> রসের উপরে রস তায় রস দেহ
> এই শকে গীত হৈল লেখা কর্যা নেহ।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই সমস্যা পূরণ করিয়াছেন। তিনি হিসাব করিয়া পাইয়াছেন ১৫৭১ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)। এই তারিখ যে ঠিক তাহার সমর্থন এক প্রাচীন পুঁথিতে মিলিয়াছে। তাহাতে রচনাকালের প্রসঙ্গে শাহ্ শুজার উল্লেখ আছে।

> রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা
> পরম কল্যাণে যত আছিল ত প্রজা।
> সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর
> দ্বিজ রূপরাম গায় শ্রীরামপুরে ঘর।

১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ শুজা রাজমহলে বাঙ্গালার সুবেদার।

কাব্যরচনার ইতিহাস বলিতে গিয়া রূপরাম যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা সরল, করুণ এবং হৃদয়গ্রাহী। সেকালের পল্লীবাসী নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জীবনের এমন পরিপূর্ণভাবে বাস্তব ও জীবন্ত ঘরোয়া ছবি পুরানো সাহিত্যে আর নাই।

আধুনিক বর্ধমান জেলার পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে কাইতি গ্রামের অদূরে এবং কবিকঙ্কণের বাসগ্রাম দামিন্যার অনতিদূরে অবস্থিত শ্রীরামপুর গ্রামে পুরুষানুক্রমে রূপরামের নিবাস ছিল। মা দময়ন্তী, বাপ শ্রীরাম চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন পণ্ডিত, তাঁহার টোলে বিস্তর ("বিশা-শয়") পড়ুয়া পড়িত। কবির পিতা বাল্যকালেই স্বর্গত। পিতার মৃত্যুর পর রূপরাম বাড়িতে বসিয়া অমরকোষ এবং জুমরনন্দীর টীকা সহ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িতেছিলেন। বাড়ীর কর্তা বড় ভাই রত্নেশ্বর। তাঁহার সহিত রূপরামের বনিত না। রূপরাম ছোট ভাই রামেশ্বরকে বড় ভালোবাসিতেন।

কোন কারণে রূপরামের চালচলন রত্নেশ্বরের ভালো লাগিল না। রূপরামকে রত্নেশ্বর "খাইতে শুইতে বাক্য বলে জ্বলন্ত আগুন।" রূপরাম সহ্য করেন না, সুতরাং সকাল সন্ধ্যায় দুই ভাইয়ের দেখা হইলেই ঝগড়া বাধে। দাদার বাক্যবাণ একদিন রূপরামের দুঃসহ লাগিল। সেদিন বুধবার। রূপরাম মনের দুঃখে ভাবিলেন, গৃহত্যাগী হইব। সংকল্পমাত্র খুঙ্গি-পুঁথি বাঁধিয়া লইয়া গ্রাম ছাড়িলেন। সম্বল শুধু মণিরাম রায়ের দেওয়া তসরের ধুতি একখানি এবং "পঙ্ক" আনা কড়ি। তখন পাসণ্ডার ভট্টাচার্যদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। নিকটবর্তী আড়ুই গ্রামে পাসণ্ডা-নিবাসী রঘুরাম ভট্টাচার্যের টোল ছিল। রূপরাম সেখানে গিয়া হাজির। পথশ্রান্ত নিরাশ্রয় বালককে দেখিয়া ভট্টাচার্যের মায়া হইল। তিনি রূপরামকে "বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে", এবং "আনন্দে পড়ান পাঠ হরষিত মনে"।

রূপরামের আগ্রহে এবং বুদ্ধিমত্তায় আকৃষ্ট ভট্টাচার্য তাঁহাকে যখন তখন পাঠ বলিয়া দিতেন। রূপরাম লিখিয়াছেন, ব্যাকরণে তাঁহার এমন কুশলতা যে তিনি সাত মাসে ব্যাকরণের সাত টীকা পড়িয়া ফেলিলেন। রূপরামের "বিদ্যা বিনু ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে কিছু নাঞি"। টোলে পড়ুয়া রূপরামের খুব খাতির।

অধ্যাপক রঘুরাম ভট্টাচার্য ছিলেন সুপুরুষ, সহৃদয় ও সুপণ্ডিত। তবে স্বভাবতই তার্কিক ছাত্রের সঙ্গে তর্কে অসহিষ্ণু। গুরুর গৌরব করিয়া রূপরাম লিখিয়াছেন

আড়ুইয়ে পড়ান গুরু চৌপাড়ির ঘর
শ্যামল-উজ্জ্বল তনু পরমসুন্দর।
পরমপণ্ডিত গুরু বড় দয়াময়

ব্যাকরণপাঠ শেষ করিয়া রূপরাম কাব্য ও ছন্দঃশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

মাঘ[১] রঘু[২] নৈষধ[৩] পড়িল হরষিত
পিঙ্গল[৪] পড়িতে বড় মনে পাইল প্রীত।

একদিন রূপরাম একান্তে বসিয়া কোন কাব্য হইতে সীতাহরণ-কাহিনী আপন মনে পড়িতেছিলেন। গুরু যে আড়াল হইতে শুনিতেছেন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। একটু পরে রূপরামের নজরে পড়িল—

ভট্টাচার্য গুরু মোর বুক নাহি বান্ধে
সীতার হরণ পাঠে গড়াগড়ি কান্দে।

ধর্মের মায়ায় অকস্মাৎ কদিন গুরুশিষ্যের এমন সহৃদয় সম্পর্কে ছেদ পড়িল। সেদিন শনিবার। রূপরাম গুরুর কাছে পাঠ লইতেছেন। গুরুর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইলেও মুখে কিছু বলিতে শিষ্যের সাহসে কুলাইতেছে না,— "পূর্বপক্ষ[৫] শুনাইতে গুরুকে ডরাই"। তবুও সমাসটীকার একস্থানের ব্যাখ্যা শুনিয়া রূপরাম চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি গুরুর ব্যাখ্যায় সংশয় প্রকাশ করিলেন। শিষ্যের প্রতিবাদে গুরু জ্বলিয়া উঠিলেন। তবুও রূপরাম তর্ক ছাড়িলেন না। তিনবার প্রতিবাদ করায় রঘুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া "ঐমনি পুঁথির বাড়ি বসাইল গায়", এবং ভর্ৎসনা করতে লাগিলেন—

গোটা দুই অক্ষর পড়াতে যায় দিন
পড়াবার বেলা হয় এহার অধীন।
বিশা-শয়[৬] পড়ুয়া থাকে মোর মুখ চায়্যা
দুই প্রহর বেলা যায় এহার লাগিয়া।
গোটা চারি অক্ষর অনন্ত বর্ণ কয়
সদাই পাঠের বেলা জঞ্জাল লাগয়।

ভট্টাচার্য বলিয়া দিলেন, তোমাকে আর পড়াইতে পারিব না। তুমি বাড়ী চলিয়া যাও। বেশি পড়িবার ইচ্ছা থাকিলে নবদ্বীপে অথবা শান্তিপুরে

---

১ মাঘের শিশুপালবধ। ২ কালিদাসের রঘুবংশ। ৩ শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত। ৪ পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র এবং প্রাকৃতপৈঙ্গল। ৫ প্রশ্ন। ৬ বহুসংখ্যক আক্ষরিক অর্থ ২০ + ১০০ অর্থাৎ ১২০।

কিংবা জৌগ্রামে কণাদ ভট্টাচার্যের কাছে যাইতে পার,—"তাঁর সম ভট্টাচার্য শান্তিপুরে নাঞিঃ"।

গুরুর ক্রুদ্ধ মূর্তির চমৎকার বর্ণনা রূপরাম দিয়াছেন। রূপরাম বলিতেছেন, "সূর্যের সমান গুরু পরমসুন্দর"। তাঁহার ক্রুদ্ধ আরক্ত গৌরবর্ণ মুখে বিলীয়মান বসন্তের দাগগুলি যেন জাগিয়া উঠিল।

বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা
বিটঙ্ক[১] মুখের শোভা বসন্তের চিনা[২]

দুঃখিতচিত্তে রূপরাম পুঁথিপত্র গুছাইয়া লইয়া নবদ্বীপে পড়িতে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। "হেন বেলা জননী পড়িয়া গেল মনে", এবং সঙ্গে সঙ্গে "পূনর্বার যাত্রা হইল শ্রীরামপুরের গনে।[৩] আড়ুই গ্রাম পিছনে ফেলিয়া বাসা গ্রাম ডাহিনে রাখিয়া তিনি ঘরমুখে যে প্রাচীন ও পরিত্যক্ত রাস্তা ধরিলেন তাহা সোজা কিন্তু দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল। "পুরানো জাঙ্গালে নাঞিঃ জীবনের আশা"।

পুরানো জাঙ্গাল ধরিয়া কিছুদূর গিয়া রূপরাম পথভ্রষ্ট এবং দিশাহারা হইয়া পলাশনের বিলে ঘুরিতে লাগিলেন। হঠাৎ উপরে চাহিয়া দেখিলেন, আকাশে দুইটা শঙ্খচিল উড়িতেছে। নীচে চোখ নামাইয়া দেখেন, দুইটা বাঘ দুইদিকে বসিয়া লেজ নাড়িতেছে। দেখিয়াই রূপরাম ভয়ে দৌড় দিলেন এবং গোপালদীঘির পাড়ে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। হাতের পুঁথিপত্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। একটু সুস্থ হইয়া পুঁথি কুড়াইতে গিয়া দেখা গেল, সব পুঁথি পাওয়া যাইতেছে না। কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হইয়া কোথা হইতে সুবন্ত-টীকার ও কারক-টীকার পুঁথি কুড়াইয়া রূপরামের হাতে দিলেন। কি ক্ষণে কি বেশে ধর্মঠাকুর দেখা দিলেন, তাহা রূপরামের কথায় বলি।

একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা
সম্মুখে দাণ্ডাইল ধর্ম্ম গলে চাম্পামালা।

---

১ সুন্দর। ২ চিহ্ন। ৩ পথে, দিকে।

গলায় চাঁপার মালা আসা-বাড়ি[১] হাথে
ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম্ম দাণ্ডাইল পথে।
প্রথমে আপনি ধর্ম্ম কুড়াইল পুঁথি
সম্মুখে দাণ্ডাইল যেন ব্রাহ্মণমূরতি। . . .
ভয় নাই আপনি বলেন ভগবান
এই লহ খুঙ্গি পুঁথি বাঁধ অভিধান।

চোখের সামনে অকস্মাৎ এহেন মূর্তি আবির্ভূত দেখিয়া রূপরাম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন তাহার হাতে আশীর্বাদী ফুল দিয়া আশ্বস্ত করিয়া ঠাকুর বলিলেন, আমি তোমাদের গ্রামের ধর্মঠাকুর বাঁকুড়ারায়। তুমি ভিন্ন গাঁয়ে পড়িতে গিয়াছ, আর আমি তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি! তোমার আর পড়াশোনায় কাজ নাই। পুঁথিপত্র তুলিয়া রাখ গিয়া। কাল হইতেই তুমি আমার "বারমতি" গান গাহিবার ব্যবস্থা করিবে। গানের সরঞ্জাম যোগাড় করিয়া দিব—"চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদলি"। ঠাকুর আরও বলিলেন, তোমার পূর্বজন্মের পুণ্যে তুমি আমার দেখা পাইলে। তুমি নিশ্চিন্তমনে আমার গান রচনা কর এবং গাহিয়া বেড়াও। সে কাজে আমি তোমাকে শক্তি দিলাম। তোমার ভয় নাই।

যে বোল বলিবে তুমি সেই হবে গীত . . .
যখন শুনিব তব মন্দিরার ধ্বনি
তুমি উপলক্ষ্য গীত গাইব আপনি।

এই বলিয়া ঠাকুর রূপরামের কানে মহাবিদ্যা শুনাইয়া গলায় হাড়ের মালা পরাইয়া দিলেন। হাড়মালা দেখিয়া রূপরামের ভয় কাটিয়া গিয়া ক্রোধ হইল। বলিলেন, বামুনের ছেলে আমি। হাড়মালা পরিয়া জাত খোয়াইয়া ধর্মের গান গাহিয়া বেড়াইব না। "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমি গীতে কার্য নাই।"

এই শুনিয়া ধর্মঠাকুর তখনই মিলাইয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া রূপরাম ভয়ের চোটে চোখে অন্ধকার দেখিয়া দৌড় দিলেন। যখন হুঁশ হইল তখন

---

১ ছোট বা মাঝারি আকারের লাঠি যাহা ফকীরেরা ব্যবহার করে। আধুনিক কালের আসাসোঁটা।

দেখিলেন যে তিনি গ্রামের সীমান্তে আসিয়া গিয়াছেন। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। শ্রান্ত ও ক্লিষ্ট রূপরাম শাঁখারিপুকুরে নামিয়া এক পেট জল খাইয়া গুটিগুটি ঘরের দিকে চলিলেন। মনে আশা ছিল, দাদার অজানিতে চুপিচুপি "প্রণাম করিব গিয়া মায়ের চরণ।" ঘরের দুয়ারে দুই বোন সোনা ও হীরা (পাঠান্তরে রূপা) বসিয়াছিল। তাহারা ভাইকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে চেঁচাইয়া উঠিল, "রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি[১] -পুঁথি লয়্যা।" শুনিয়া রত্নেশ্বর বাহির হইয়া আসিল। দাদাকে দেখিয়া রূপরাম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কি বলিবে কি করিবে ঠিক করিতে পারিলেন না।

তরাসে কাঁপিল তনু তালপাত পারা
পালাবার পথ নাহি বুদ্ধি হৈল হারা।

ভাইকে ঘরে ঢুকিতে না দিয়া রত্নেশ্বর গালি পাড়িতে লাগিল। তাহার অভিযোগ, রূপরাম "কালি গিয়াছে পাঠ পড়িতে আজি আইল ঘরে"। ভাইয়ের হাত হইতে খুঙ্গি-পুঁথি কাড়িয়া লইয়া রত্নেশ্বর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। রূপরাম সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া সেইখান হইতেই ফিরিলেন। তাঁহার মনে এই দুঃখই জাগিতে লাগিল, "জননী সহিত নাহি হইল দরশন।" তখনও "সোনা হীরা দুটি বনি আছিল দুয়ারে", কিন্তু দুঃশাসন দাদার ভয়ে তাহারা "জননীকে বারতা বলিতে নাহি পারে"।

শ্রীরামপুর হইতে বাহির হইয়া রূপরাম উত্তরমুখে চলিতে লাগিলেন। পরের দিন সকালে দামোদর তীরে পৌঁছিলেন। তখন তিন দিন অনাহার চলিতেছে। রাস্তার লোকের কাছে খোঁজ পাইয়া সেখানকার এক সহৃদয় গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষার জন্য গেলেন। কৃতজ্ঞ কবি লিখিয়াছেন—

ঠাকুরদাস পাল তায় বড় ভাগ্যবান
না বলিতে ভিক্ষা দিল আড়াই সের ধান।
আড়াই সের ধানেতে কিনিল চিড়াভাজা
দামোদরের জলেতে করিল স্নান পূজা।

---

১ দোয়াত কলম রাখিবার ঝাঁপি অথবা কৌটা।

ধর্মের আদেশ প্রত্যাখ্যান করার মুহূর্ত হইতে দুর্দৈব রূপরামের পাছু লইয়াছে। সে দৈব তখনো ছাড়ে নাই। চিড়াভাজা উদরস্থ হইল না। কবির কথায় বলি—

জলপান করি তথা বড় অভিলাষে
আচম্বিতে চিড়াভাজা উড়াইল বাতাসে।
চিড়াভাজা উড়্যা গেল শুধু খাই জল
খুঙ্গি-পুঁথি বয়্যা যাইতে অঙ্গে নাহি বল।

দামোদর পার হইয়া রূপরাম উত্তরমুখে চলিলেন। কয়েক ক্রোশ গিয়া শোনা গেল দিগ্‌নগর গ্রামে তাঁতিদের বাড়ীতে ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণভোজন হইতেছে। রূপরাম সেখানে গিয়া জুটিলেন। ফলারে "চিড়া দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন" হইলেও একটু খুঁত রহিয়া গেল, খই নাই। কবি লিখিয়াছেন—

মনে বড় সাধ ছিল খাব চিড়া দই
তাঁতি-বাড়ি ধর্মঠাকুর নাহি দিল খই।

ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ হইলে গৃহস্থ দশগণ্ডা কড়ি দক্ষিণা দিল, কিন্তু তাহাতেও দৈবের দৃষ্টি। দেখা গেল, দেড় বুড়ি কড়ি কানা।

দিগ্‌নগর ছাড়িয়া চলিতে চলিতে রূপরাম গোপভূমে এড়াইল গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। এইখানেই তাঁহার যাত্রা শেষ। সেখানকার ব্রাহ্মণ রাজা (অর্থাৎ জমিদার) গণেশ রায় রূপরামকে পাইয়া খুশি হইলেন। গণেশ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া রূপরাম ধর্মের গান রচনা করিবার ও গাহিবার সুযোগ পাইলেন। রাজা সব যোগাড় করিয়া দিলেন। রূপরাম লিখিয়াছেন—

তবে গিয়া এড়াল্যে দিলাম দরশন
মহারাজা গণেশ রায় দেখিল স্বপন।
চামর মন্দিরা দিল নানাবর্ণ সাজ
আনন্দে গাইল গীত ধর্ম্মের সমাজ।

তাহার পর রূপরাম লিখিতেছেন যে, তিনি যখন ধর্মের মঙ্গল-গান রচনা করিয়া গাহিতে শুরু করেন, তখন শাহ্ শুজা রাজমহলে বাঙ্গালার সুবেদার।

রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা
পরম কল্যাণে যত আছিল ত প্রজা।
বর্ধমানে যবে ছিল খালিপে হাকিম
(তাঁর পরা) জয় হইল দক্ষিণে মহিম।
সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর
দ্বিজ রূপরাম গায় শ্রীরামপুরে ঘর।।

রূপরামের আত্মকাহিনীতে যেটুকু অনুক্ত আছে সেটুকু জনশ্রুতি পূরণ করে। গ্রামের এক হাড়ির মেয়েকে নাকি রূপরাম ভালোবাসিতেন। পরে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ধর্মঠাকুর যে তাঁহাকে হাড়মালা দিয়াছিলেন, সে কথায় বোধ হয় কবি তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি দাদা রত্নেশ্বরের বিরাগের হেতুও বোধ করি ইহাই। রূপরাম সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। সেইজন্য কাব্যের ভনিতায় তিনি প্রায়ই নিজেকে "ফকীর" বলিয়াছেন,—"রূপরাম ফকীর ধর্মের গীত গায়।"

রূপরামের আত্মবিবরণীতে আমরা আধুনিক কালের ছোটগল্পের পরিপূর্ণতা পাই। ইহাতে যে বস্তুদৃষ্টি আছে, তাহা সেকালের পক্ষে অভিনব। তাঁহার কাব্যের মধ্যেও এমন নবীনতার পরিচয় অসুলভ নয়। রূপরামের সৃষ্ট চরিত্রগুলির কোনটিই অবাস্তব নয়। এই বাস্তবপরতার জন্য রূপরামের কাব্য মুকুন্দরামের রচনার পরেই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

রূপরামের আত্মকাহিনীতে মুকুন্দরামের প্রভাব যৎকিঞ্চিৎ আছে। পরবর্তী কোন কোন দক্ষিণরাঢ়ের ধর্মমঙ্গল-রচয়িতা এই বিষয়ে রূপরামের অনুসরণ ঘনিষ্ঠভাবে করিয়াছেন।

রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গল রূপরামের কাব্যের কিছুকাল পরে লেখা হয়। রামদাস আদকের আত্মকথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

রামদাসের জন্ম ভুরশুট (বা ভুরশিট, প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠী) পরগণার অন্তর্ভুক্ত হায়াৎপুর গ্রামে। পিতার নাম রঘুনন্দন। জাতিতে কৈবর্ত। এইখানকার জমিদার প্রতাপনারায়ণের অধিকারে হায়াৎপুর গ্রামের মণ্ডল (অর্থাৎ তহশিলদার) ছিল চৈতন্য সামন্ত। চৈতন্য সামন্ত দুর্দান্ত কর্মচারী। একদা পৌষ কিস্তির

খাজনা দিতে না পারায় পিতার অনুপস্থিতিতে চৈতন্য সামন্ত রামদাসকে ধরিয়া কয়েদ করিয়া রাখিল। রঘুনন্দন গৃহে ফিরিয়া রাজার সহিত দেখা করিয়া খাজনার দায় হইতে সেবারের মত রেহাই পাইলেন। এদিকে কবি কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া ঘরে আসিয়া জলযোগ করিয়া রাত্রিযাপন করিলেন এবং ভোরবেলায় মামার বাড়ীর দিকে পলাইলেন। রামদাসের মাতুলালয় গোরুটি গ্রামে। পথে নানা শুভলক্ষণ দেখা গেল।

চলিতে চলিতে রামদাস এক অশ্বারোহী সিপাহীর সামনে পড়িলেন। সিপাহী দেখিয়াই রামদাসের ভয় হইল, ভাবিলেন বুঝি বেগার ধরিবে। রামদাস লুকাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চারিদিকে শুধু ধানক্ষেত, লুকাইবার ঠাঁই নাই। এদিকে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত।

সিপাহী আসিয়া রামদাসকে ধরিয়া তাহার মাথায় লোটাকম্বল চাপাইয়া দিল। বহিতে বহিতে লোটাকম্বল ক্রমশ অত্যন্ত ভারি বোধ হইতে লাগিল। বুঝিয়া সিপাহী শাসাইল, মোট ফেলিয়া দিলে তোকে কাটিয়া ফেলিব। সিপাহীর নিষ্ঠুর বাক্যে রামদাস ভয়ে চোখ বুজিলেন। একটু পরে চোখ খুলিয়া দেখেন, কোথায় সিপাহী কোথায় বা মোট। আতঙ্কে রামদাসের গায়ে জ্বর আসিল। না থামিয়া রামদাস মামার বাড়ীর দিকে আগাইয়া চলিলেন। পথে পড়িল কানাদীঘি। দীঘির ঘাটে নামিয়া দেখা গেল পুকুরে জল নাই। রামদাস ঘাটে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন ধর্মঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নবীন ব্রাহ্মণের বেশে আবির্ভূত হইয়া তিনি গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেন এবং ধর্মের গান রচনা করিতে বলিলেন। রামদাস বলিলেন, প্রভু, লেখাপড়া না করিয়া শুধু মাঠে গোরু চরাইয়াছি। ছেলেখেলায় ধর্মপূজা করিয়াছি বটে, কিন্তু আসল পূজা কিছুই তো জানি না। ধর্মঠাকুর অভয় দিয়া বলিলেন, কোন চিন্তা নাই। আসরে বসিয়া আমাকে স্মরণ করিবে, "সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাষিবে বদনে"। এই বলিয়া রামদাসের ডাহিন করতলে মন্ত্র লিখিয়া দিয়া ও নিজের স্বরূপ দেখাইয়া ধর্মঠাকুর অন্তর্ধান করিলেন। এ ঘটনার কিছুকাল পরে রামদাস ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়া নিজের গ্রামের ধর্মঠাকুর যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরে প্রথম গান করিলেন, "বেদ বসু তিন বাণ" (১৫৮৪) শকাব্দের ভাদ্র মাসে (অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে)।

ধর্মমঙ্গল-কাব্যের আর এক বিখ্যাত কবি সীতারাম দাস আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ যাহা দিয়াছেন তাহা অনেকটা রামদাসের অভিজ্ঞতারই মত।

সীতারামের নিবাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলায় খণ্ডঘোসের কাছে সুখসাগর গ্রামে। কিছুদিন ধরিয়া কবি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যে, দেবী গজলক্ষ্মী (মনসা) তাঁহাকে ধর্মের গান রচনা করিতে বলিতেছেন। এই স্বপ্নের কথা তিনি খণ্ডঘোষ-নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্তীকে বলিয়াছিলেন। কিছু কাল যায়। একদা বৈশাখ মাসের প্রথমে মহাসিংহ চড়াও হইয়া সে অঞ্চলের গ্রাম লুঠ করিতে আসিল। দস্যুরা চলিয়া গেলে পর কবির এক স্বজন তাঁহাকে বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিতে বলিল। সীতারাম পরদিন ভোরবেলা বনের দিকে চলিলেন। বাড়ীর বাহির হইতেই শুভ লক্ষণ দেখা গেল।

বনের মুখে জামকুড়ির চৌকী। সেখানে সীতারাম একটু বসিলেন এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইতে। বসিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতেছেন, এমন সময় একটা লোক দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল, ও পথে যাইও না, সিপাহী বেগার ধরিতেছে।

ভয় পাইলেও সীতারাম ক্ষান্ত হইলেন না। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বড় বড় গাছ দেখিয়া সীতারামের আনন্দ হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই যাহা দেখিলেন তাহাতে ভরসা উড়িয়া গেল। কবি বলিতেছেন, "দেখিলাম সম্মুখে এক এরাকের ঘোড়া।" ঘোড়া দেখিয়া বোঝা গেল, সঙ্গে সিপাহী আছে, এবং সে বেগার ধরিবে। সীতারাম পুকুরের গাবা দিয়া দৌড়াইলেন। যাইতে যাইতে দেখেন, "অন্ধকার গহনে হরিণী বুলে ধায়্যা।" প্রথম বৈশাখ, বনের অপূর্ব শোভা।

> বৈশাখ সময় তায় কুড়চির ফুল
> ঝুপঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল।
> কথি কথি কাননে হরিণী কালসার
> ক্ষণেকে দিবস হয় ক্ষণেকে অন্ধকার।

বনের মধ্যে হঠাৎ ঝড় উঠিল। আতঙ্কিত সীতারাম ঝড়ের শব্দে ঘোড়ার দৌড় ভ্রম করিয়া আরো জোরে ছুটিলেন। কিছুদূর গিয়া সম্মুখে

দেখেন এক সন্ন্যাসী ঠাকুর। ভরসা পাইয়া সীতারাম আগাইয়া গিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী হাসিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা যাইবে? সীতারাম বলিলেন, "ঘরদুয়ার পোড়াইয়া গিয়াছে লস্করে", তাই ঘর মেরামতের জন্য আমি কাঠ লইতে আসিয়াছি।

সন্ন্যাসী বলিলেন, আমার সঙ্গে আইস। দুইচারি পা গিয়া সীতারামের সন্দেহ হইল। সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কহ প্রভু আমারে কোথাকে যাবে তুমি।" সন্ন্যাসী বলিলেন, আমি বিষ্ণুপুরে যাইব। আগে তোমার সঙ্গে আমার কিছু কাজ আছে। সীতারামের মনে ভয় হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোর স্থানে কিবা কার্য কহ মহাশয়।" সন্ন্যাসী তখন আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, আমি "নিরঞ্জন নৈরাকার" ধর্মঠাকুর। তুমি পূর্বজন্ম হইতে আমার ভক্ত, তাই তোমাকে বনে দেখা দিলাম। তুমি আমার গান রচনা কর, তাহা হইলে "তোর কীর্ত্তি রহিবে শিলের যেন চিন"।

ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্মের গান করা তখন নিন্দনীয় ছিল। তাই ধর্মঠাকুরের কথা সীতারামের ভালো লাগিল না। তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ধর্মঠাকুর বলিলেন, আমি কি করিব। তোর কপালে ধর্মের গান করা আছে। চল্ তোর সঙ্গে তোর ঘরেই যাই। ধর্মঠাকুরকে ঘরে লইয়া যাওয়া তো আরও সাঙ্ঘাতিক কথা। কবি বলিলেন—

> অতি মূর্খ হীন আমি ছাওয়াল তাহাতে
> গীতনাট কি জানি করিব কোনমতে।

ধর্মঠাকুর অভয় দিয়া বলিলেন—

> লিখিতে তোমার যখন না চলিবে পুঁথি
> হাথের কলম লয়্যা রেখ্য তুমি তথি।
> সেইকালে সরস্বতী বসিব বদনে
> লেখ্যা যেও পুঁথি তুমি যেবা আইসে মনে।

সীতারামের হাতে আশীর্বাদী কুড়চি ফুল দিয়া ধর্মঠাকুর পরম আশ্বাস দিলেন—

> আজি হৈতে যে পথে চলিয়া যাবে তুমি
> সেই পথে তোমার সহিত যাব আমি।

এই বলিয়া ধর্মঠাকুর অন্তর্হিত হইতেই ঝড়বৃষ্টি দূর হইল। সীতারাম ঘরের দিকে চলিলেন।

ঘরে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সীতারামের বাবা দক্ষিণদুয়ারি ঘরের পিঁড়ায় শুইয়া ছিলেন। ঘরে ঢুকিয়াই সীতারাম মায়ের কাছে ভাত চাহিয়া হাত-পা ধুইতে গেলেন। ভাত খাইতে খাইতে কম্প দিয়া জ্বর আসিল। মুখ ধুইয়া তিনি গায়ে কাপড় জড়াইলেন। জ্বর আসিলেও ঘরে থাকিতে তাঁহার মন গেল না। সীতারাম সরকার খুড়ার কাছে গেলেন। তিনি তখন তাঁহার বাড়ীর কাছে বসিয়া। সরকার কাঠের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সীতারাম বলিলেন, ভুলিয়া গিয়াছি।

রাত্রিতে সীতারাম চণ্ডীমণ্ডপে শুইলেন। জ্বরের ঘোরে রাতদুপুরে স্বপ্ন দেখিলেন যে গজলক্ষ্মী মাতা শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন, "উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা"। নিদ্রাভঙ্গ হইলে সীতারাম তখনি ধর্মের গান লিখিতে বসিয়া গেলেন। কাহিনী ভালো জানা নাই, তাহার উপর জ্বর। পয়ার মেলানো দুষ্কর। লেখা অগ্রসর হয় না। একদিকে ধর্মঠাকুরের ও গজলক্ষ্মীর আদেশ, অপর দিকে নিজের অক্ষমতা ও অশান্ত চিত্ত। সীতারাম ঘরে টিকিতে পারিলেন না। তিনি বলিতেছেন—

বাউল হয়্যা গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি নিরন্তর
মনে ইচ্ছা নাহি হয় যাই নিজ ঘর।
বৈষ্ণবের মত বুলি করি রামনাম

দিন কতকের জন্য তিনি মামার বাড়ী ইন্দাসে চলিয়া গেলেন। সে গ্রামের নারায়ণ পণ্ডিত সীতারামের পরিচয় পাইয়া যত্ন করিয়া তাঁহাকে নিজের ঘরে রাখিলেন। নারায়ণ পণ্ডিতের কাছে ধর্মমঙ্গল-গান রচনার পদ্ধতি পাইয়া তাহার ঠাকুরঘরে সীতারাম কাব্যরচনায় বসিয়া গেলেন।

স্থাপনা পালা লেখা হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে তাঁহার এক খুড়া ইন্দাসের কাছারিতে আসিয়া সন্ধান পাইলেন যে, সীতারাম নারায়ণ পণ্ডিতের বাড়ীতে আছেন। তিনি আসিয়া সীতারামকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বাড়িতে আসিয়া সীতারাম সবশুদ্ধ চল্লিশ দিনে ধর্মমঙ্গল-রচনা শেষ করিলেন।

সে ১০০৪ মল্লাব্দের (অর্থাৎ ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের) কথা,—"এই পুঁথি হইল হাজার চারি সালে।"

আত্মপরিচয়ের অন্তে সীতারাম বংশপরিচয় দিয়াছেন। জাতি কায়স্থ, পদবী দে। পিতা দেবীদাস, মাতা কেশবতী। ছোট ভাই শোভারাম (সভারাম)। মাতুলালয় ইন্দাস গ্রামে।

ধর্মমঙ্গল-রচনার দশ বৎসর পরে সীতারাম মনসামঙ্গল-কাব্য লিখিয়াছিলেন। সে কথা আগে বলিয়াছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতাব্দী

১. নবাবী আমল—ভূমিকা

আরংজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৬) বাঙ্গালার সুবেদারদের উপর দিল্লীর শাসন শিথিল হইয়া আসিল। দিল্লীতে কিস্তিমাফিক খাজনা পাঠাইয়া দিলেই সম্পর্ক একরকম চুকিয়া যাইত। কাগজে কলমে না হোক কাজে কর্মে বাঙ্গালার সুবেদার ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে স্বাধীন নবাব হইলেন। নবাবী শাসনে ব্যাঘাত আনিল বর্গির হাঙ্গামা (১৭৪০-৪৮)। উপরি উপরি কয়েক বছর মারাঠা অশ্বারোহী সেনার লুণ্ঠন-অভিযানে পশ্চিমবঙ্গে শান্তিভঙ্গ হইল এবং স্থানে স্থানে আর্থিক দুরবস্থা দেখা দিল। অচিরস্থায়ী এই দৌরাত্ম্যের ছায়াপাত ভদ্র সাহিত্যে পড়ে নাই বটে তবে লোক সাহিত্যে ভালো করিয়াই প্রতিফলিত হইয়াছিল।

ছেলে ঘুমুল পাড়া জুড়ুল বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

এই ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে সে দুর্দিনের অশ্রুরেখা কাজলের দাগ রাখিয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্যরচনার এক রকম অস্ফুট চেষ্টা দেখা দিয়াছিল। পূর্ব ও পূর্বদক্ষিণ বঙ্গে পোর্তুগীস মিশনারি পাদরিরা তাঁহাদের ধর্মের প্রচারের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের কিছু কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহারা বৈষ্ণব কড়চাগ্রন্থের মত প্রশ্নোত্তরময় ছোট ছোট পুস্তিকাও রচনা করিয়াছিলেন। এই কাজ রোমান ক্যাথলিক পোর্তুগীস পাদরিরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চালাইয়া যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে ইংরেজ প্রোটেষ্টাণ্ট পাদরিরা নূতন করিয়া সেই কাজের উদ্যোগ করিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর লেখা একখানিমাত্র খ্রীষ্টানী গদ্যগ্রন্থ এপর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। বইটির লেখক ছিলেন এক বাঙ্গালী খ্রীষ্টান মিশনারি, নাম দোম্

আন্তোনিও। ইনি ভূষণার জমিদারের ছেলে ছিলেন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে মগ জলদস্যুরা দেশ লুঠ করিতে আসিয়া ইহাকে বন্দী করিয়া আরাকানে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। (সেকালে পোর্তুগীস জলদস্যুদের একটা বড় ব্যবসা ছিল দাসদাসী চালান দেওয়া।) সেখানে এক পোর্তুগীস্ পাদরি ইঁহাকে কিনিয়া লন এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া স্বধর্মে দীক্ষিত করেন। দোম্ আন্তোনিওর বইটির নাম প্রকাণ্ড, সংক্ষেপে বলিতে গেলে 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ'। ইহাতে এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত আর এক ক্যাথলিক পাদরির মধ্যে সংলাপের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টানধর্মের উৎকর্ষ দেখাইবার প্রযত্ন আছে।

বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ পোর্তুগীস ভাষায় লেখা। লেখক মানোএল্ দা আস্সুম্প্ সাওঁ, পোর্তুগীস পাদরি। ব্যাকরণখানি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের রাজধানী লিসবনে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। আস্সুম্প্ সাওঁ ব্যাকরণের সঙ্গে বাঙ্গালা-পোর্তুগীস্ এবং পোর্তুগীস-বাঙ্গালা শব্দকোষ দিয়াছিলেন এবং ইনি একটি প্রশ্নোত্তরময় খ্রীষ্টানী গ্রন্থও বাঙ্গালায় রচনা অথবা অনুবাদ করিয়াছিলেন। বইটির নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' (Crepar Xaxter Orth, Bhed)। এটিও লিস্বনে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমান হরফে মুদ্রিত। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' নামের মানে হইতেছে—কৃপাময় ঈশ্বরের অভিপ্রেত খাঁটি (অর্থাৎ খ্রীষ্টান) ধর্মের তথ্য ও তত্ত্ব। বইটির শেষের কয়েকটি প্রস্তাব অযত্নপ্রসূত ছন্দে রচিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সাহিত্যের মূল ধারাগুলি মোটামুটি একইভাবে প্রবাহিত ছিল,—সেই বৈষ্ণব-পদাবলী, মহান্ত-জীবনী, কৃষ্ণমঙ্গল, রামায়ণ-মহাভারত, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং সংস্কৃত হইতে পুরাণ ও অন্য শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ। চণ্ডীমঙ্গল রচনায় অনুৎসাহ সপ্তদশ শতাব্দীতেই দেখা গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত পুরাণে গ্রথিত চণ্ডীর কাহিনী যেমন, ধূম্রলোচন ও শুম্ভনিশুম্ভ বধ ইত্যাদি অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা হইতে থাকে। শিবের কাহিনীও জনপ্রিয় হয়। ভাগীরথী-তীরবর্তী অঞ্চলে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর খুব আদর ছিল। সত্যনারায়ণের পাঁচালীর উদ্ভব এই সময়েই। পশ্চিমবঙ্গের ছোটবড় অনেক লেখক এই পাঁচালী লিখিয়াছিলেন। সত্যনারায়ণ-পাঁচালীতে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত বিরোধের একটা মীমাংসার

প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই সময়ে ধর্মসঙ্গীত এবং প্রণয়সঙ্গীত লোকপ্রিয় হইয়া উঠে। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিগান ও তর্জার লড়াইয়ের সৃষ্টি হয়, এবং শেষভাগে কোন কোন অঞ্চলে তাহা জাঁকিয়া উঠে।

এই সময়ে কয়েকজন ভালো মুসলমান কবি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শতাব্দীর প্রথমার্ধে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন উত্তরবঙ্গের হায়াৎ (বা হিয়াৎ) মামুদ। ইঁহার 'চিত্তউত্থান' কাব্য (১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) হিতোপদেশের ফারসী অনুবাদ অবলম্বনে লেখা। হায়াৎ মামুদের অন্যান্য রচনা হইতেছে— মহরমপর্ব (১১৩০ সাল), হিতজ্ঞানবাণী (১১৬০ সাল) এবং আম্বিয়াবাণী (১১৬৪ সাল)। 'মহরমপর্ব' এই নামে কারবালা-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের মিল দেখাইবার চেষ্টা আছে। শতাব্দীর শেষার্ধে উল্লেখযোগ্য গরীবুল্লা। ইনি পশ্চিম বঙ্গের লোক। ফারসী জঙ্গনামার অনুবাদ ইঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সংস্কৃত হিতোপদেশের একটি কাব্যানুবাদ করেন জগন্নাথ সেন। ধলভূমের রাজা গোপীনাথ ধবলের পুত্র অনন্ত ধবল ইঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

২. বৈষ্ণব সাহিত্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক কবি বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুই-চারিজন ছাড়া কাহারও রচনা উল্লেখযোগ্য নয়। এই উল্লেখযোগ্য পদকর্তাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর-শশিশেখর, দুইজন রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি (ওরফে ঘনশ্যাম) চক্রবর্তী, এবং দীনবন্ধু দাস বিশিষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পদাবলী-কীর্তন রীতিতে রাগতালের বিচিত্রতা ও মাধুর্য এতটা বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহাতে 'মঙ্গল'-পাঞ্চালীর পূর্বতন মর্যাদা অনেকটাই কমিয়া যায়। গায়কের ব্যাখ্যান — "আঁখর" ও "তুক্ক" — প্রক্ষিপ্ত হইয়া পদাবলী-গানে বেশ নূতনত্ব আনিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কোন কোন মুসলমান কবি পদাবলী লিখিয়াছিলেন। যেমন আফজল, আমান, মীর ফয়জুল্লা, শেখ কবীর, এবাদুল্লা, আলিমুদ্দীন, মোহম্মদ হামীর ইত্যাদি।

পদসংগ্রহ-গ্রন্থগুলি এই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত-সাধক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' এগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। বিশ্বনাথ ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। ইহার অল্প কিছুকাল পূর্বে গ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়। বিশ্বনাথ "হরিবল্লভ" ভনিতায় অনেকগুলি ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়'। এটি বেশ বড় সঙ্কলন। তবে সবটা পাওয়া যায় নাই। শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর, মহারাজা নন্দকুমারের গুরু, অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলন করিয়াছিলেন 'পদামৃতসমুদ্র'। রাধামোহন বইটিতে একটি সংস্কৃত টীকাও যোগ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে গৌরসুন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দ' ও দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্তনামৃত'। কিন্তু এ সকলেরই উপরে যায় "বৈষ্ণবদাস" নামে পরিচিত গোকুলানন্দ সেনের সঙ্কলন 'গীতকল্পতরু'। এ গ্রন্থটি এখন 'পদকল্পতরু' নামে প্রচলিত। ইহাতে প্রায় দেড়শত কবির লেখা তিন হাজারেরও বেশি পদ বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রে নির্দিষ্ট লীলাক্রম ও রসপর্যায় অনুসারে সাজানো আছে। গোকুলানন্দের গুরু ছিলেন দ্বিতীয় রাধামোহন ঠাকুর, "দ্বিজ" হরিদাসের বংশধর। ইনিও একজন ভালো পদকর্তা। কাটোয়ার উত্তরে টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামে গোকুলানন্দের নিবাস ছিল। পদসংগ্রহ-কার্যে স্বগ্রামনিবাসী বন্ধু "উদ্ধবদাস" নামে খ্যাত কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের সহায়তা ইনি পাইয়াছিলেন। "বৈষ্ণবদাস" ও "উদ্ধবদাস" ভনিতায় দুই বন্ধুর রচিত অনেকগুলি পদ পদকল্পতরুতে আছে।

যতগুলি কৃষ্ণমঙ্গল এই শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে কবিচন্দ্রের কাব্যের বিভিন্ন পালাগুলিই সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল মল্লভূমে পানুয়া গ্রামে। মনে হয় কাব্যটি তিনি বিষ্ণুপুরের দুর্জনসিংহের রাজ্যকালে (১৬৮২-১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ) রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার শিবায়ন (বা শিবমঙ্গল), রামায়ণ এবং মহাভারত যথাক্রমে বীরসিংহ (১৬৫৬-৮২ খ্রীষ্টাব্দ), রঘুনাথসিংহ (১৭০২-১২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং গোপালসিংহ (১৭১২-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ)—এই তিন মল্লরাজার রাজ্যকালে লেখা হইয়াছিল। কবিচন্দ্র-বিরচিত ধর্মমঙ্গল ও অভয়ামঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। তবে এগুলি সবই ছোট রচনা। গোপালসিংহের ভনিতায় পুরাণের ছাঁদে রচিত একটি কৃষ্ণমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। এটি রাজার কোন সভাসদের

রচনা হইবে। বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত পুরাণের ছাঁদে রচিত। এটির রচনাকাল ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ।

সংস্কৃতে লেখা বৈষ্ণবগ্রন্থের অনুবাদকারীদের মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য কৃষ্ণদাস প্রধান। ইনি নিজের গুরুর অনেকগুলি বই অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সময়ে জয়দেবের গীতগোবিন্দের অন্তত চারিখানি অনুবাদ হইয়াছিল। বর্ধমানের নিকটবর্তী চানক-গ্রামনিবাসী শচীনন্দন বিদ্যানিধি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা' নামে। ভাগবতের অনুবাদও অনেকে করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অনুবাদ করিয়াছিলেন অন্তত দুইজন লেখক। চারিজন লেখক পদ্মপুরাণের 'ক্রিয়াযোগসার' অংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। নন্দকিশোর দাসের 'বৃন্দাবনলীলামৃত' বরাহপুরাণের ভাবানুবাদ। ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মপুরাণের কাশীখণ্ড অংশের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। "দ্বিজ" সৃষ্টিধরের 'মহেশমঙ্গল'ও কাশীখণ্ডের অনুবাদ। বিষয় কাশীতীর্থের প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য।

জয়নারায়ণ 'করুণানিধানবিলাস' নামে অভিনব বৃহৎ কৃষ্ণলীলাময় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বইটির রচনা শুরু হয় ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে আর ছাপা হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। করুণানিধানবিলাসে বাঙ্গালা দেশে ও উত্তর ভারতের অন্যত্র প্রচলিত কৃষ্ণলীলাকাহিনীর ও উৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা ও গান ইত্যাদি আছে। সংস্কৃতেও এমনি একটি বৃহৎ কাব্য জয়নারায়ণ রচনা করাইয়াছিলেন। সেটির নাম 'জয়নারায়ণকল্পদ্রুম'।

পুরীর জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যখ্যাপক তিনখানি জগন্নাথমঙ্গল কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। রচয়িতা তিনজনের নাম বিশ্বম্ভর দাস, কবি-কুমুদ এবং "দ্বিজ" মধুকণ্ঠ। বিশ্বম্ভর দাসের কাব্যে কলিকাতার বাগবাজারের মদনমোহন ঠাকুরের উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে রচিত হয় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কয়েকখানি জীবনীকাব্য রচিত হইয়াছিল। গুরুদত্ত "প্রেমদাস" নামে পরিচিত পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয় অবলম্বনে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' লিখিয়াছিলেন। প্রেমদাস আর একখানি জীবনী-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন,

নাম 'বংশীশিক্ষা' (১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহাতে লেখকের গুরুর পূর্বপুরুষ, চৈতন্যের বাল্যসহচর বংশীবদন চট্টের এবং তাঁহার পুত্রপৌত্রের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ আছে। চৈতন্যের এবং ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব মহান্তদের সম্বন্ধেও কিছু নূতন কথা আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন প্রধান বৈষ্ণব লেখক ছিলেন নরহরি (ওরফে ঘনশ্যাম) চক্রবর্তী। ইঁহার পিতা জগন্নাথ এবং ইনি নিজে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। নিবাস মুর্শিদাবাদের কাছে সৈয়দাবাদ গ্রামে। নরহরি পণ্ডিত-ব্যক্তি ছিলেন। পদাবলী-রচনায় ইঁহার বেশ অধিকার ছিল। সে সব পদে ছন্দোনৈপুণ্যই প্রকটিত। নরহরি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি ছন্দের বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন 'ছন্দঃসমুদ্র' নামে। ইঁহার সঙ্কলিত পদসংগ্রহ গীতচন্দ্রোদয়ের কথা পূর্বে বলিয়াছি। নরহরি তিন-চারিখানি জীবনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পূর্বে যে অদ্বৈতবিলাসের কথা বলিয়াছি তাহাও ইঁহার লেখা হওয়া সম্ভব। নরহরির 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থটিকে বৈষ্ণব ইতিহাসের মহাকোষ বলা যাইতে পারে। অবিসংবাদিতভাবে এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রেমবিলাসের মত ইহাতেও প্রধানভাবে শ্রীনিবাস আচার্যের কীর্তি বর্ণিত। অন্যান্য অনেক বিষয়ও আছে। নরোত্তম, শ্যামানন্দ এবং বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদের বিষয়ে অনেক তথ্য ইহাতে পাওয়া যায়। 'নরোত্তমবিলাস' বইটিকে ভক্তিরত্নাকরের পরিশিষ্ট বলা যায়। নরহরি ইহাতে প্রধানভাবে নরোত্তমের জীবনী বিবৃত করিয়াছেন। নরহরির তৃতীয় গ্রন্থ 'শ্রীনিবাসচরিত্র' এখন লুপ্ত। নরোত্তমবিলাস ও শ্রীনিবাসচরিত্র বই দুইখানি ভক্তিরত্নাকরের মধ্যে একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এ দুইটি ভক্তিরত্নাকরের আগেই লেখা হইয়াছিল। নরহরি সংস্কৃতে একটি সঙ্গীতশাস্ত্রের বইও লিখিয়াছিলেন।

শ্যামানন্দের জীবনী-বিষয়ে দুইখানি ছোট বই পাওয়া গিয়াছে। দুইটিরই নাম 'শ্যামানন্দপ্রকাশ'।

বনমালী দাশের 'জয়দেবচরিত্র' জয়দেব ও তাঁহার পত্নী পদ্মাবতীর বিষয়ে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। বইটিতে কেন্দুবিল্ব গ্রামে বর্ধমানরাজ-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের উল্লেখ আছে। এই মন্দির নির্মিত হয় ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কত পরে তাহা বলিবার উপায় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নাভাজী হিন্দী ভাষায় একটি ছোট বই লিখেন 'ভক্তমাল' নামে। ইহাতে ভারতীয় ভক্ত বৈষ্ণবদের কথা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত। পরে প্রিয়াদাস একটি টীকা লিখিয়া নাভাজীর ভক্তমালকে পরিবর্ধিত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে লালদাস (নামান্তর কৃষ্ণদাস) অনেক নূতন উপাদান যোগ করিয়া বাঙ্গালায় বৃহৎ 'ভক্তমাল' রচনা করিলেন। ভারতীয় ভক্তজীবনী হিসাবে বইখানি সবিশেষ মূল্যবান্। লালদাসের বই ভক্ত বৈষ্ণবদের অবশ্যপাঠ্যের মত হইয়াছিল।

৩ রামায়ণ ও মহাভারত

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁহারা রামায়ণ-পাঞ্চালী লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কবিচন্দ্রের নাম আগে করিয়াছি। এই সময়ে আরও অনেকে রামচরিত লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন হইতেছেন রামানন্দ যতী। ইনি আখড়াধারী সাধু ছিলেন। ইঁহার 'রামতত্ত্ব রামায়ণ' ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে (১৬৮৪ শকাব্দে) লেখা হইয়াছিল। বইটিতে অনেক বিশেষত্ব আছে। রামানন্দ সাধু ছিলেন, তাই নিজেকে "যতী", "ভিক্ষু" বা "ক্ষেপা" বলিয়াছেন। ইনি যে সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন তাহার পরিচয় গ্রন্থের মধ্যে খুব আছে। রামায়ণ রচনার বার বছর (১৭৬৬ শকাব্দে) পরে রামানন্দ চণ্ডীমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। এ রচনাটিও বিশেষত্বপূর্ণ। রামানন্দের দুইটি কাব্যেই তাঁহার মনের উদারতার পরিচয় আছে। বৈষ্ণব ও শাক্ত দুই ধর্মে তাঁহার সমান আস্থা ছিল। বেদান্ত ও তন্ত্রের আলোচনাও তিনি উপেক্ষা করেন নাই।

বাঁকুড়া জেলায় দামোদর-তীরবাসী "বন্দ্য" (অর্থাৎ বন্দ্যোপাধায়) জগৎরাম ও রামপ্রসাদ পিতাপুত্রে মিলিয়া একখানি বৃহৎ রামায়ণ-কাব্য লিখিয়াছিলেন। রচনা সমাপ্ত হয় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে। পিতার আরব্ধ আরও দুইখানি গ্রন্থ রামপ্রসাদ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, একখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক—'কৃষ্ণলীলামৃতরস', অপরটি শক্তিবিষয়ক—'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'। শেষোক্ত কাব্যখানি সমাপ্ত হয় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন রামপ্রসাদের বয়স বাইশ বৎসর। জগৎরাম রামায়ণের লঙ্কা-কাণ্ড ছাড়া বাকি ছয় কাণ্ড লিখিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ বিস্তৃতভাবে লঙ্কা-

কাণ্ড রচনা করিয়া দিয়া গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন। জগৎরাম শেষ বয়সে (১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) 'আত্মবোধ' নামে একটি অধ্যাত্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে ইনি নিজের রামায়ণ-কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। জগৎরাম যে রামায়েত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধক ছিলেন তাহা আত্মবোধ হইতে বোঝা যায়। "দ্বিজ" সীতাসুতের রচিত রামায়ণের খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে মল্লরাজ গোপালসিংহের নাম আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অনেকে রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। অধিকাংশই রামায়ণ-গায়কের পুঁথির মত। রামায়ণের বিবিধ কাহিনীর মধ্যে অঙ্গদ-রায়বার জনপ্রিয় ছিল। অনেকে শুধু এই কাহিনীই লিখিয়াছিলেন। যেমন কৃষ্ণদাস, কৈলাস বসু, এবং শিবচন্দ্র সেন। বিষ্ণুপুর অঞ্চলের ফকীররাম কবিভূষণের অঙ্গদ-রায়বার খুব চলিয়াছিল।

এই সময়ে সম্পূর্ণ মহাভারত-কাব্যে লিখিয়াছিলেন এই কয় জন— কবিচন্দ্র চক্রবর্তী (ইঁহার রচনার পরিচয় আগে দিয়াছি), ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস, "জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ" বাসুদেব (-ইনি কোচবিহারের লোক ছিলেন-), ত্রিলোচন চক্রবর্তী এবং সদানন্দ নাথ। পিতা ষষ্ঠীবরের সহযোগিতায় গঙ্গাদাস একটি মনসামঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন।

এ ছাড়া কোন কোন লেখক শুধু একটি মাত্র পর্ব অথবা কোন পর্ব হইতে একটি মাত্র কাহিনী বাছিয়া লইয়াছিলেন। জৈমিনীয়-সংহিতার অন্তর্গত অশ্বমেধ-কাহিনীও কেহ কেহ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

৪. বিবিধ দেবীমাহাত্ম্য কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে সর্বসাধারণের মধ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গে অশিক্ষিতদের মধ্যে মনসামঙ্গল-কাহিনীর বেশি সমাদর ছিল। প্রথম দুই অঞ্চলের প্রায় সব লেখকই নিজেরা গানও করিতেন। তাই তাঁহাদের রচনা সমাগ্রিক নয়, এবং কোন একটি সমগ্র কাব্যের পুঁথিতে অনেক লেখকের ভনিতা দেখা যায়। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান দুই চারিজনের নাম উল্লেখ করিতেছি।

চট্টগ্রামের রামজীবন বিদ্যাভূষণ ব্রতকথাজাতীয় মনসামঙ্গল (১৭০৩

খ্রীষ্টাব্দে) ও সূর্যমঙ্গল (১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের "দ্বিজ" রসিকের মনসামঙ্গল বড় বই। এই অঞ্চলের "দ্বিজ" বাণেশ্বর রায় মনসামঙ্গল রচনা শুরু করেন ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে। "শাজাদা রায়"-বংশীয় কবিচন্দ্রের মনসামঙ্গলের অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার পুত্রের নাম রঘুবীর। ইনিও পশ্চিমবঙ্গের। উত্তরবঙ্গের জগৎজীবনকে অনুসরণ করিয়া জীবনকৃষ্ণ মৈত্র মনসার পাঞ্চালী রচনা করেন (১৭৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে)। ইঁহার কাব্যে কিছু নূতনত্ব আছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলেও দুইচারিখানি মনসামঙ্গল রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ষষ্ঠীবর দত্তের ও "দ্বিজ" জানকীরামের রচনা। শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার অপর রচনা 'রাজমালা' এবং 'ভারতীমঙ্গল'। ভারতীমঙ্গলে বিক্রমাদিত্য-কাহিনী দেবী মাহাত্ম্যমণ্ডিত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছোটবড় অনেক দেবীমাহাত্ম্য "মঙ্গল" কাব্য লেখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা রামানন্দ যতীর চণ্ডীমঙ্গলের উল্লেখ আগে করিয়াছি। রামানন্দের শিষ্য রামশঙ্কর দেব বিবিধ পৌরাণিক উপাখ্যান লইয়া "অভয়ামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। ভবানীশঙ্কর দাসের 'মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা' ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। বইটির রচনারীতি বিকট সংস্কৃতপূর্ণ। অনেকগুলি চণ্ডীমঙ্গল উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে রচিত। যেমন—"মোদক" কৃষ্ণজীবনের অভয়ামঙ্গল (বা অম্বিকামঙ্গল), মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল (১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) এবং জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডিকামঙ্গল। ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীর সহযোগিতায় জয়নারায়ণ সেন একটি সত্যনারায়ণ-পাঁচালী রচনা করেন, নাম 'হরিলীলা' (১৭৭২ খ্রীষ্টব্দে)। জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি একখানি যোগশাস্ত্রবিষয়ক বই রচনা করেন, নাম 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা'।

চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত 'দুর্গাসপ্তশতী' বা 'চণ্ডী' অবলম্বনে রচিত কাব্যের প্রচার এই সময়ে আরও বেশি ছিল। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে শিবদাস (বা শিবচরণ) সেনের গৌরীমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র (বা হরিচন্দ্র) বসুর চণ্ডীবিজয়, জগৎরাম ও রামপ্রসাদের দুর্গাভক্তিচিন্তামণি,

এবং হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গল উল্লেখযোগ্য। দীনদয়ালের দুর্গাভক্তি-চিন্তামণি এবং "দ্বিজ" রামনিধির দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী দেবীভাগবত-পুরাণ অবলম্বনে রচিত। "দ্বিজ" কালিদাসের কালিকাবিলাসে শিবদুর্গার গৃহস্থালী ও দুর্গাপূজার কাহিনী বিবৃত। বইটি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকিশোর রায়ের দুর্গালীলা-তরঙ্গিণীতে সৃষ্টিপত্তন শিবপার্বতী-উপাখ্যান শুম্ভনিশুম্ভবধ ব্রজলীলা ও ভূভারহণ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। "দ্বিজ" গঙ্গানারায়ণের ভবানীমঙ্গল কাব্যে উমার জন্ম হইতে দুর্গাপূজা অবধি বৃত্তান্ত আছে, ব্রজলীলাও আছে। গঙ্গাধর দাসের কিরীটিমঙ্গলে (১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) উত্তররাঢ়ে কিরীটকোনা গ্রামের দেবী কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্য পৌরাণিক-কাহিনী বিজড়িত হইয়া উপস্থাপিত।

এই শতাব্দীতে পাঁচ-ছয়জন লেখক গঙ্গামাহাত্ম্য কাব্য ("গঙ্গামঙ্গল") লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে উলা-নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই উল্লেখযোগ্য। ইঁহার কাব্যের নাম 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'। কাব্যটি পাঞ্চালী রূপে গীত হইয়া গঙ্গাবিধৌত অঞ্চলে বহুপ্রচারিত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝ পর্যন্ত কলিকাতায় গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী-গানের জনপ্রিয়তার প্রমাণ যথেষ্ট মিলিয়াছে।

সরস্বতীর মাহাত্ম্য কোন বড় রচনায় স্থান পায় নাই। তিনচারিজন লেখকের নিতান্ত ছোট ছোট রচনা 'সারদাচরিত' অথবা 'সরস্বতী-মঙ্গল' নামে মিলিয়াছে।

কিন্তু এ সময়ে যে সব লক্ষ্মীর ব্রতকথা লেখা হইয়াছিল সে সবগুলিই খুব ছোট রচনা নয়। শিবানন্দ সেনের কমলামঙ্গল উল্লেখযেগ্য। শিবানন্দ ভনিতার মধ্যে নিজেকে "গুণরাজ খান" বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি অপেক্ষাকৃত বড় 'ষষ্ঠীমঙ্গল' অর্থাৎ-ষষ্ঠীর ব্রতকথা লেখা হইয়াছিল। ইনি রুদ্ররাম চক্রবর্তী, উপাধি "বিদ্যাভূষণ"। ইহাতে তিনটি আখ্যান আছে। প্রথম আখ্যানে ষষ্ঠীর জন্ম কার্তিকের জন্ম তারকাসুরবধ ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী। দ্বিতীয় আখ্যানে ষষ্ঠীর কৃপায় কোলাঞ্চ দেশের রাজ্যভ্রষ্ট রাজার পুত্রলাভ ও সেইপুত্র কর্ত্তৃক পিতৃরাজ্য উদ্ধার বৃত্তান্ত। তৃতীয় আখ্যানে কলাবতীর উপাখ্যান।

কয়েকখানি শীতলামঙ্গলও এই সময়ে লেখা হইয়াছিল। এগুলি অত্যন্ত

অকিঞ্চিৎকর রচনা। আকারে নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর বইটি বৃহৎ বলা চলে। ইনি তমলুক অঞ্চলে কাশীজোড়ার রাজসভার আশ্রিত ছিলেন। গ্রন্থরচনাকাল আনুমানিক ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

'কালিকামঙ্গল' নামে খ্যাত বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানগুলিতে দেবীমাহাত্ম্যের ইঙ্গিত থাকিলেও এগুলি ভক্তিকাব্যের পর্যায়ে পড়ে না। সেইজন্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইতেছে।

৫. ধর্মায়ণ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে দামোদর উপত্যকায় জনগণের মধ্যে ধর্মঠাকুর জাগ্রত দেবতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ধর্মের বাৎসরিক গাজন অনেক গ্রামেরই প্রধান উৎসব ছিল। ধর্মের গাজনে ধর্মমঙ্গল গান অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অঙ্গ। এই সময়ে অনেক শক্তিশালী লেখক ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রায় সকলেরই নিবাস দামোদরের দক্ষিণ ও পশ্চিম এবং দ্বারকেশ্বরের উত্তর এবং পূর্ব এই সীমানার মধ্যে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে সর্বপ্রথম মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করায় ঘনরাম চক্রবর্তীর রচনা সর্বাধিক পরিচিত হইয়াছে। ঘনরাম চক্রবর্তীর উপাধি "কবিরত্ন"। (এ উপাধি আরও দুই তিন জন ধর্মমঙ্গলরচয়িতার ছিল।) নিবাস বর্ধমানের তিন ক্রোশ দক্ষিণে, দামোদরের অপর পারে কৃষ্ণপুর গ্রামে। পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার নাম মহাদেবী। গুরু শ্রীরাম ভট্টাচার্য। ঘনরাম বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের বৃত্তিভোগী ছিলেন। কাব্যের ভনিতায় এ কথা তিনি একাধিকবার বলিয়া গিয়াছেন। ১৬৩৩ শকাব্দের (অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের) ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে ঘনরাম তাঁহার কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন।

ঘনরামের কাব্যের ভনিতায় তাঁহার বাপমায়ের ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বর-ভক্তি মুখরিত।

> মাতা যার মহাদেবী[১] সতী সাধ্বী সীতা
> শান্ত দান্ত কবি কান্ত গৌরীকান্ত[২] পিতা।
> প্রভু যার কৌশল্যানন্দন গুণবান্[৩]
> ঘনরাম কবিরত্ন মধুরস গান।।

---

১ ঘনরামের মায়ের নাম। ২ বাপের নাম। ৩ এই ছত্রের দই অর্থ—(১) যিনি রামচন্দ্রের উপাসক, (২) যাঁহার গুরুর নাম রাম (রামদাস, রামচন্দ্র অথবা রামনারায়ণ)।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল বৃহৎ কাব্য। রচনা সরল ও সুগম, এবং তখনকার কাব্যরীতি অনুসারে অনুপ্রাসবহুল।

দক্ষিণরাঢ়ের পূর্বতন প্রধান কবিদের অনুসরণে ঘনরাম তাঁহার কাব্যে গ্রন্থোৎপত্তি-কাহিনী দিয়াছিলেন। মুদ্রিত গ্রন্থে পরিত্যক্ত হওয়ায় এবং সম্পূর্ণ পুঁথি না পাওয়ায় এই অংশ এখন লুপ্ত। ঘনরামের ধর্ম্মঙ্গলের গায়ন স্বর্গত অমূল্যচরণ পণ্ডিতের কাছে ঘনরামের লুপ্ত আত্মকাহিনীর সারকথা পাইয়াছিলাম। তাহা বলিতেছি।

ঘনরাম পড়িতেন রামবাটী গ্রামের শ্রীরাম ভট্টাচার্যের চৌপাড়িতে। ভট্টাচার্য মহাশয়ের ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রের নিত্যপূজার ফুল তুলিবার ভার টোলের পড়ুয়াদের উপর পালা করিয়া ছিল। একদিন ঘনরামের পালা। তিনি বেগুন-বাড়িতে ফুল তুলিতে গিয়াছেন। ফুল তুলিতে তুলিতে তাঁহার পায়ে বেগুন পাতার কাঁটা বিঁধিয়া গেল। কাঁটা তুলিতে হইলে পায়ে হাত দিতে হয়, আর সে হাত না ধুইয়া পূজার ফুল ছোঁয়া চলে না। পায়ে কাঁটা বিঁধিয়া রহিল, ঘনরাম ফুল তোলা শেষ করিয়া ঠাকুরঘরে সাজি রাখিয়া আসিলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া পায়ের কাঁটা দূর করিলেন। ভট্টাচার্য মহাশয় পূজা করিতে আসিয়া দেখেন, দেবমূর্তির পদতলে কাঁটাশুদ্ধ বেগুনপাতা লাগিয়া রহিয়াছে। তখন তিনি পড়ুয়াদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সেদিনে ঘনরামের ফুলতুলিবার পালা ছিল। গুরু ঘনরামকে ডাকিয়া বলিলেন, আজ পূজার ফুল কোথায় তুলিয়াছিলে? ঘনরাম উত্তর করিল, বেগুনবাড়ীতে তুলিয়াছি। ইহা শুনিয়া ইষ্টদেবতার উপরে ব্রাহ্মণের অভিমান হইল। তিনি ভাবিলেন, আমি পণ্ডিত মানুষ এতদিন ধরিয়া ভক্তিভরে পূজা করিলাম কিন্তু ঠাকুর আমার উপর দয়া করিলেন না, আর সেদিনের ছেলে পড়ুয়া ঘনরাম—তাহার উপরে এতটা মায়া যে তাহার পায়ে কাঁটা ফুটিলে দেবতার পায়ে কাঁটা ফুটে! আর আমি দেবপূজা করিব না। এই সংকল্প করিয়া ভট্টাচার্য ঘর ছাড়িয়া দক্ষিণমুখে পুরীর রাস্তা ধরিলেন। যাইবার সময়ে দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া গেলেন, ঠাকুর তুমি ঘনরামকে লইয়াই থাক। আমি আর তোমার পূজা করিব না।

একে বয়সে বৃদ্ধ তায় প্রচণ্ড রৌদ্র। ক্লান্ত হইয়া ভট্টাচার্য পথের ধারে এক গাছের তলায় শুইলেন এবং পথশ্রমে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ

পরে বেদের মত দেখিতে দুইটি ছেলেমেয়ে ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, পুরী যাইব কোন দিকে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই পথেই পুরী যায় শুনিয়াছি। আমিও পুরী যাইব। তোমরা আগাইয়া চল, আমি পিছু পিছু যাইতেছি। এই বলিয়া ভট্টাচার্য আবার শুইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ যায়, আবার একটি বেদে ছেলে আসিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাহ্মণ, আমার দাদা-বৌদিদিকে এ পথে যাইতে দেখিয়াছ কি? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, বোধ হয় তাহারাই একটু আগে এই পথে গেল। শুনিয়া ছেলেটি সেই পথে ছুটিল। ব্রাহ্মণ আবার ঝিমাইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে আবার ঘুমের ব্যাঘাত হইল। হঠাৎ গাছের ডাল হইতে এক হনুমান ঝুপ্ করিয়া ব্রাহ্মণের কাছে লাফাইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলে হনুমান মানুষের ভাষায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাহ্মণ, তুমি কোথায় যাইবে? ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দেখিতে পুরী যাইব। এই কথা শুনিয়া হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া ভট্টাচার্যের গালে এক চড় লাগাইয়া বলিল, চোখের উপর দিয়া রাম-সীতা গেলেন, লক্ষ্মণ গেলেন, চিনিতে পারিলে না! এখন পুরী গিয়া কি করিবে? যাও, ঘরে গিয়া আগেকার মত রামচন্দ্রের পূজা কর। অনুতপ্ত ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু ঠাকুরপূজার ভার আর নিজে লইতে সাহস করিলেন না। সে ভার ঘনরামের উপর দিলেন।

কিছুদিন যায়। একদিন ঘনরামকে ডাকিয়া বিশেষ কোন কথা না বলিয়া ভট্টাচার্য তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে বলিলেন। গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া ঘনরাম কাগজপত্র সাজাইয়া রামকথা লিখিতে প্রস্তুত হইলেন এবং ঠাকুরপূজা করিয়া পুঁথিতে রামচন্দ্রের ধ্যান ও বন্দনা-মন্ত্র লিখিয়া আরম্ভ করিয়া রাখিলেন। পরদিন পূজাশেষে লিখিতে গিয়া দেখেন যে, পুঁথিতে রামচন্দ্রের ধ্যান ও বন্দনা-মন্ত্র যাহা পূর্বদিন লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নাই, তাহার বদলে আছে ধর্মঠাকুরের ধ্যান ও বন্দনা। ঘনরাম বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, এ কি হইল! কিছু বুঝিতে না পারিয়া ঘনরাম পুঁথির পাতাটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার রামচন্দ্রের ধ্যান ও বন্দনা লিখিয়া সেদিনের মত রাখিয়া দিলেন। নিশীথে স্বপ্ন দেখিলেন যেন রামচন্দ্র তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিয়া বলিতেছেন, তোমার আর রামায়ণ লিখিতে হইবে না। উহা অনেক কবি অনেকভাবে লিখিয়াছে। তুমি ধর্মমঙ্গল রচনা কর। ঠাকুরের এই স্বপ্নাদেশ

পাইয়া ঘনরাম রামায়ণের বদলে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিলেন।

ঘনরাম রামের উপাসক ছিলেন। বোধ হয় তিনি রামায়ণ গানও করিতেন। ধর্ম্মমঙ্গল গান করিতেন বলিয়া কোন উল্লেখ নাই।

ঘনরামের দেশের আর এক ব্যক্তি তাঁহার অব্যবহিত পরেই ধর্ম্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। ইনি শাঁখারি গ্রামের নরসিংহ বসু। ইনি ১৬৩৬ শকাব্দের (১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের) শ্রাবণ মাসে কাব্য রচনা শুরু করিয়াছিলেন। নরসিংহ তাঁহার কাব্যের মধ্যে নিজের কথা যেটুকু বলিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

নরসিংহের পিতার নাম ঘনশ্যাম, মাতার নাম নবমল্লিকা। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে পর পিতামহী তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারই উৎসাহে নরসিংহ বাঙ্গালা ফারসী উড়িয়া ও হিন্দী (নাগরী) এই চারি ভাষায় লেখাপড়ার কাজ চালাইবার মত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লেখাপড়া শিখিয়া তিনি নানাস্থানে কাজকর্মের জন্য ঘুরিয়া শেষে মুর্শিদাবাদে নবাবদরবারে বীরভূমে রাজনগরের জমিদার আসফুল্লা খানের তরফে উকীল নিযুক্ত হইলেন। একবার বাৎসরিক খাজানার টাকা নবাব-দরবারে ঠিক সময়ে জমা না পড়ায় নরসিংহ মুশ্‌কিলে পড়েন। অনেক বলা-কহায় নবাব জাফর খাঁ (অর্থাৎ মুর্শিদকুলি খাঁ) নরসিংহকে অল্প কিছুদিন সময় দিলেন, সেই সময়ের মধ্যে খাজনা দিতেই হইবে। ব্যস্ত হইয়া নরসিংহ বীরভূমে মনিবের হুজুরে ছুটিলেন। সেখানে গিয়া টাকার যোগাড় করিলেন। আসফুল্লা তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠায় খুশি হইয়া জামাজোড়া বখশিশ দিলেন। টাকা জমা দিবার শেষ তারিখ আসিতে কিছু দেরি আছে দেখিয়া নরসিংহ ভাবিলেন, এত কাছে আসিয়াছি, একবার বাড়ী ঘুরিয়া যাই না কেন। বাড়ী যাইবার পথে মাঝখানে ঝড়বৃষ্টি নামিল। বেহারারা পালকি হাঁকাইতে পারিল না। যেখানে তিনি আটক পড়িলেন সে আউসগ্রাম, তাঁহার পিসতুতো ভাইয়ের জমিদারি। ভাই তখন সেখানেই ছিলেন। সুতরাং সেখানে রাত কাটাইতে অসুবিধা হইল না। সকালবেলা নূতন বেহারা বেগার ধরিয়া পালকি হাঁকানো হইল। দামোদরের তীরে জুঝাটি গ্রাম পৌঁছানো গেল। সেখানেও খুব জলকাদা। জুঝাটি গ্রামের ধর্মঠাকুর খুব জাগ্রত ছিলেন। খেজুরগাছের তলায় তাঁহার অধিষ্ঠান। সেখানে

পালকি রাখিয়া ঠাকুরতলায় প্রণাম করিতে গিয়া তিনি এক অপূর্ব সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "গাও কিছু গীত"। তাঁহার দর্শনে-বচনে বিমুগ্ধ হইয়া নরসিংহ হাত জোড় করিয়া দণ্ডবৎ করিলেন। কিন্তু মাথা তুলিয়াই দেখেন সন্ন্যাসী নাই। মনে পাঁচসাত ভাবিতে ভাবিতে নরসিংহ বাড়ী পৌঁছিলেন এবং দিন দুইতিন ঘরে কাটাইয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিলেন। যথাসময়ে খাজনার টাকা দাখিল হইল।

দিনের পর দিন যায় নরসিংহের মনে সন্ন্যাসীর কথা জাগিয়া থাকে। শেষে একদিন বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ চাহিলেন। সকলেই বলিল, ধর্মের গান লেখ। তখন তিনি ধর্মমঙ্গল রচনায় হাত দিলেন। তাঁহার লেখা ধর্মমঙ্গল কে গাহিবেন, তাহাও ঠিক ছিল। তাঁহার নাম শূলপাণি। নরসিংহ শূলপাণির জন্যও ধর্মের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে দুইখানি বিশিষ্ট রচনা। একটির রচয়িতা মানিকরাম গাঙ্গুলী, অপরটির রামকান্ত রায়।

বর্ধমান হুগলী ও বাঁকুড়া এই তিন জেলা যেখানে মিলিয়াছে সেইখানে বেলডিহা গ্রামে (—এখন হুগলী জেলার মধ্যে বেল্‌টে—) মানিকরামের নিবাস ছিল। মানিকরাম যে আত্মকাহিনী দিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক মূল্য নাই, তবে তাহাতে গল্পরস আছে। সংক্ষেপে বলিতেছি।

নানা স্থানে কিছুকাল থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়া শেষে মানিকরাম ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে ভুড়াড়ি গ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানে পড়াশুনা আরম্ভ করিতে করিতে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে, এবং তিনি শোকাবেগে অধীর। হঠাৎ যেন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিতেছেন। অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে। সংসারে কে কবে মাবাপকে লইয়া চিরদিন ঘর করিয়াছে। তুমি ধর্মঠাকুরের শরণ নাও এবং ভালো অধ্যাপকের কাছে পড়াশোনা কর। ব্রাহ্মণঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। মানিকরামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখনও রাত আছে, কিন্তু ঘুম আর আসিল না। "প্রভাত হইল রাত্রি পরম যতনে।" ভুড়াড়ির ভট্টাচার্যের কাছে বিদায় লইয়া মানিকরাম

পুঁথিপত্র লইয়া তখনি মাকে দেখিতে ঘরের দিকে চলিলেন। যখন বেতানলে পৌঁছিলেন তখন বেলা ছয় দণ্ড (অর্থাৎ সকাল সাড়ে আটটার মত)। নদী পার হইয়া মানিকরাম দিক্ হারাইলেন। অবশেষে সূর্য অভিমুখ করিয়া চলিতে লাগিলেন। যখন তিনি খাঁটুল গ্রামে ঢুকিলেন তখন অত্যন্ত ক্লান্ত। কিন্তু দৈববিড়ম্বনা এখনও চুকে নাই। দেশড়ার মাঠে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখা দিলেন। অপূর্ব তাঁহার মূর্তি। তাঁহার হাতে আসা-বাড়ি। গাছের তলায় পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তরুতলে অবস্থিত নির্বাক্ নিস্পন্দ ব্রাহ্মণমূর্তি যেন ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাইতে লাগিল। দূর হইতে যাহাকে বুড়া মনে হইতেছিল কাছে আসিয়া দেখা গেল, সে যুবা। তাঁহার সহিত দুইচারি কথা হইতেই মানিকরাম বুঝিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মণঠাকুর মহাপণ্ডিত। দুইজনের মধ্যে "আভাষে কিঞ্চিৎ হৈল শাস্ত্র আলাপন"। ব্রাহ্মণ নিজের পরিচয় দিলেন, "রাজ্যধর বিদ্যাপতি, রঞ্জপুরে ধাম।" আর বলিলেন, তুমি আমার কাছে পড়িতে আসিও। তাহার পর হাসিয়া তিনি মানিকরামকে বিদায় দিলেন। মানিকরাম পিছু ফিরিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ গাছের তলায় বসিয়া পড়িয়াছেন। আর একটু দূরে গিয়া পিছনে তাকাইতে দেখা গেল, ব্রাহ্মণ সেখানে নাই। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মানিকরাম গাছতলায় ফিরিয়া আসিলেন। অমনি এক ধর্মঠাকুরের পূজারী "পণ্ডিত" সেখানে আসিয়া হাজির হইল। তাঁহার গলায় ধর্মের খড়ম ঝুলিতেছে। বিশ্রাম লইতে তিনি গাছের তলায় বসিলেন। ধর্মপণ্ডিত মানিকরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এই দিক দিয়া রাজ্যধর বিদ্যাপতিকে যাইতে দেখিয়াছ? সোজা জবাব না দিয়া মানিকরাম বলিলেন, তাঁহার খোঁজ করিতেছ কেন? পণ্ডিত ধর্মের পাদুকা দুইটি দেখাইয়া বলিলেন, দ্বিজবরকে তুমি চিনিতে পার নাই। তাঁহার আসল পরিচয় তুমি পরে পাইবে। উপস্থিত তাঁহার চরণকমলের পাদুকা পূজা কর। এ কথায় চকিত হইয়া মানিকরাম চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন কাছেই এক জল-ঢলঢল পদ্মদীঘি। দীঘিতে স্নান করিয়া মানিকরাম কতকগুলি ফুল তুলিয়া আনিলেন, ধর্মের পাদুকা পূজা করিবেন বলিয়া। কিন্তু গাছের তলায় আসিয়া দেখেন, কোথায় বা পণ্ডিত, কোথায় বা ধর্মের পাদুকা! পিছন ফিরিয়া দেখেন, দীঘিও নাই। ভয় পাইয়া মানিকরাম গাছের তলায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ধ্যান করিয়া "ধর্মায় নমঃ"

বলিয়া পদ্মফুলগুলি ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর ঘরের মুখে চলিলেন। যখন বাড়ী পৌঁছিলেন তখন বেলা অবসানপ্রায়।

বাড়ীতে দিন দুই কাটাইয়া মানিকরাম রাজ্যধর বিদ্যাপতির কাছে পড়িবার জন্য রঞ্জপুরের অভিমুখে চলিলেন। হাজিপুর পার হইয়া মানিকরাম দ্রুতগমনে তারাজুলির তীরে গিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে জনহীন পথে আবার সেই ব্রাহ্মণমূর্তিকে দেখা গেল। এবার মূর্তি সৌম্য নয়, রুদ্র। এখন তাঁহার হাতে মোটা লাঠি। সাক্ষাৎ শমনের মত দস্যুমূর্তি দ্বিজ মানিকরামের কাছে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, আজ তোমাকে মারিয়া আমার লাঠির সুখ করিব। আত্মরক্ষার জন্য মানিকরাম অনুনয় করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কিছুতেই শান্ত হন না দেখিয়া মানিকরাম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিয়া তোমার কাছে পড়িতে যাইতেছি, আর তোমার এই রাহাজানি কাজ! এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ প্রসন্নভাব অবলম্বন করিয়া বলিলেন, আমি এখন হাজিপুরে যাইতেছি, সেখানে কিছু কাজ আছে। তুমি আমার বাড়ীতে যাও, আমি শীঘ্রই ফিরিব। বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণমূর্তি হাওয়ায় মিলাইয়া গেল। তাহা দেখিয়া মানিকরামের আতঙ্ক বাড়িল। তিনি রঞ্জপুরের দিকে দৌড় দিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া ঘরে ঘরে জনে জনে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, রাজ্যধর বিদ্যাপতি বলিয়া রঞ্জপুরে কেহ নাই, কদাপি ছিল না। মনে নিদারুণ আঘাত পাইয়া মানিকরাম ঘরে ফিরিলেন এবং জ্বরে পড়িলেন।

মনের উদ্বেগে আর রোগের যন্ত্রণায় মানিকরাম ছটফট করিতেছেন এমন সময় মনে হইল যেন সেই ব্রাহ্মণমূর্তি শিয়রে বসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, তোমার কিসের চিন্তা কিসের ব্যামো? আমার কথা শোন, উঠিয়া ব'স। আমার গান লেখ, তোমার খুব যশ হইবে। গানের বিষয়ের জন্য ভাবনা নাই, আমি তোমাকে "নকল দেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া"। মানিকরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, দেশড়ায় মাঠে যাহার পূজা করিয়াছিলে, আমি সেই, বাঁকুড়া রায় ধর্মঠাকুর। যাই হোক তুমি একথা প্রকাশ করিও না। তোমাকে আমি সর্বদা সঙ্কট হইতে রক্ষা করিব, এবং "অন্ত্যকালে দিব দুটি অভয় চরণ।" নিজ মাহাত্ম্য "কবিতা" রচনা করিতে মানিকরামকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া ধর্মঠাকুর নিজের বীজমন্ত্র লিখিয়া দিলেন আর বলিলেন যে, তাহা দেখিয়া কলম ধরিলে অনর্গল

কবিতা বাহির হইবে। তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতা কাব্যের গায়ক হইবে এবং তাহাতে কবির "জগৎ ভরিয়া যশ হবেক বিস্তর"। ধর্মের গান গাহিবার কথায় মানিকরাম সন্ত্রস্ত হইলেন। কেন না তখনকার দিনে ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্মপূজা করা ও ধর্মের গান গাওয়া অনুচিত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত। মানিকরাম ভয়ে ভয়ে বলিলেন,"জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান।" ঠাকুর উত্তর করিলেন,"আমি তোর জাতি, তোমার অখ্যাতি হইলে আমার অখ্যাতি।" আমি সহায় থাকিতে তোমার কোন ভয় নাই। তোমার মত ময়ূরভট্টকেও আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম। এখন আমি

বৈকুণ্ঠে রেখেছি তারে বিষ্ণুভক্তি দিয়া
অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া।

এই বলিয়া ধর্মঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর মানিকরাম ধর্মমঙ্গল রচনা করিলেন।

মানিকরামের কাব্যের পুঁথিতে যে রচনাকাল দেওয়া আছে তাহা বিষম হেঁয়ালি। তাহা হইতে অনেক রকম তারিখ বাহির হইতে পারে। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গণনায় পাওয়া যায় ১৭০৩ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ)। এই তারিখই যে মোটামুটি ঠিক তাহা রচনারীতি হইতে এবং বিষ্ণুপুরে মদনমোহন ঠাকুরের উল্লেখ হইতে সমর্থিত হয়।

রামকান্ত রায়ও নরসিংহ বসুর মত কায়স্থ। ইঁহার নিবাস সেহারা গ্রাম নরসিংহ বসুর ও ঘনরাম চক্রবর্তীর বাসগ্রামের কাছাকাছি, দামোদরের দক্ষিণ পাড়ে। রামকান্ত ১১৯৭ সালে (১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে) ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। সেহারা গ্রামের মধ্যে এক বাবলা গাছের তলায় গ্রামের ধর্মঠাকুর বুড়ারায়ের অধিষ্ঠান ছিল। রামকান্ত বলিয়াছেন, ইঁহারই প্রত্যাদেশে তিনি ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

ধর্মঠাকুরের প্রত্যাদেশপ্রাপ্তি উপলক্ষ্য করিয়া রামকান্ত যেটুকু আত্মবিবরণ দিয়াছেন তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর উপান্তে দক্ষিণরাঢ়ের গৃহস্থ চাষী ঘরের ছেলের মনের কথা শুনিতে পাই। এই কারণে বর্ণনাটির সাহিত্যমূল্য উপেক্ষণীয় নয়। বেকার অবস্থায় গৃহবাসী যুবক কবি নিজের মনের যে অকারণ দ্বিধাভাবের ও বিক্ষোভের পরিচয় এবং বিশ্লেষণ দিয়াছেন তাহাতে দেখি যে, অষ্টাদশ

শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিক দৃষ্টির আভাস পূর্বফলিত হইতে শুরু হইয়াছে।

রামকান্ত বলিতেছেন, একদা তিনি মাস ছয় বেকার হইয়া ঘরে বসিয়া ছিলেন। চাষবাসের কার্যে তাঁহার মন কিছুতেই লাগে না। অকর্মা অবস্থায় পড়িয়া দিন দিন তাঁহার মন উচাটন হইতে থাকে। ঘরে মন টেকে না, প্রতিবেশীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ান। গ্রামে থাকিতেও মন বসে না, দক্ষিণমুখে সোজা পুরী চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কেন যে এই অস্থিরতা তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন না। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ বেশিক্ষণ ভাল লাগে না, এবং লোকের কথাও কানে বিষ লাগে। রাত্রিতে ঘুম নাই। কথায় কথায় রাগ হয়।

তখন ভাদ্র মাস, চাষের সময়। বাপ বলিলেন, বেলা হইয়াছে। তেল মাখিয়া স্নান করিতে যাও। আর অমনি মাঠে কৃষাণদের জলপান দিয়া আইস। শুনিয়া রামকান্তের রাগ হইল। কোন কথা না বলিয়া এবং তেল না মাখিয়া কৃষাণদের জলপান লইয়া তিনি মাঠে চলিলেন। তবে বাড়ীর বাহির হইতে না হইতেই কতকগুলি শুভলক্ষণ দেখিয়া মন কতকটা হালকা হইল। শুভলক্ষণ এই :

নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িল মাথায়
সেজ বনি[1] পূর্ণ কুম্ভ বামে লয়্যা যায়।

একটু আগাইয়া গিয়া বুড়ারায়ের স্থান বাবলাতলায় পৌঁছিয়া রামকান্ত দেখিলেন যে, বাবলা গাছের উপর শঙ্খচিল বসিয়া ডাকিতেছে। প্রসন্নতর চিত্তে ধর্মঠাকুরকে প্রণাম করিয়া রামকান্ত মাঠের দিকে চলিলেন। কৃষাণেরা তখন উত্তর মাঠে খাটিতেছিল। তাহাদের জলপান দিয়া রামকান্তের মনে হইল, কেমন ধান হইল সব দেখি। উত্তর মাঠের ধান দেখিয়া তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ মাঠের ধান দেখিতে গেলেন। সব জমি দেখা হইয়াছে মনে করিয়া তিনি ঘরে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মনে হইল পূব মাঠের চারি বিঘা জমি তো দেখা হয় নাই। কিন্তু বেলা ঢের হইয়াছে,

---

১ ভগিনী

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে। সুতরাং রামকান্ত ভাবিলেন, এখন পূব মাঠ থাক্, বাড়ী যাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, না, দেখিয়াই আসি। পূব মাঠের দিকে চলিলেন বটে কিন্তু প্রচণ্ড রোদের জন্য পা যেন সরিতে চায় না। খানিকটা গিয়া রামকান্ত এক পুকুরের পাড়ে অশথ গাছের তলায় গিয়া পূর্বমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর পুকুরে নামিয়া জল খাইয়া আবার চলিলেন। কি জানি কেন, পুকুর পার হইতেই তাঁহার গা ছমছম করিতে লাগিল। তবুও তিনি পা চালাইয়া ক্ষেতে গিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিলেন। তাহার পর বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন, এমন সময় চোখে যেন ঘোর নামিল। রামকান্ত বলিতেছেন, দিনে অন্ধকার দেখিয়া যেন মুহূর্তের জন্য সংজ্ঞাহারা হইয়া গেলেন। একটু পরে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেলে দেখিলেন সামনে এক অপূর্ব ব্রাহ্মণমূর্তি দাঁড়াইয়া। তাঁহার কপালে অর্ধচন্দ্র, কানে জবাফুল, মাথায় সাপের মত লম্বমান জটা, পরিধানে কুসুমফুলের রঙ কাপড়। এমন অদ্ভুত মূর্তি দেখিয়া রামকান্তের আতঙ্ক হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া অভয় দিয়া বলিলেন, তোমাকে আজ সকাল হইতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু একলা পাই নাই বলিয়া দেখা দিই নাই। তোমাকে দিয়া আমি "বারোমতি' পুঁথি লেখাইব।

রামকান্ত ভয়ে ভয়ে শুধাইলেন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার বাস সর্বস্থানে, আপাতত সেহারায় আছি। রামকান্ত ভয়ে ভক্তিতে চুপ করিয়া রহিলেন। "বারোমতি' লিখিতে রামকান্তকে তিনি সত্য করাইয়া ব্রাহ্মণঠাকুর অন্তর্হিত হইলে রামকান্ত কোনরকমে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময়ে বাবলাতলায় প্রণাম করিতে ভুলিলেন না। ঘরে আসিয়াও আচ্ছন্নভাব কাটিল না। ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ নাই। উত্তর-দুয়ারি ঘরটিতে শুইয়া রহিলেন। বাবা-মা আসিয়া স্নানাহার করিতে বলেন, রামকান্ত উত্তর দিতে পারেন না। তন্দ্রার ঝোঁকে রামকান্ত স্বপ্ন দেখিলেন যেন সেই ব্রাহ্মণমূর্তি শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন, আমি দেখা দিলাম তবুও চিনিলে না। আমি বুড়ারায়। বহুকাল হইতে আমার ইচ্ছা আছে তোমাকে দিয়া আমার মঙ্গল-গান লেখাইব। এখন শীঘ্র উঠিয়া স্নান-ভোজন করিয়া লিখিবার আয়োজন করিয়া রাখ, কাল সকাল হইতে লিখিতে বসিও। কোন চিন্তা নাই। তোমার নাম আমি দেশদেশান্তরে জাগাইব। তোমাকে সমস্ত বিপদ

হইতে রক্ষা করিব। আজ হইতে আমি তোমার সখা হইলাম। তাহার পর রামকান্তের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া ধর্মঠাকুর তিরোহিত হইলেন। তাহার পর রামকান্ত উঠিয়া স্নানাহার করিলেন এবং বুড়ারায়ের সেবক বাঞ্ছারাম সরকারের কাছে গিয়া সব কথা বলিলেন। সরকার আনন্দিত হইয়া লিখিবার সব যোগাড় করিয়া দিলেন। পরের দিন সকালে সরকারের ঘরে গিয়া রামকান্ত ধর্মমঙ্গল-পুঁথি লিখিতে শুরু করিলেন। আগেই আরম্ভ করিলেন জাগরণ-পালা। সাত দিনে একুশ পাতা পুঁথি লেখা হইবার পর রামকান্তের কবিত্বশক্তি যেন শুকাইয়া গেল, কলম আর সরে না। পুঁথি ফেলিয়া রামকান্ত উঠিয়া গেলেন। বাঞ্ছারামের মেজ ছেলে গঙ্গারাম সযত্নে পুঁথির পাতাগুলি গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল। এইভাবে দশবারো দিন কাটিয়া গেলে পর বিজয়াদশমীর রাত্রে আবার বুড়ারায় রামকান্তকে স্বপ্ন দিলেন, আবার কলম ধর গিয়া। এখন সহজেই "বারোমতি" সম্পূর্ণ করিতে পারিবে। তবে তুমি প্রত্যেক প্রস্তাব এই পদ দিয়া আরম্ভ করিবে, তাহা হইলেই "কলমের উপরে বসিব গিয়া আমি" ঃ

জয় জয় বুড়ারায় বাবলা-দেহারা[১]
রাজরাজেশ্বর প্রভু রাখেন সেহারা।

ধর্মঠাকুর আরো বলিয়া দিলেন, লিখিতে লিখিতে পদ ভুল হইলে আমাকে স্মরণ করিও। তবে যখন কলম নেহাৎ অচল হইবে তখন পুঁথিতে ডোর দিয়া স্নানাহার করিতে যাইও।

অতঃপর ধর্মঠাকুরের আদেশ অনুসরণ করিয়া নূতন উদ্যমে রামকান্ত অনায়াসে বাষট্টি দিনে ধর্মমঙ্গল রচনা শেষ করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইঁহারাও ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন—রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে), হৃদয়রাম সাউ (১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে), গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিধিরাম গাঙ্গুলী, ধর্মদাস বৈদ্য ইত্যাদি। দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, ভবানন্দ রায়, দ্বিজ রাজীব প্রভৃতি লেখকরা সম্পূর্ণ ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। ইঁহাদের রচিত এক একটি পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

হুগলী জেলায় রাধানগর গ্রাম নিবাসী সহদেব চক্রবর্তীর 'ধর্মপুরাণ'

১ যাহার মন্দির (অর্থাৎ আস্তানা) বাবলাগাছের তলায়।

(বা 'অনিলপুরাণ' বা ধর্ম্মঙ্গল) ধর্মঠাকুরের পুরাণগ্রন্থ। রচনাকাল ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। ইহা ধর্ম্মঙ্গল-কাব্য নহে, ইহাতে লাউসেনের কাহিনী নাই। সহদেবের কাব্যের এক অংশ শিবঠাকুরের পুরাণ আর এক অংশ নাথ-যোগীদের পুরাণ, বাকি কতক অংশ ধর্মঠাকুরের পুরাণ। শেষের অংশে রামাই পণ্ডিতের কাহিনী এবং ধর্মপূজা-সম্বন্ধীয় অপর দুই-চারিটি কাহিনী আছে। শূন্যপুরাণে উদ্ধৃত নিরঞ্জনের উষ্মা ("রুষ্মা") ছড়াটি এই অংশেই আছে। ধর্মান্ধ ফকীরেরা কিরূপে দক্ষিণরাঢ়ের ও উড়িষ্যার কোন কোন গ্রাম বিধ্বস্ত করিয়াছিল তাহারই একটু ইতিহাস এই ছড়াটির মধ্যে প্রতিধ্বনিত। সহদেব চক্রবর্তীর গ্রন্থ ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অল্পকাল পরে রচিত হইয়াছিল। সহদেবের পিতার নাম বিশ্বনাথ। ইঁহাদের নিবাস ছিল হুগলী জেলায় রাধানগর গ্রামে।

হাওড়ার অদূরবর্তী ডোমজুড়-নিবাসী যাদবরাম নাথ (বা যাদুরাম পণ্ডিত) এই ধরণের একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহাও ধর্ম্মঙ্গল বলিয়া উল্লিখিত। ইহাতে ধর্মপূজার ইতিহাস একটু অন্যরকমে দেওয়া আছে। মূল কাহিনী হরিশ্চন্দ্রের পালা। যাদবরাম জাতিতে যোগী ছিলেন।

৬. শিবায়ন, সত্যনারায়ণ-পাঞ্চালী ইত্যাদি

ভিখারী শিবের আচরণ ও তাঁহার গৃহস্থালির বিষয়ে ছড়া-গান-কবিতা অনেকদিন হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল। কতকগুলি কাহিনী পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। শুধু শিবকে লইয়া লেখা কাব্য যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনটিই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বেকার নয়।

রামকৃষ্ণ রায় কবীন্দ্রের শিবায়ন বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে দেবীমাহাত্ম্য কাহিনীও অনেক আছে। বইটি সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে লেখা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। লেখক ভুরশুট অঞ্চলের লোক।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব-সংকীর্তন' (বা 'শিবায়ন') বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ শিবমাহাত্ম্য কাব্য। রামেশ্বরের পৈতৃক নিবাস ছিল আধুনিক ঘাটাল মহকুমার বরদা পরগনায় যদুপুর গ্রামে। পরে কবি কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের

আশ্রয়ে মেদিনীপুরের নিকটে অযোধ্যানগরে আসিয়া বাস করেন। যশোমন্তের পুত্র রাজারাম সিংহের আমলে রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন গাওয়া শুরু হয়। রচনাকাল তাহার কিছু পূর্বে—১৬৩২ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে)। সহজ ও সহৃদয় রচনা বলিয়া রামেশ্বরের শিবায়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিশিষ্ট কাব্যরূপে গণ্য হইতে পারে। রচনারীতিতে অলঙ্কারের উজ্জ্বলতা ও ব্যঙ্গের ঝাঁজ নাই। কিন্তু সমসাময়িক সাধারণ মানুষের ভাবনার পরিচয় আছে। রামেশ্বরের সময়ে বাঙ্গালা দেশের চাষী জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নীচু স্তরে নামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে দুর্গতি কবির মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। কবি তাঁহার দেবতাকে সাধারণ দুর্গত মানুষের সাজ পরাইয়া মানবজীবনেরই জয়গান গাহিয়াছেন। বাঙ্গালায় শিবচরিত্রকাব্যে মাঝে মাঝে ভদ্র রুচির ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু রামেশ্বর তাঁহার কাব্যে ভদ্ররুচির উল্লঙ্ঘন করেন নাই। যথার্থই "ভব্যভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর"।

রামেশ্বর একখানি সত্যনারায়ণের পাঞ্চালী রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যটি শিবসংকীর্তনের আগে লেখা হইয়াছিল। কবি তখনও যদুপুর পরিত্যাগ করেন নাই। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ, এবং সেই কারণে ইহার প্রচলন এখনও অব্যাহত। পরবর্তী কালের হরগৌরী-পদাবলীতে ও আগমনী গানে যে আন্তরিকতা শুনি রামেশ্বরের রচনায় তাহা প্রথম গুঞ্জরিত।

ধর্মমঙ্গল-কাব্যের মত সত্যনারায়ণ-পাঞ্চালীরও উদ্ভব দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলে। তবে ধর্মমঙ্গলের মত ইহার প্রসার ঐ স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অল্পকালমধ্যে ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র এবং পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে প্রসার লাভ করে। হিন্দুদের তরফ হইতে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতির ধর্মগত একটা মিটমাটের অবোধপূর্ব প্রচেষ্টা এই কাব্যপ্রেরণার মূলে। পীর-ফকীরেরা সাধারণত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই শ্রদ্ধাভক্তি পাইতেন, এই কারণে পীরের উপাসনা দুই ধর্মের মিলনের সেতুর মত হইয়াছিল। সত্যনারায়ণ দেবের পীরসংস্করণ, সত্যপীর পীরের দেবসংস্করণ। সুতরাং অতি সহজেই রামের সহিত রহিমের সমীকরণ হইয়া যায়। এই কাজের সূত্রপাত বোধ করি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে, তবে প্রকাশ সপ্তদশ শতাব্দীর আগে নয়। রূপরাম

ধর্মঠাকুরকে আসা-বাড়ি হাতে পীররূপেও দেখিয়াছিলেন, একথা বর্তমান প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে দক্ষিণরায়-গাজীর দোস্তালিও স্মর্তব্য।

সত্যনারায়ণের পাঞ্চালী ব্রতকথাই। প্রাচীন বাঙ্গালার সকল দেবমঙ্গল কাব্যের মধ্যে শুধু এইটিই এখনো পূজার অঙ্গ হিসাবে ব্রতকথারূপে পড়া হয়। কাহিনী দুইটি এবং ছোট। প্রথমটি ধর্মঠাকুরের আবির্ভাবের মত, দ্বিতীয়টি চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি-কাহিনীর মত।

সত্যনারায়ণ-কথার একজন প্রসিদ্ধ রচয়িতা হইতেছেন ফকীররাম কবিভূষণ। ফকীররামের কাব্য লেখা হয় ১০৭৪ ("ইন্দু বিন্দু সিন্ধু বেদ") মল্লাব্দে (অর্থাৎ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার আগে ও পরে ঘনরাম, রামেশ্বর, বিকল চট্ট, "দ্বিজ" রামকৃষ্ণ, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (ইনি দুইখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন—একখানির রচনাকাল ১১৪৪ সাল, "সনে রুদ্র চৌগুণা" অর্থাৎ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে), কবিবল্লভ, জয়নারায়ণ সেন (কাব্যের নাম "হরিলীলা", রচনাকাল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ), "কবি" শঙ্কর, দৈবকীনন্দন, গঙ্গারাম, "দ্বিজ" হরিদাস, "বিদ্যাপতি" ইত্যাদি।

আধুনিক রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত মহীপুর গ্রামবাসী বাউল বৈষ্ণব কৃষ্ণহরি দাসের কাব্যে আকার যেমন বড় বিষয়ও তেমনি নূতন। এই কাব্যে সত্যপীর দেবতা নহেন, তিনি রূপকথার মানুষ, মালঞ্চার রাজা মহীদানবের অনূঢ়া কন্যার পুত্র। মহীদানবের পুরোহিত কুশল ঠাকুর পরিত্যক্ত নবজাত শিশুকে কুড়াইয়া পাইয়া মানুষ করেন। একদিন বালক সত্যপীর মালঞ্চা নগরীর পশ্চিমে নূর নদীর তীরে একটি পুঁথি কুড়াইয়া পান। কুশল ঠাকুরের কাছে আনিলে তিনি দেখিলেন যে পুঁথিটি কোরান। ব্রাহ্মণের পক্ষে কোরান পড়া অনুচিত বলিয়া কুশল বালককে যেখানে পুঁথিটি পাওয়া গিয়াছিল সেখানে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। কুশলের কথা শুনিয়া সত্যপীর তর্ক জুড়িয়া দিলেন এবং প্রতিপন্ন করিলেন যে কোরানে-পুরাণে ভেদ নাই, হিন্দু মুসলমানের ধর্ম পরস্পরবিরোধী নহে। তাহার পর সত্যপীরের নানা রকম কেরামতির বর্ণনা। কৃষ্ণহরির জন্মভূমি ছিল সাখারিয়া গ্রাম। তাঁহার গুরু ছিলেন শমসের-পুত্র তাহের মামুদ। কবি মুখে মুখে রচনা করিয়া যাইতেন আর হরনারায়ণ দাস লিখিয়া ফেলিত। ১১৯০ সালে কৃষ্ণহরি সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া একটি ঐতিহাসিক গাথা লিখিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে সত্যপীরের মত ত্রৈলোক্যপীরের গানও প্রচলিত আছে। মুসলমানদের মধ্যে ময়মনসিংহ ও চব্বিশ-পরগণা অঞ্চলে গাজী সাহেবের গান এবং পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গের প্রায় সর্বত্র মানিকপীরের গান এখনও চলিত আছে। কিন্তু সাহিত্যহিসাবে এই গানগুলির কোন মূল্য নাই।

সূর্যের মাহাত্ম্য বিষয়ে দুইখানি ব্রতকথাজাতীয় রচনা পাওয়া গিয়াছে। রামজীবনের সূর্যমঙ্গলের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। এই কাব্য ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। দ্বিতীয় লেখক হইতেছেন "দ্বিজ" কালিদাস। "দ্বিজ" শম্ভুরামের জীমূতমঙ্গল সূর্যপুত্র জীমূতবাহনের জিতাষ্টমী-ব্রতকথা লইয়া রচিত।

পশ্চিবঙ্গের বহু আঞ্চলিক ও স্থানীয় দেবতার বিষয়ে কবিতা ছড়া ও গান লেখা হইয়াছিল। যেমন—বৈদ্যনাথ, তারকনাথ, বিশালাক্ষী (রাজবলহাট) মদনমোহন (বিষ্ণুপুর), যোগাদ্যা (ক্ষীরগ্রাম) এবং কিরীটেশ্বরী। উত্তর ও পূর্ববঙ্গেও এইজাতীয় রচনা একেবারে অজ্ঞাত ছিল না।

৭. কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য

বিদ্যাসুন্দর পাঞ্চালী কাব্যের সূত্রপাত ষোড়শ শতাব্দীতে। "দ্বিজ" শ্রীধর (উপাধি কবিরাজ) বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথম কবি। শা বিরিদের কাব্য আদ্যন্ত শ্রীধরের কাব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সপ্তদশ শতাব্দীতেও অন্তত দুইজন বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখিয়াছিলেন—কৃষ্ণরাম দাস ও প্রাণরাম চক্রবর্তী। কৃষ্ণরাম দাসের কথা আগে বলিয়াছি। প্রাণরাম চক্রবর্তী (উপাধি "কবিবল্লভ") কৃষ্ণরামের ঈষৎপূর্ববর্তী ছিলেন। ইঁহার কাব্যের রচনাকাল ১৫৮৮ শকাব্দ (১৬৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলে ধনী ও জমিদার সমাজে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর সবিশেষ সমাদর হইয়াছিল। বাই-নাচে যেমন বিদ্যাসুন্দর-পাঞ্চালীতেও তেমনি এই অঞ্চলের নব-ধনিসম্প্রদায়ের মন ঘোরতর আকৃষ্ট হইয়াছিল। মান সর্বাধিক হওয়ায় তখন ধনের কৌলীন্য-পরায়ণ ও আচার-আশ্রিত বনিয়াদি সমাজে ভাঙ্গন ধরিতেছিল। সুতরাং এমনি রুচিবিকৃতির ফ্যাশনের দিনে শহরবাসী শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের

সঙ্গীত সাহিত্যরুচি বিদ্যাসুন্দর-গানে ও যাত্রায় এবং তরজা-খেউড়-কবি গানে তৃপ্ত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্তত সাত-আটজন লেখক বিদ্যাসুন্দর পাঞ্চালী লিখিয়াছিলেন—বলরাম চক্রবর্তী ("কবিশেখর"), ভারতচন্দ্র রায় ("গুণাকর"), রামপ্রসাদ সেন ("কবিরঞ্জন"), নিধিরাম আচার্য ("কবিরত্ন") রাধাকান্ত মিশ্র ও কবীন্দ্র চক্রবর্তী।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি।

বিদেশী রাজপুত্র সুন্দর মালিনীকে দূতী করিয়া রাজকন্যা বিদ্যার সহিত গোপনে প্রণয় করে। কন্যার গোপন প্রণয়কাহিনী জানিতে পারিয়া বিদ্যার মাতা স্বামীকে বলিয়া দেন। রাজা কোটালকে দিয়া সুন্দরকে ধরিয়া আনেন এবং প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। সুন্দর কালীর ভক্ত ও বরপুত্র ছিল, সুতরাং যথাসময়ে দেবী আবির্ভূত হইয়া বিপন্ন ভক্তকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিলেন। সুন্দরের পরিচয় পাইয়া রাজা তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। কিছুকাল পরে বরবধূ দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

এই গল্পের বীজ পাওয়া যায় বিল্‌হণের চৌরপঞ্চাশিকা-নামক সংস্কৃত কবিতায়। কাহিনীটি নিতান্ত আধুনিক কালে সংস্কৃত খণ্ডকাব্যে পরিণত হইয়াছে। বররুচির নামে যে বিদ্যাসুন্দর নাটক পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিতান্ত অর্বাচীন রচনা। ভারতচন্দ্রেরও পরবর্তী রচনা বলিয়া মনে হয়। মূল উপাখ্যানে দেবতার সম্পর্ক ছিল না। সুন্দর চোর সাজিয়া বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল—এই সূত্রে সে কালীর উপাসক হইয়া দাঁড়াইল। এইভাবে ধর্মের ছাপ লইয়া কাহিনীকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করা হইয়াছে। সেকালে দেবদেবীর কথা না থাকিলে তাহা সাহিত্যই হইত না। ধর্মের রাঙতামোড়া হইলেও ইহা যে মূলে লৌকিক কাহিনী ছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মুখ্য কবি, এবং ইঁহার অন্নদামঙ্গল এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য। মুকুন্দরামের কাব্য যেমন পরবর্তী প্রায় সকল "মঙ্গল"-কাব্যরচয়িতাকে প্রভাবিত করিয়াছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যও তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কাব্যকলা প্রভাবিত করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল আধুনিক

হাওড়া জেলার সীমান্তে ভুরশুট (প্রাচীন ভুরিশ্রেষ্ঠী) পরগনায় পেঁড়ো গ্রামে। ইঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় সম্পন্ন জমিদার ছিলেন, পরে ইঁহার অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। ভারতচন্দ্রের জীবন ঘটনাসঙ্কুল। ঘরে কিছুদিন সংস্কৃত পড়িয়া ইনি হুগলীর কাছে দেবানন্দপুরে থাকিয়া কিছুদিন ফারসী পড়েন। তাহার পর কিছুকাল নানাস্থানী হইয়া দুঃখভোগ করেন। অবশেষে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পাইয়া মূলাজোড়ে বসতি করেন। সেখানে ১৬৮২ শকাব্দে (১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে) আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

ভারতচন্দ্রের কাব্যকে "মঙ্গল"-জাতীয় বৃহৎ কাব্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঠিকভাবে দেখিলে বইটিকে খাঁটি মঙ্গলকাব্য বলা যায় না, যেহেতু এ কাব্যের প্রধান রস ভক্তি নয়, এবং কোন দেবদেবীর পূজাপ্রচারের জন্য অথবা পূজার বা ব্রতের আনুষঙ্গিক হিসাবে পঠিত বা গীত হইবার জন্য ইহা রচিত হয় নাই (—কবির উক্তি সত্ত্বেও)। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ তিনটি স্বতন্ত্র কাব্যের সমষ্টি। এই তিনটি কাব্য—'অন্নদামঙ্গল,' 'কালিকামঙ্গল' এবং 'অন্নপূর্ণামঙ্গল'—অতি ক্ষীণ সূত্রে গাঁথা। অন্নদামঙ্গলে আছে কবির আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্রের বিপদউদ্ধার-কাহিনী অবলম্বনে অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্যখ্যাপন, কাব্যরচনার দোহাই এবং বিস্তৃতভাবে শিবায়ন কাহিনী। কালিকামঙ্গলে শুধুই বিদ্যাসুন্দরের গল্প। অন্নপূর্ণামঙ্গলে কৃষ্ণচন্দ্রের বংশকর্তার প্রশস্তি উপলক্ষ্যে মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্য-দমন বর্ণিত। আসলে অন্নদামঙ্গল ও অন্নপূর্ণামঙ্গল অংশ দুইটি পরস্পরের পরিপূরক। বিদ্যাসুন্দর অংশটি খাপছাড়া। মনে হয় এটি আগে লেখা এবং কালিকামঙ্গল বলিয়া কাব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সম্পূর্ণ হয় ১৬৭৪ শকাব্দে (১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে)। ভারতচন্দ্র আরও কয়েকখানি ছোটখাট কাব্য এবং খুচরা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দুইখানি হইতেছে সত্যনারায়ণের পাঁচালী (একখানির রচনাকাল ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ভারতচন্দ্রের কবিশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার রচনাশৈলীতে। স্থানবিশেষে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী শব্দের সংযোগের ফলে রচনা অত্যন্ত সরস হইয়াছে। নানারকম সংস্কৃত ছন্দে, এবং একাধিক ভাষা মিশাইয়া,

বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিয়া ভারতচন্দ্র নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যে যে গানগুলি দেওয়া আছে সেগুলিতে ভারতচন্দ্রের কবিকৃতিত্বের যথার্থ পরিচয় নিহিত।

সুবিখ্যাত শাক্তসাধক রামপ্রসাদ সেনের নিবাস হালিসহরের পাশে কুমারহট্ট গ্রামে ছিল। ইঁহার সম্বন্ধে নানারকম গল্প প্রচলিত আছে। রামপ্রসাদের পিতার নাম রামরাম। ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যে সংবর্ধনা লাভ করেন। তিনিও একখানি কালিকামঙ্গল (অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর-কাব্য) রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ভারতচন্দ্রের কাব্যের পরে লেখা। ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে শিল্পচাতুর্যে ও ভাষার মনোহারিত্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য উৎকৃষ্টতর হইলেও চরিত্রচিত্রণে রামপ্রসাদের কাব্য উন্নততর। রামপ্রসাদের কাব্যে বর্ণিত চরিত্রগুলি প্রায়ই স্বভাবসঙ্গত।

রামপ্রসাদের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় কালিকামঙ্গলে পাই না, পাই তাঁহার সঙ্গীতে। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের রচনায় এবং তাঁহার বিশিষ্ট সুরে কবি-সুরকারের নিষ্কপটতা নিষ্ঠা এবং আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা এমন মর্মস্পর্শী ভাবে প্রকাশিত যে, আজ প্রায় দুই শত বৎসর পরেও সে গানগুলির হৃদয়গ্রাহিতা অটুট রহিয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদের নামে এখন যে সব গান পাওয়া যায় তাহা সবই এক ব্যক্তির রচনা নয়।

কলিকাতা-নিবাসী রাধাকান্ত মিশ্রের কাব্য রচিত হয় ১৬৮৯ শকাব্দে (১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে)। কবি নিজের কাব্যকে "শ্যামার সঙ্গীত" বলিয়াছেন। রাধাকান্তের রচনারীতি সরল এবং গ্রাম্যতাবর্জিত।

চট্টগ্রামের নিধিরাম আচার্য কবি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। ইনি ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসুন্দর-কাব্য লিখিয়াছিলেন। "কবীন্দ্র" উপাধিযুক্ত দুইজন চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যাসুন্দর পাঁচালী লিখিয়াছিলেন। একজন ঘটক চক্রবর্তীর পুত্র। ইনি "কবিচন্দ্র" উপাধিও ব্যবহার করিয়াছেন। আর-এক জনের নাম মধুসূদন। ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। ইনি নিজের বিবাহঘটনা কাব্যাকারে গাঁথিয়া বৃহত্তর কাব্য গৌরীমঙ্গলের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। মধুসূদন বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের শেষ কবি।

৮. নাথ-সিদ্ধদের গাথা

প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালা দেশে নিরীশ্বর এক যোগী-সম্প্রদায় ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের মতে শিবের অনুজ ও শিষ্য-প্রশিষ্য চারিজন প্রধান সিদ্ধ ছিলেন— মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা এবং কানুপা। ইঁহাদের অনেক সময় শৈব সিদ্ধ বলা হয়। কিন্তু শিব এ সম্প্রদায়ের উপাস্য নহেন, যদিও শিবকে ইঁহারা মানেন। এই সিদ্ধদের অলৌকিক গল্প পূর্বভারতে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। সে গল্পগুলি দুই পর্যায়ে পড়ে। এক মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী, আর ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী। এই দুই দফা কাহিনী লইয়া দুই রকম গাথার উদ্ভব হইয়াছে—গোরক্ষবিজয় এবং গোবিন্দচন্দ্রের গীত। গোরক্ষবিজয়ের বিষয়—দেবী গৌরীর ছলনায় মীননাথের মোহপ্রাপ্তি এবং অবশেষে শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁহাকে চৈতন্যদান। এ কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার দেওয়া গেল।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেব সৃষ্ট হইবার পর আদিদেব ধর্মের মৃতদেহ হইতে মীননাথ গোরক্ষনাথ কানুপা ও হাড়িপা এই চারি সিদ্ধের উৎপত্তি হইল। আদিদেবের আজ্ঞায় শিব গৌরীকে বিবাহ করিয়া কৈলাসে সংসার পাতিলেন। গৌরীর অভ্যর্থনা সত্ত্বেও চারি সিদ্ধ বিবাহ না করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইলেন। গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কানুপা (কৃষ্ণপাদ) হাড়িপার (নামান্তর জালন্ধরিপাদ) শিষ্য-ভৃত্যরূপে পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। একদিন ক্ষীরোদসাগরে টঙ্গির উপরে বসিয়া শিব গৌরীকে তত্ত্বকথা ("মহাজ্ঞান") বলিতেছিলেন। মাছের রূপ ধরিয়া মীননাথ টঙ্গির তলায় থাকিয়া "মহাজ্ঞান" শুনিয়া লইলেন। টের পাইয়া গৌরী শাপ দিলেন যে, একদা কার্যকালে মীননাথ এই মহাজ্ঞান বিস্মৃত হইবেন। চারি সিদ্ধ চারিদিকে চলিবার উদ্যোগ করিলেন—পূর্বদেশে হাড়িপা দক্ষিণদেশে কানুপা পশ্চিমদেশে গোরক্ষনাথ আর উত্তরদেশে মীননাথ।

গৌরী ভাবিলেন, চারি সিদ্ধ বিবাহ করিয়া সংসার করুন। শিব জানেন, উহারা কিছুতেই বিবাহ করিবেন না। দেবী জেদ ধরিলেন, তাঁহাদের মন বুঝিবেন। গোরক্ষনাথ ছাড়া আর তিনজনেই দেবীর ছলনায় ঠকিলেন। দেবী সে তিনজনকে অভিশাপ দিলেন। হাড়িপাকে বলিলেন, তুমি হাতে

ঝাড়ুকাঁধে কোদাল লইয়া হাড়ি হইয়া ময়নামতীর ঘরে খাট গিয়া। কানুপাকে বলিলেন, তুমি ডাকপাখী হইয়া এখনি উড়িয়া যাও। মীননাথকে বলিলেন, তুমি নারীরাজ্য কদলী দেশে গিয়া রাজা হও।

শাপগ্রস্ত মীননাথ মহাজ্ঞান ভুলিয়া নারী-রাজ্যে গিয়া রাজা হইয়া রহিলেন। নারীমোহে অচৈতন্য মীননাথের দিন ভোগসুখে কাটিতে লাগিল। গোরক্ষনাথ আগেই সরিয়া পড়িয়াছিলেন। গুরুর কাণ্ড তাঁহার কিছুই জানা নাই। একদিন তিনি বিজয়ানগরে বকুলতলায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আকাশে কানুপা উড়িয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার ছায়া গোরক্ষনাথের গায়ে পড়িল। গোরক্ষনাথ ভাবিলেন, কে এমন দাম্ভিক আছে যে আমার মাথার উপর দিয়া যায়। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি এক পাটি জুতা উপর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। পাদুকা কানুপাকে ধরিয়া আনিল। গোরক্ষনাথ বলিলেন, তোমার সাহস তো কম নয়, আমার আসনের উপর দিয়া যাইতেছ! কানুপা হাসিয়া বলিলেন, বুঝিলাম তুমি বড় সিদ্ধ, কিন্তু ওদিকে তোমার গুরু যে "কদলীর ভোলে" পড়িয়া হাবুডুবু। তাঁহার আয়ু আর তিন দিন মাত্র বাকি। পার তো তাঁহাকে রক্ষা কর গিয়া।

গোরক্ষ তখনি যমের দপ্তরে গেলেন। যমের খাতা দেখিয়া মীননাথের আয়ুর হিসাবে খরচ সব কাটিয়া দিয়া বকুলতলায় ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর ব্রহ্মণবেশ ধরিয়া কদলী দেশে চলিলেন। লঙ্গ ও মহালঙ্গ দুই অনুচর সঙ্গে চলিল। ব্রাহ্মণবেশে সেখানে ঢুকিতে না পারিয়া গোরক্ষ বেশ পাল্টাইয়া যোগী সাজিলেন। কিন্তু রাজদ্বারে যোগিবেশধারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। কোন পুরুষ যাইতে পায় না, এবং নর্তকী ভিন্ন কোন বাহিরের স্ত্রীলোকও মীননাথের কাছে ঘেঁসিতে পায় না। তখন গোরক্ষ নর্তকীর বেশ ধরিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দ্বারী রাজার সমীপে যাইতে দেয় না। অগত্যা তখন গোরক্ষ সভাদ্বারে থাকিয়া মাদলে চাঁটি দিলেন। সে ধ্বনি মীননাথের বুকের মাঝে যেন "গুরু গুরু" করিয়া বাজিয়া উঠিল। মীননাথ নটিনীকে সম্মুখে আনিতে আদেশ দিলে গোরক্ষ আসিয়া গুরুকে নমস্কার করিয়া মাদল বাজাইয়া নাচ জুড়িলেন।

মীননাথের মনে হইল, মাদলের তাল যেন গুরু বলিতেছে। তিনি বলিলেন :

নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে
তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে।

কদলীর নারীরা ইতিমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে যে, নর্তকী ছদ্মবেশে মীননাথকে তাহাদের রাজাকে ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছে। তাহারা নাটুয়াকে তখনি বিদায় করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। গোরক্ষ বলিলেন, "আধতালে নাটভঙ্গ করিতে না পারি।" এই বলিয়া তিনি মাদলে বোল তুলিতে লাগিলেন, "শিষ্য-পুত্র চিনি লও গুরু মীননাথ।" মীননাথ চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না বুঝিয়া গোরক্ষ মাদলের বোলে আর ঘুঙ্গুরের তালে গুরুকে তত্ত্বজ্ঞান দিতে লাগিলেন। শুনিয়া মীননাথের কিছু চৈতন্য হইল। বলিলেন, পুত্র এখন করিব কি? "পড়িছি কামিনীর ভোলে কিরূপে এড়াই।" গোরক্ষ তখন হেঁয়ালির ছলে তত্ত্বকথা বলিয়া গুরুকে মহাজ্ঞান স্মরণ করাইতে লাগিলেন ঃ

পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে
বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে।
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চাল
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল।[১]

এতক্ষরে মীননাথের পূর্ণ চৈতন্য হইল। মীননাথের পুত্রকে গোরক্ষনাথ প্রথমে আছাড়িয়া মারিয়া পরে বাঁচাইলেন। তাহার পর শাপ দিয়া কদলী নারীদের বাদুড় করিয়া দিয়া গুরু মীননাথ ও গুরুপুত্র বিন্দুনাথকে লইয়া গোরক্ষ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় কাহিনীটি প্রথমটির মত অত সংক্ষিপ্ত ও তত্ত্বোপদেশপূর্ণ এবং রূপকমণ্ডিত নয়। ইহার বিষয় বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং মহত্ত্বমণ্ডিত। নাথ-সম্প্রদায় হিন্দুসমাজে অন্তরঙ্গভাবে স্থান পায় নাই। পাইলে গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতীর গান রামায়ণের মত মহাকাব্যে পরিণত হইত। কাহিনীটি সংক্ষেপে বলিতেছি।

---

১ অর্থাৎ, পুকুরে জল নাই অথচ পাড় ডুবিয়া গিয়াছে, পাখির বাসায় ডিম নাই অথচ বাচ্ছা উড়িয়া গেল। নগরে মানুষের বাস নাই কিন্তু ঘন বসতি। অন্ধ দোকানদার, কালা খরিদ্দার।

পাটিকার রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতী সিদ্ধ যোগীর শিষ্য ছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। কোলে শিশু গোবিন্দচন্দ্র (বা গোপীচন্দ্র)। স্বামীর অকালমরণ দেখিয়া ময়নামতীর ইচ্ছা হইল, সম্ভব হইলে পুত্রকে যোগসিদ্ধি পাওয়াইয়া অমর করাইবেন। গোবিন্দচন্দ্রের বয়স যখন ষোল, তখন তাহার বিবাহ হইল, অদুনা ও পদুনার সঙ্গে। এদিকে দেবীর শাপে সিদ্ধ হাড়িপা (জালন্ধরি) সশিষ্য হাড়ি হইয়া যে রাজার ঘোড়াশালায় মেথরের কাজ করিতেছেন তাহা ময়নামতী জানেন না। একদিন সকালে ঝুড়ি কোদাল লইয়া হাড়িপা ঘোড়াশালার দিকে চলিয়াছেন, পিছনে পিছনে ছুটিতেছে তাঁহার শিশুপুত্রবেশী কানুপা (বা গাভুর সিদ্ধা) বাপের কথা না শুনিয়া। রাজবাড়ীর বাগানে ঢুকিয়া হাড়িপা ছেলেকে ভুলাইবার জন্য নারিকেল পাড়িয়া দিতে মন করিলেন। গাছের দিকে চাহিয়া হুঙ্কার দিবামাত্র গাছের মাথা মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। হাড়িপা কয়েকটি নারিকেল ছিঁড়িয়া ছেলের হাতে দিলেন। গাছ আবার খাড়া হইয়া গেল। প্রাসাদের গবাক্ষ হইতে ময়নামতী এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি বলিলেন, এ ব্যক্তি হাড়িমেথর নয়, নিশ্চয় ছদ্মবেশী সিদ্ধ হাড়িপা। পুত্রকে ইঁহারই চেলা করিয়া দিব। একথা গোবিন্দচন্দ্রকে বলায় তাঁহার মত হইল না। তিনি বলিলেন :

> পাইশালে[১] খাটে হাড়ি না করে সিনান[২]
> তার ঠাঞি কেমনে আছয়ে ব্রহ্মজ্ঞান।
> আমি রাজা গোবিন্দচন্দ্র সর্বলোকে জানে
> কেমনে ধরিতে বল হাড়ির চরণে।

ময়নামতী পুত্রকে নিজের বৈধব্যের করুণ ইতিহাস শুনাইয়া তত্ত্বকথা বলিতে লাগিলেন :

> অতি উচ্চতর গাছ নাম নারিকল
> পাতালে থাকিয়া দেখ গগনে উঠে জল।
> নারিকেল হইয়া সে জ্ঞানের জানে কল
> তেকারণে শূন্যাকারে ডাবে ভরে জল।...

---

১ পাইখানায় বা আস্তাবলে। ২ স্নান।

হেন বুদ্ধি কর পুত্র হেতু[১] পরমাণি[২]
কোন হেতু ফল মধ্যে সান্তাইল পানি।....
শোন পুত্র গোপীচন্দ্র তেজ অভিমান
ভুবনে তুলনা নাহি জ্ঞানের সমান।....
রূপ যৌবন পুত্র তিন দিনের ভোগ
সিদ্ধি সাধিলে বাছা থাকে চারি যুগ।

তখন গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপার শিষ্য হইতে রাজি হইলেন। হাড়িপা দীক্ষা দিয়া শিষ্যকে কয়েকটি কঠিন পরীক্ষায় ফেলিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের অবিচল নিষ্ঠার জয় হইল। গুরুর আদেশে তাঁহাকে বিদেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইল। শেষকালে গুরু তাঁহাকে এক অসতী নারীর কাছে বাঁধা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। বারো বছর পরে খেয়াল হইলে হাড়িপা গিয়া দেখেন যে গোবিন্দচন্দ্রকে সে নারী ভেড়া করিয়া রাখিয়াছে। শিষ্যকে উদ্ধার করিয়া তিনি মহাজ্ঞান দিলেন। তাহার পর গুরুর আজ্ঞায় গোবিন্দচন্দ্র ঘরে ফিরিয়া সংসার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে তখনো বৈরাগ্যের রঙ পাকা হয় নাই। গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি পত্নীদ্বয়ের কথায় ভুলিয়া যোগবিভূতি দেখাইতে গেলেন। হাড়িপা জানিয়া বিরক্ত হইলেন এবং হুঙ্কার করিয়া গোবিন্দচন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞান হরণ করিলেন। সিদ্ধাই দেখাইতে না পারায় পত্নীরা রাজাকে উপহাস করিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া হাড়িপাকে মাটির তলায় পুতিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। মাটির তলায় হাড়িপা বারো বৎসর ধরিয়া পোতা রহিলেন।

গোরক্ষনাথের কাছে কানুপা খবর পাইলেন যে, তাঁহার গুরু জালন্ধরি "গাড়া আছে মাটির ভিতরে"। শিশুযোগীর বেশ ধরিয়া কানুপা গেলেন পাটিকায় গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানীতে। রানীদের আদেশ ছিল গোবিন্দচন্দ্রের কাছে যোগিবেশধারী কেহ যেন ঘেঁসিতে না পারে। কোটাল শিশুযোগীকে বড় রানীর কাছে লইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দেশে তো যোগীর বাস নাই, তুমি কেন আসিয়াছ? শিশুপা (অর্থাৎ শিশুবেশী কানুপা) উত্তর দিলেন, গৃহস্থের ছেলে আমি, যোগটোগ কিছুই জানি না। পথে

১ কার্যকারণ সম্বন্ধ। ২ বুঝিয়া।

খেলা করিতেছিলাম, এক যোগী আমাকে সন্দেশ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া দিয়াছিল। তাহার পর হইতে আমি নিরুদ্দিষ্টভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। শুনিয়া রানীর দয়া হইল। তিনি শিশুযোগীকে ছাড়িয়া দিলেন।

কানুপা তখন সোজা রাজার দরবারে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া একবার হুঙ্কার ছাড়িতেই হাড়িপার চেলা ষোল শ যোগী আবির্ভূত হইল। রাজা তাঁহাদের খাওয়াইতে বসাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের পেট আর কিছুতেই ভরে না। তখন গোবিন্দচন্দ্র কানুপার পায়ে পড়িলেন। কানুপার উপদেশে হাড়িপাকে মাটির ভিতর হইতে বাহির করা হইল এবং তাঁহার ধ্যানভঙ্গের আগে রাজার তিনটি সোনার মূর্তি গড়াইয়া হাড়িপার সম্মুখে একের পর একটি করিয়া রাখা হইল। ধ্যানভঙ্গ হইলে হাড়িপার রুদ্র দৃষ্টি সেগুলির উপর পড়িল এবং সেগুলি একে একে ভস্ম হইয়া গেল। এইভাবে গোবিন্দচন্দ্রের তিন ফাঁড়া কাটিল। তাহার পর হাড়িপা রাজাকে পুরাপুরি যোগীর বেশ দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ দেশে চলিয়া গেলেন।

মূল কাহিনীর শেষ ছিল এইখানেই। "মধুরেণ সমাপয়েৎ,"—আমাদের দেশের এই চিরন্তন কাব্যনির্দেশ অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালের কবিরা কেহ কেহ গোবিন্দচন্দ্রকে মাঝে মাঝে অথবা বারোমাসের মত ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

এই কাহিনীর মূলে যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক ঘটনা থাকা অসম্ভব নয়। প্রাচীন কালে উত্তরপূর্ববঙ্গের যে অঞ্চল পট্টিকের নামে পরিচিত ছিল সে অঞ্চল এখন পূর্ব পাকিস্তানে ত্রিপুরা জেলায় লালমাই বা ময়নামতী নামে প্রসিদ্ধ। কাহিনীর "পাটিকা" পট্টিকের হইতে পারে। ময়নামতীতে প্রাচীন প্রাসাদের ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মিলিয়াছে। কিন্তু এখন গল্প হইতে ইতিহাসের নির্যাস নিষ্কাশিত করা অসম্ভব। বাঙ্গালা দেশের এই নিজস্ব কথাবস্তু, গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের করুণ কাহিনী, দেশের সীমানা ছাড়িয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছিল। পঞ্জাব সিন্ধু মহারাষ্ট্র রাজপুতানা প্রভৃতি দেশে এই গাঁথা গাহিয়া এখনও যোগী-সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায়। বাঙ্গালা দেশে এখন গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত গাঁথাগুলির মধ্যে যেটি সর্বপ্রাচীন সেটি পশ্চিমবঙ্গের কবি দুর্লভ মল্লিকের রচনা (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ)। সহদেব

চক্রবর্তীর অনিলপুরাণে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী আছে। ভীমসেন রায় ও শেখ ফয়জুল্লা বিরচিত গোরক্ষবিজয় উত্তরপূর্ব বঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। ভবানীদাসের ও আবদুল সুকুর মহম্মদের পাঁচালীও উত্তরবঙ্গে মিলিয়াছে। এ সবের রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হওয়া অসম্ভব নহে।

গোরক্ষবিজয় কাহিনীর সবচেয়ে পুরানো রচনা পঞ্চদশ শতাব্দীর, বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' নাটক। সংস্কৃতে লেখা ছোট বই। তবে যে পদগুলি আছে সেগুলি মৈথিলীতে বা ব্রজবুলিতে লেখা।

গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতী কাহিনীর আর একটি পুরানো রচনা নাটকের ছাঁদে পাওয়া গিয়াছে। নাম 'গোপীচন্দ্র নাটক'। নেপালে লেখা। এবং ভাষা প্রধানত বাঙ্গালা। রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

৯. অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধি

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালায় দেওয়ানির অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেশের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া দেশের রাজশক্তি অধিকার করে। ইহাতে বাঙ্গালা দেশে তথা ভারতবর্ষে নূতন চেতনার আবির্ভাব-সম্ভাবনা ঘটিল। এই সময়ের কিছু আগে হইতে বাঙ্গালায় ছোটখাট গদ্য-রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। শুধু খ্রীষ্টান মিশনারীদের নহে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের প্রচেষ্টাও এবিষয়ে কিছু পরিমাণে কার্যকর হইয়াছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-সহজিয়ারা ভাঙ্গা গদ্যে ছোট ছোট কড়চা বই লিখিয়াছিলেন। গদ্যের পরিপূর্ণ রূপ ইহাতে না থাকিলেও রচনাগুলি উপেক্ষণীয় নয়। প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রের বইয়ের মর্ম বাঙ্গালা গদ্যে প্রকাশ অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই শুরু হইয়াছিল। বৈদ্যেরা দুই-একটী কবিরাজী বইও বাঙ্গালা গদ্যে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার না ঘটিলে পরবর্তীকালে বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতি অত দ্রুত হইত কিনা সন্দেহ।

ইংরেজ কোম্পানি রাজ্য পাইয়া দেশের আইনকানুন প্রণয়নে লাগিল। চিঠিপত্র ও পাট্টা-দলিল ইত্যাদির বাহিরে ইহাই হইল বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম

ব্যবহারিক প্রয়োগ। তাহার পর প্রথমে ইংরেজকে বাঙ্গালা, পরে বাঙ্গালীকে ইংরেজী শিখাইবার আবশ্যকতা বোধ হইলে ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হইতে লাগিল। হাতের লেখায় এই কাজ নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং প্রথমেই মুদ্রাযন্ত্র ও বাঙ্গালা টাইপের প্রয়োজন অনুভূত হইল। হুগলীতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের জন্য বাঙ্গালা ও নাগরী টাইপ তৈয়ারি করিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী, নাম চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্ (পরে স্যার চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্)। ইনি খুব ভালো সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন এবং ইংরেজীতে গীতা অনুবাদ করিয়াছিলেন। উইল্‌কিন্‌স্ শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকারকে টাইপের ছেনী-কাটা শিখাইয়া দেন। মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরের প্রথম ব্যবহার হইল নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড কর্তৃক ইংরেজীতে লেখা বাঙ্গালা ব্যাকরণে। বইটি হুগলীতে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়। মুদ্রাযন্ত্রের জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের এই সৃষ্টি হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন যুগের সম্ভাবনা হইল, এ কথা বলা চলে। মুদ্রাযন্ত্রে বই ছাপা অনায়াসসাধ্য ব্যাপার। আগে হাতে-লেখা পুঁথির চলন ছিল। তখন একখানি পুঁথি লিখিতেই যথেষ্ট সময় ও অর্থ ব্যয় হইত। মুদ্রিত পুস্তক সহজলভ্য, সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের মহিমায় সাহিত্যভাণ্ডার ধনিদরিদ্র সকলেরই জন্য উন্মুক্ত হইল। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সাহিত্য তখন হইতে সকল সময়ে সকলের ব্যবহারের সামগ্রী হইল।

বাঙ্গালা গদ্যের রীতি চালু হইবার পরেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্বের মত বৈষ্ণব পদ এবং রামায়ণ মহাভারত মনসামঙ্গল ইত্যাদি কাব্য যথেষ্ট রচিত হইয়াছিল। ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের অনুবাদও যথেষ্ট হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে প্রণয়কাহিনী-কাব্য শহর অঞ্চলে আদৃত হইত। এই সকল রচনার সাহিত্যমূল্য সাধারণত অকিঞ্চিৎকর। উত্তরবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে ঐতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত পল্লীগাথা জনসাধারণের উপভোগের সামগ্রী ছিল। বৈঠকি গানের চলন দিন দিন বাড়িতে থাকিল।

১০. প্রাচীন নাটগীত অভিনয় নমুনা ও অর্বাচীন ঝুমুর নেটো ও যাত্রা

প্রাচীন কালে বাঙ্গালা দেশে যাত্রার ধরণে নাটগীতের অভিনয় হইত। দুই তিন বা তদূর্ধ্ব পাত্রপাত্রী বাঁধা পদাবলী বা গীতের সাহায্যে উপযুক্ত সংলাপ ও ভাবভঙ্গী সংযোগে পৌরাণিক কাহিনীর বা কোন ঘটনার অভিনয় করিত। কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াকে বলিত "কাচ কাচা"। যে নট বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার ভূমিকা লইত তাহারই উপর কৌতুকরস সৃষ্টির ভার ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ অভিনয়ের সর্বপ্রথম বর্ণনা পাই ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে। চৈতন্য প্রথম বয়সে তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যের ঘরে ব্রজলীলা ও রুক্মিণীহরণ অভিনয় করিয়াছিলেন। চৈতন্য রুক্মিণী সাজিয়াছিলেন, গদাধর রাধা, শ্রীবাস নারদ, ব্রহ্মানন্দ রাধার বড়াই[১], নিত্যানন্দ রুক্মিণীর বড়াই, হরিদাস কোটাল, শ্রীরাম ও গঙ্গাদাস নারদের দুই শিষ্য এবং অদ্বৈত বিদূষক। প্রস্তাবনায় কোটালের প্রবেশ।

প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস
মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস
মহাপাগ শিরে শোভে ধটি পরিধান
দেখিয়া সভার হৈল বিস্ময়-গেয়ান।

মুরারি গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া হরিদাস দুই হাতে গোঁফ মোচড়াইতে মোচড়াইতে রঙ্গস্থলে বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর নারদবেশে শ্রীবাসের প্রবেশ।

মহাদীর্ঘ পাকা দাড়ি ফোঁটা সর্ব গায়
বীণা-কান্ধে কুশ-হস্তে চারি দিকে চায়।

শ্রীরাম পণ্ডিত শিষ্য সাজিয়া বগলে আসন ও হাতে কমণ্ডলু লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে আসিলেন। তিনি গুরুকে বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিলেন। তাহার পর অদ্বৈত আসিয়া নারদের সহিত সংলাপ জুড়িলেন। এইভাবে প্রথম অঙ্ক অভিনয়ে এক প্রহর কাটিয়া গেল।

---

১ মাতামহী বা মাতামহীস্থানীয়া অভিভাবিকা।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে রাধা বেশে গদাধরের প্রবেশ। সঙ্গে সখী সুপ্রভা আর বড়াই।

হাতে নড়ি কাঁখে ডালি নেত পরিধান
ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান।

তাঁহাদের প্রবেশমাত্র কোটাল হাঁক দিয়া বলিলেন, তোমরা যাও কোথায়? বড়াই বলিলেন, আমরা মথুরায় যাইতেছি। রাধা ও সখীকে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা দুই কাহার বনিতা?" বড়াই উত্তর করিলেন, একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? নারদ বলিলেন, জানা উচিত বলিয়া। উত্তরে "হয় বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায়"। নারদের অপর শিষ্য গঙ্গাদাস জিজ্ঞাসা করিলন, "আজ কোথায় থাকিবা?" বড়াই বলিল, "তুমি স্থানখানি দিবা।" নারদ-শিষ্য বলিলেন, কাজ নাই, তোমরা সরিয়া পড়। বিদূষক অদ্বৈত বলিলেন, "এত বিচারে কি কাজ? মাতৃসম পরনারী কেন দেহ লাজ?" তাহার পর তিনি বড়াইকে বলিলেন, আমার প্রভু নাচ-গান বড় ভালোবাসেন। তোমরা যদি এখানে নাচ দেখাইতে পার তবে প্রচুর ধন পাইবে। তখন রাধা নৃত্য জুড়িল।

রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর।

তাহার পর রুক্মিণীর বেশে চৈতন্যের প্রবেশ। তাঁহার

আগে নিত্যানন্দ প্রভু বড়াইর বেশে
বঙ্কবঙ্ক করি[1] হাঁটে প্রেমরসে ভাসে।

চৈতন্যের বেশ এমন চমৎকার মানাইয়াছিল যে নিত্যানন্দের পিছনে পিছনে যখন তিনি প্রবেশ করিলেন তখন কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।

অন্যের কি দায় আই[2] না পারে চিনিতে,
আই বোলে লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে।

---

১ বাঁকিয়া বাঁকিয়া। ২ অর্থাৎ চৈতন্যের মাতা শচীদেবী।

রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া

জগৎজননীভাবে নাচে বিশ্বম্ভর
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর

নাচিতে নাচিতে চৈতন্যের ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তর হইতে লাগিল। কখনো রুক্মিণীর ভাব।

কখনো বোলয়ে বিপ্র কৃষ্ণ কি আইলা
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা।

কখনো বা দেবীর ভাব।

ভাবাবেশে যখন বা অট্ট-অট্ট হাসে
মহাচণ্ডী হেন সভে বুঝিয়ে প্রকাশে।

আবার কখনো রাধার ভাব।

ক্ষণে বোলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে
গোকুলসুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে।

শেষে তাঁহার মহাশক্তির আবেশ হইল। ফলে অভিনয় শেষ অবধি গড়াইল না।

নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও এই চিত্রটুকুর মধ্যে সেকালের নাটগীতের ও নাট্যাভিনয়ের প্রায় যথাযথ বিবরণ পাইতেছি।

নাটগীতের এক ধারা ঝুমুর। ঝুমুরে দুইতিনটির বেশি অভিনেতা থাকিত না। প্রায়ই দ্বৈত গান "লগনী" ও নাচ থাকিত। ঝুমুর-পালায় সবই গান বা পদাবলী, গদ্য সংলাপের কোন স্থান ছিল না। বাঙ্গালা ঝুমুর (প্রাচীন মৈথিলী "ঝুমুল", হিন্দী "ঝমাল") প্রথমে এক বিশিষ্ট নৃত্যাভিনয়ের ভঙ্গী ছিল। সংস্কৃতে বলিত "জম্ভলিকা"। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুতুলনাচের সঙ্গে পুরানো ঝুমুর নাটগীতের নিদর্শন পাই।

পাঞ্চালীর সঙ্গে নাটগীত ঝুমুর ও যাত্রার প্রধান পার্থক্য এই ছিল যে পাঞ্চালীর গানে গায়ক চামর ঢুলাইত এবং অঙ্গভঙ্গি করিত বটে কিন্তু তাহা নাট-অভিনয়ের ভঙ্গি নয়, কারণ পাঞ্চালীতে মূল গায়নই অদ্বিতীয় অভিনেতা।

যাত্রা আমাদের দেশে আবহমানকাল প্রচলিত আছে। "যাত্রা" শব্দের মূল অর্থ হইতেছে দেবপূজার উৎসবে ও রাজকীয় সমারোহে শোভাযাত্রা এবং তদুপলক্ষ্যে নাটগীত। যাত্রা-গান যে শুধু দেবপূজা উপলক্ষ্যেই হইত তাহা নহে, সাধারণ উৎসবেও যাত্রার অনুষ্ঠান হইত। সেকালে যাত্রার কোন বাঁধা পালা থকিত না। পাত্রপাত্রীরা নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত উপস্থিতরকম সংক্ষেপে আবৃত্তি অথবা গান করিত। অনেক সময়ে আবার শুধু গানগুলি নির্দিষ্ট থাকিত, সংলাপ নটনটীরা মুখে মুখে যোগাইত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত এইরূপ বাঁধা-গানের কয়েকটি পালা মিথিলা ও বাঙ্গালা দেশ হইতে নেপালে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। সেখানে অবশ্য পালাগুলি কতকটা নেপালী রূপ পাইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালাতে ও ব্রজবুলিতে লেখা গানগুলি প্রায়ই অক্ষত রহিয়া গিয়াছে। নেপালে প্রাপ্ত বাঙ্গালা যাত্রা-পালার মধ্যে যেটি সবচেয়ে পুরানো সেটির রচনার অথবা সঙ্কলনের কাল হইতেছে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। এই গোপীচন্দ্র নাটকের উল্লেখ আগে করিয়াছি। ইহার আগে বিদ্যাপতির গোরক্ষবিজয় মিলিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে লেখা একটি সংস্কৃতশ্লোকাকীর্ণ প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রা-পালার নিতান্ত অসম্পূর্ণ আদর্শ ভারতচন্দ্রের চণ্ডী-নাটকে পাওয়া যাইতেছে। রচনা আরম্ভ করিয়াই কবি ক্ষান্ত হইয়াছিলেন অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া নাটকটির সম্পূর্ণ রূপ আমরা পাই নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাত্রা-গানের উপর পাঞ্চালীর প্রভাব পড়িতে থাকে। এই সময়ে যাত্রা বলিতে প্রধানত কৃষ্ণ-যাত্রা বুঝাইলেও চণ্ডী-যাত্রা এবং চৈতন্য-যাত্রা অপ্রচলিত হইয়া যায় নাই। পাঞ্চালীর প্রভাবে যাত্রায় কৌতুকরসের বাহুল্য দেখা দিল। পূর্বে অবশ্য বড়াই ভূমিকায় এই রসের কিঞ্চিৎ যোগান ছিল। কৃষ্ণ-যাত্রার দুইটি পাত্র আনিয়া কৌতুকরসের বৃদ্ধি করা হইল—নারদমুনি এবং তাঁহার চেলা বাসদেব অর্থাৎ ব্যাসদেব। নারদ ও বাসদেবের সংলাপে জমানো কৌতুকরসে গ্রাম্যতা ছিল না। ইহাতে অল্প ভাঁড়ামির আবরণে প্রচুর ভক্তিরসের পূর থাকায় সাধারণ শ্রোতার প্রীতিকর হইয়াছিল।

কৃষ্ণ-যাত্রার মধ্যে কালিয়দমনের পালা বেশি প্রচলিত ছিল বলিয়া একদা কৃষ্ণ-যাত্রার নামান্তর হয় কালিয়দমন-যাত্রা বা শুধু কালিয়দমন।

পাঞ্চালীর ও কীর্তনের প্রভাবমণ্ডিত কৃষ্ণ-যাত্রা—কালিয়দমন ও রাস—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে পশ্চিমবঙ্গে খুব চলিত হয়। এই সময়ে শ্রীদাম ও সুবল দুই ভাই এবং পরমানন্দ অধিকারী কৃষ্ণ-যাত্রার অধিকারী রূপে অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পরে বাঁধা যাত্রা-পালার সৃষ্টি হয়। বাঁধা যাত্রাপালায় যাঁহারা প্রথম খ্যাতি লাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হইতেছেন পশ্চিমবঙ্গে গোবিন্দ অধিকারী ও তাঁহার শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এবং মধ্যবঙ্গে কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

ইংরেজ বণিক্-রাজশক্তির রাজধানী কলিকাতা অঞ্চলে ভদ্র বাঙ্গালী-সমাজের রুচি এ সময়ে অন্য রকম হইয়া আসিতেছিল। তাই এ অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রার স্থান হইল বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা। এ যাত্রার প্রসিদ্ধতম অধিকারী ছিল গোপাল উড়ে। ইংরেজী শিক্ষা ভদ্রসমাজে কতকটা প্রসার না পাওয়া পর্যন্ত বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে শিক্ষিত লোকের রুচিপরিবর্তনের জন্য এবং বিলাতী ষ্টেজ গড়িয়া উঠিয়া তাহাতে সংস্কৃত ও ইংরেজী আদর্শে নাটক-অভিনয়-প্রবর্তনের ফলে পুরানো পদ্ধতির পাঞ্চালী ও কীর্তন-অনুপ্রাণিত যাত্রা-গান কলিকাতা অঞ্চলে দ্রুত পসার হারাইতে থাকে। তাহার পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল রায় প্রমুখ সুকণ্ঠ গায়ক ও অধিকারীর প্রচেষ্টায় ইংরেজী আদর্শের নাটকের সঙ্গে কথকতার ধরণের বক্তৃতা এবং পুরানো যাত্রা ও নূতন পাঁচালী-পদ্ধতির ভক্তিরসপূর্ণ গান যুক্ত হইয়া "গীতাভিনয়" নামে নূতন যাত্রা-পদ্ধতির সৃষ্টি হইল। এখন সে গীতাভিনয়ের ধারাও লোপোন্মুখ।

হেঁয়ালী-ছড়ায় উত্তরপ্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়া লোকরঞ্জনের প্রচেষ্টা বাঙ্গালা দেশে অন্তত হাজার বছর আগেও প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত ভাষার প্রচলন-সময়ে এই ধরণের ছড়া প্রায়ই "আর্যা" ছন্দে লেখা হইত বলিয়া আর্যা নাম পায়। পরে নামটি আরবী "তর্‌জা"র সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, "আর্যা-তরজা পড়ে সভে বৈষ্ণব দেখিয়া।" "তর্‌জা" বা ছড়ার নিদর্শন যাহা ষোড়শ শতাব্দীতে পাই, তাহা সাধারণত আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক ছড়া ও গান। শিবের চড়ক-পূজায় এবং ধর্মঠাকুরের গাজনে এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক তর্‌জায় মূল-সন্ন্যাসী ও "ভক্তিয়া"দের মধ্যে

"বাকোবাক্য" এখনও শোনা যায়। চৈতন্যের শেষদশায় অদ্বৈত আচার্য তাঁহাকে এই রকম তর্জা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ঃ

বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।

এই তর্জাটি পড়িয়া চৈতন্য গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

মহাযোগেশ্বর আচার্য তর্জাতে সমর্থ
আমিহ না জানি তাঁর তর্জার অর্থ।

গণিতের ছড়ায় "আর্যা" নামটি পুরানো অর্থে চলিয়া আসিয়াছে। ছাত্রদের ব্যবহারিক গণিত শিখাইবার উদ্দেশ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরূপ বহু আর্যা রচিত হইয়াছিল। শুভঙ্কর দাসের নামিত কতকগুলি আর্যার ভাষায় প্রাচীনত্বের চিহ্ন বেশ আছে। যেমন

পণ শশী পঞ্চম শর গজ বাণ
নবহু নবগ্রহ রস বসু মান।
অষ্টাদশ পণ বুড়্‌ডহু দিজ্‌জে
আজু বিষম খড়ি দিবহু কিজ্‌জে।

এমনতর আর্যার ইতিহাস খুব প্রাচীন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে, কীর্তন-গান ব্যতিরেকে, অধ্যাত্ম ও প্রণয়-ঘটিত বৈঠকি গানের বিশেষ চলন হইয়াছিল। এই সময়ে শান্তিপুর অঞ্চলে গ্রাম্যভাষায় রচিত ও টপ্পার সুরে গীত একধরণের নিতান্ত আদিরসাত্মক গানের বেশ চলন ছিল। প্রথমে এরকম গান মেয়েলি আচার-উৎসবে গেয় ছিল, তাই নাম হইয়াছিল "খেড়ু" (পরে "খেউড়")। তর্জার মত খেউড়েও সওয়ালজবাব চলিত। ভারতচন্দ্রের সময়ে নদীয়া অঞ্চলে এই গানের বিশেষ সমাদর হইয়াছিল। পরবর্তী কালে চুঁচুড়ায় ও তথা হইতে কলিকাতায় ইহার আমদানি হয়। কলিকাতায় নবকৃষ্ণ দেব ও তাঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণ সঙ্গীতকলার চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন। নবকৃষ্ণের সভাসদ্ কুলুইচন্দ্র সেন খেউড় গানকে

শুদ্ধতর করিয়া এবং তাহাতে নানাবিধ রাগরাগিণী লাগাইয়া ও বহুবিধ যন্ত্রাদির প্রয়োগ করিয়া ইহাকে "আখড়াই" অর্থাৎ আখড়ার (আড্ডাঘরের) উপযোগী ওস্তাদি গানে পরিণত করেন। সেকালের বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা এবং কুলুইচন্দ্রের নিকট-আত্মীয় রামনিধি গুপ্ত (১১৪৮-১২৪৫)—যিনি নিধুবাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন—এই কার্যে তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত নিধুবাবুর প্রণয়গীতিগুলি তখনকার দিনের লোকের সাহিত্যরুচিকে খানিকটা উন্নত করিতে সহায়তা করিয়াছিল। আখড়াই-গানের আয়োজন কষ্টসাধ্য। সুরের ও রাগের পারিপাট্য ও বাদ্যের বাহুল্য ইহার অপরিহার্য অঙ্গ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীদাম দাস, রামপ্রসাদ ঠাকুর, নসীরাম সেকরা প্রভৃতি পেশাদার গায়ক আখড়াই-গানে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আখড়াই-গানে সওয়ালজবাব বা বাদ-প্রতিবাদ ছিল না। যে ব্যক্তি বা যে দল গীতবাদ্যে আপেক্ষিক উৎকর্ষ দেখাইত তাহারই জয়লাভ হইত।

কষ্টসাধ্য আখড়াই-গান ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে পূর্বাপরপ্রচলিত প্রতিযোগিতামূলক তর্‌জা গানের এবং নূতন পাঁচালীর পসার বাড়িতে লাগিল। তর্‌জা গানে প্রথমে কবিতা আবৃত্তি করা হইত বলিয়া ইহা "কবি-গান" নাম পায়। কবিতা বাঁধা গতের মত হইলে বলিত "দাঁড়া কবি-গান", অর্থাৎ যে কবি-গানে পূর্বে-বাঁধা কবিতা আবৃত্তি বা গান গাওয়া হইত। আর কবিতা বা গান সঙ্গে সঙ্গে রচনা করা হইলে হইত বিশুদ্ধ কবি-গান। পুরানো ধরণের কবি-গানে প্রথম দলের গায়ক আসরে আসিয়া প্রথমে গুরুবন্দনা ও দেবদেবীবন্দনা গাহিত। দ্বিতীয় দলের গায়ক ইহার উত্তরে গুরুবন্দনা ও দেবদেবীবন্দনা গাহিয়া গেলে প্রথম গায়ক আসরে আসিয়া সখীসংবাদ গাহিত। দ্বিতীয় গায়ক তাহার উত্তর দিত। তাহার পর বিরহ এবং সর্বশেষে খেউড় গাহিয়া শেষ হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবি-গান ও তর্‌জার মিলনে নূতন কবি-গানের সৃষ্টি হইল। ইহাও "দাঁড়া কবি"—অর্থাৎ বাঁধা বিষয়ের গান বা ছড়া লইয়া দুই দলে উত্তরপ্রত্যুত্তর বা বাদপ্রতিবাদমূলক সঙ্গীত, বাজনা শুধু ঢোল আর কাঁসি। প্রথম দলের কবি-গায়ক গানের মধ্য দিয়া প্রশ্ন চাপাইলে দ্বিতীয় দলের কবি-গায়ক তাঁহার গানের দ্বারা সেই "চাপান"এর "উতোর" গাহিয়া নূতন "চাপান" দিবেন। প্রথম গায়ককে সেই চাপানের "উতোর" গাহিয়া নূতন "চাপান" দিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত যে গায়ক নিরুত্তর হইবে তাহারই পরাজয়।

আখড়াই-গানের বিষয়বস্তু প্রধানত প্রণয়ঘটিত। দাঁড়া কবির বিষয়বস্তু পৌরাণিক কাহিনীমূলক অথবা প্রণয়ঘটিত কিংবা উপস্থিত ব্যাপারবিষয়ক—সব কিছুই হইতে পারিত। কবি-গান রচনা করিয়া অথবা গাহিয়া যাঁহারা তখনকার কালে নাম করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন হরেকৃষ্ণ দীঘড়ী, রাম বসু, আন্টুনী ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা ইত্যাদি। লালু-নন্দলাল নামে প্রসিদ্ধ দুই ভাই, লালচন্দ্র ও নন্দলাল, এ ধারার প্রবর্তক। ইঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কবি-গানের রীতি লোপ পাইতে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে এখনো যে "নেটো" (বা "লেটো") গান প্রচলিত আছে তাহা সুপ্রাচীন "নাটুয়া" নাচ-গান-অভিনয়ের ধারাবাহিক পরিণতি হইলেও অশিক্ষিত-সমাজের রুচিবিকৃতির ফলে শিক্ষিত-সমাজের উপেক্ষিত এবং সেইজন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

আগে বলা হইয়াছে যে পাঞ্চালী-গান খুব প্রাচীন। পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সকল কাব্যই পাঞ্চালীর ঢঙে—এবং মন্দিরা-চামর-সংযোগে—গাওয়া হইত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, কাশীরামের পাণ্ডববিজয়, রূপরাম প্রভৃতি কবির ধর্মমঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি সকল কাব্য ছিল পাঞ্চালী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাঞ্চালীর রূপান্তর শুরু হইয়াছিল। ভক্তিরসের সঙ্গে হাস্যরসের প্রবাহ যুক্ত হইতে লাগিল, এবং সেজন্য নূতন ধরণের পালা রচিত হইতে লাগিল। শুধু পৌরাণিক কাহিনী নয়, আধুনিক কাহিনীও ইহাতে গৃহীত হইতে লাগিল। গান ও ছড়া (আবৃত্তিযোগ্য অংশ স্বতন্ত্র হইলে এবং রচনার আয়তন খুব ছোট হইলে) ইহাই নূতন "পাঁচালী"।

এই নূতন পাঁচালী-রচয়িতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাশরথি রায় (১২১২-১২৬৪)। ইঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার কাছে বাঁদমুড়া গ্রামে। মাতুলালয় ছিল ঐ জেলায়ই কালনার নিকটে পীলা গ্রামে। সেইখানেই কবি বাস করিতেন। ব্রাহ্মণসন্তান দাশরথি অল্পবয়সেই এক অনুন্নতশ্রেণীর কবি-গায়িকার দলে যোগ দিয়াছিলেন। সেইখানেই ইঁহার কবিজীবনের প্রস্তুতি। দাশরথির হাতে পাঁচালী নূতন ও

স্পষ্ট রূপ পাইল। ইহাতে থাকিত ছড়া ও গান। দাশরথির ছড়া-গানের অনুপ্রাস-ঝঙ্কার ও সুরমাধুর্য সাধারণ অসাধারণ সব শ্রোতাকেই মাতহিয়া তুলিত। পল্লী অঞ্চলে পথেঘাটে এখনও দাশরথির গান শোনা যায়।

পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে দেশি ও বাউল গানের ছাঁদ মিলাইয়া এক নূতন কীর্তনপদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন যশোর-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মধুকণ্ঠ গায়ক মধু (সূদন) কান। এপদ্ধতি "ঢপ কীর্তন" নামে প্রসিদ্ধ।

পদাবলী-কীর্তনকে যাত্রার ছাঁচেও ঢালা হইল। তাহার নাম "কৃষ্ণযাত্রা"। পশ্চিমবঙ্গের গোবিন্দ অধিকারী ও মধ্যবঙ্গের কৃষ্ণকমল গোস্বামী কৃষ্ণযাত্রার প্রথম ও প্রধান গায়ক-কবিদের অগ্রগণ্য। গোবিন্দের শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে কৃষ্ণযাত্রার প্রধান গায়ক-কবি ছিলেন।

আখড়াই-গান নষ্টপ্রায় হইলে তাহাকে ভাঙ্গিয়া সহজসাধ্য করিয়া নূতন এক ঢঙের সৃষ্টি করিলেন বৃদ্ধ নিধুবাবুর সাহায্যে তাঁহারই এক শিষ্য মোহনচাঁদ বসু। আখড়াইএর তুলনায় এই ঢঙ অধিকতর বাহুল্যবর্জিত ও সহজসাধ্য বলিয়া ইহার নাম হইল "হাফ-আখড়াই"। হাফ-আখড়াই গানে সুরের ও রাগের পারিপাট্য কম, তাল হালকা, যন্ত্রের সংখ্যাও কম। (আখড়াইয়ে প্রায় বিশ বাইশ রকম যন্ত্র বাজানো হইত।) হাফ-আখড়াইয়ে উত্তরপ্রত্যুত্তর ও বাদপ্রতিবাদ কখনো কখনো থাকিত, তবে কবি-গানের মত মুখ্যভাবে নয়। তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত হাফ-আখড়াই গান টিকিয়া থাকে নাই।

পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করিয়া ময়মনসিংহ অঞ্চলে নাটগীতের পালায় সাধারণ নরনারীর প্রণয়কাহিনীর সমাদর বেশি ছিল। ইহার একটা বড় কারণ হইতেছে যে এই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির চর্চায় স্থানীয় ধনী মুসলমানদেরও আনুকূল্য ছিল। আরাকানের কবিরা যেমন হিন্দী-ফারসী হইতে প্রণয়গাথার চলন করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই অনুসরণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকটি ভালো প্রণয় গাথা পাইতেছি। এ গাথাগুলির আধুনিক সংস্করণ চন্দ্রকুমার দে সঙ্কলিত ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় সঙ্কলিত হইয়াছে। কোন কোন গাথার অসংস্কৃত ও আরবী-ফারসীবহুল রূপান্তর আগেই সস্তা ছাপাখানা হইতে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সাধারণ পাঠকের নজরে পড়ে নাই।

গাথাগুলির মধ্যে সব চেয়ে ভালো হইল 'বাদ্যানী'র (অর্থাৎ) বেদেনীর গাথাটি। সস্তা ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত পুস্তিকায় ইহার নাম 'মেওয়াসুন্দরীর কেচ্ছা' আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মৈমনসিংহগীতিকায় 'মহুয়া'।

গল্পটি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

দুই ভাই বেদে ছিল গারো পাহাড়ের বাসিন্দা। তাহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বাজি দেখায় আর সুযোগ পাইলে চুরি-ডাকাতিও করে। একবার তাহারা এক গ্রামে কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে বাজি দেখাইতেছিল। সেই ব্রাহ্মণের একটি ফুটফুটে সুন্দরী নিতান্ত শিশুকন্যা ছিল। তাহাকে দেখিয়া বড় বেদের লোভ হইল। তাহার সন্তান নাই, মেয়েটিকে সে নিজের মেয়ের মত মানুষ করিবে।

ফুলের থাক্যা নরম রে কন্যা তারা হইতে সুন্দরী
রাত্রনিশা কালে রে বাদ্যা কন্যা কর্‌ল চুরি।

মেয়েটিকে চুরি করিয়া বেদেরা রাতারাতি সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বড় বেদের স্ত্রী মেয়েটিকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার নাম রাখিল মেওয়াসুন্দরী।

মেওয়া মিশ্রি বড়ই মিঠা সুখের সীমা নাই
মেওয়ারে পাইয়া গেল সকল বালাই।

মেওয়া বড় হইল, তাহার সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিল। সে বেদের বাজি নাচ গান সব শিখিল। বেদের ভাবনা হইল, এমন মেয়েকে আমি কার হাতে দিব, আর ইহাকে পরের ঘরে পাঠাইয়া বাঁচিবই বা কি করিয়া।

কিছু দিন পরে দল বল লইয়া বেদেরা বিদেশে বাজি দেখাইয়া রোজগার করিতে চলিল।

শিকারী কুকুর লৈল শেয়াল সেজা[১] ধরে
ধুমধরাক্কা কৈরা চল্লো তাম্‌সা করিবারে।
খঞ্জনের চাইলে চলে মেওয়া না সুন্দরী
পালং-সই[২] তার লগে যায় গলায় গলায় ধরি।

---

১ খরগোস। ২ পালনসখী। যাহার সহিত এক সঙ্গে মানুষ হইয়াছিল সে।

নানান জায়গা ঘুইরা ঘুইরা দুইমাস কাটাইল
বামুনকান্দা গ্রামে গিয়া তাম্বু ফালাইল।

সে গ্রামের তালুকদার তরুর নদ্যার-চান্দ। গ্রামে বাজি দেখাইতে বেদে আসিয়াছে শুনিয়া নদ্যার-চান্দ মাকে গিয়া বলিল

শুন শুন মা জননী কৈবাম তোমার ঠাঁই
নতুন একদল বাদ্যা আইছে তাম্‌সা দেখতাম যাই।
তুমি যদি কও মাগো ডাকাইয়া আনাই
দশ জনে দেখ্যা যাউক তামসা করাই।

বাজির আসর বসিল। বেদেরা নানা রকম বাজি করিতে লাগিল। সে দিকে নদ্যার-চান্দের মন লাগিল না।

নদ্যা-ঠাকুর চাইয়া রৈছে বাদ্যা ছেঁড়ির পাই[১]
এই না কন্যা তাম্‌সা করুক আর কিছু না চাই।

মেওয়া যখন বাজি দেখাইতে দেখাইতে গান ধরিল তখন নদ্যার-চান্দের মনে ভারি স্ফূর্তি।

যখন নাকি বাদ্যা ছেঁড়ি বাঁশে মাইল নাড়া[২]
বস্যা আছিল নদ্যা-ঠাকুর উঠ্যা হৈল খাড়া।

খেলা দেখাইয়া যখন বেদেরা বক্‌শিশ চাহিল নদ্যার-চান্দ তাহাদের

শাল দিল কাপড় দিল আর দিল টাকা কড়ি
কেমুন জানি চাইয়া রৈল সেই না বাদ্যার ছেঁড়ি।

বেদে-কন্যার সঙ্গে নদ্যার-চান্দের যেন চোখে চোখে কথা হইল। নদ্যারচান্দ বলিল

ডাইল দিবাম চাউল দিবাম রান্ধ্যা বাড়্যা খাইও
নলের মলুয়া[৩] দিলাম শুইয়া নিদ্রা যাইও।

এই সুযোগে বড় বেদে বলিল, যদি একটু জায়গা দেন তো এখানেই ঘরবাড়ি করিয়া রহিয়া যাই। নদ্যার-চান্দ তৎক্ষণাৎ রাজি হইল। বেদেরা

---

১ বেদে ছুঁড়ীর প্রতি। ২ বাঁশে নাড়া দিল। ৩ নল-খাগড়ার মাদুর।

সেখানে ঘর বান্ধিল, চারি পাশে ক্ষেত খামার করিল। সেখানে তাহারা স্বচ্ছন্দে রহিল।

পথে ঘাটে নদ্যার-চান্দের সঙ্গে বেদে-মেয়ের দেখা হইতে লাগিল। নদ্যার-চান্দ তাহাকে প্রেম নিবেদন করে। এইভাবে বেদে-মেয়ের মনে ভালোবাসার সঞ্চার হইল। এদিকে বেদেদের মন ঘর ছাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য উচাটন হইয়াছে। নদ্যার-চান্দের ভাবগতিকও তাহাদের ভালো লাগে নাই। বড় বেদের ইচ্ছা ছিল তাহার পালিত পুত্র সুজনের সঙ্গে মেওয়ার বিবাহ দেয়। তাই কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন রাতারাতি বেদেরা ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে নদ্যার-চান্দ তাহাদের খালি ঘরবাড়ি দেখিয়া পাগলের মত হইয়া গেল। একদিন নিশাকালে সেও বাড়ি ছাড়িয়া পলাইল বেদেমেয়ের খোঁজে। পথে পথে বহু দিন ঘুরিয়া অবশেষে সে একদিন সন্ধ্যায় এক বাড়িতে অতিথি হইয়া মেওয়ার দেখা পাইল। নদ্যার-চান্দের বিরহে মেওয়াও মলিন ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। নদ্যার-চান্দকে দেখিয়া যেন সে নবজীবন লাভ করিল। ইহাতে বড় বেদের সন্দেহ জন্মিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে এই ভিনদেশী অতিথি নদ্যার-চান্দ তাহার মেয়েকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবে। গভীর রাত্রিতে নিদ্রিত কন্যাকে জাগাইয়া তাহার হাতে বিষমাখা ছুরি দিয়া বেদে হুকুম করিল

এই না ছুরি লৈয়া যাও ঐ না নদীর পাড়ে
ঘুমাইয়াছে নদ্যা-ঠাকুর মইরা আইস তারে।

মেওয়া নদ্যার-চান্দের কাছে আসিয়া সব কথা জানাইয়া বলিল, এখনি পলাও,

পলাইয়া যাও বন্ধু আপনার ঘরে
ভাবিও না অনাথিনী বাদ্যা ছেঁড়ির তরে।

নদ্যার-চান্দ বলিল, তোমাকে ছাড়িয়া আমি যাইব না। ঐ দেখ আমার তাজি ঘোড়া। চল দুজনেই পালাই। তখন দুইজনে পলাইল।

কিছু দূর গিয়া সামনে পড়িল নদী। তখন নদী পার হইবার জন্য ঘোড়া ছাড়িয়া তাহারা এক সদাগরের নায়ে চড়িল। বেদে মেয়েকে দেখিয়া

সদাগরের লোভ হইল। পাহাড়ে-নদীর বাঁকে বাঁকে ঘুরিবার সময়ে অবসর বুঝিয়া সে মাল্লাদের দিয়া নদ্যার-চান্দকে জলে ফেলিয়া দিল। মেওয়া তখন পাগলের মত হইয়া গেল। সদাগর তাহাকে কিছুতেই বশ করিতে পারিল না। শেষে তাহার হাত হইতে নিস্তারের উপায়ন্তর না দেখিয়া মেওয়া ছলনাময়ী সাজিল। সদাগরকে ভুলাইয়া সে তাহাকে ও মাঝি-মাল্লাদের ওষুধ দেওয়া পান খাওয়াইয়া অচেতন করিয়া দিল। তাহার পর কুড়াল দিয়া নৌকার তলা ফুটা করিয়া দিয়া সে জলে ঝাঁপ দিল।

তীরে উঠিয়া বেদের মেয়ে নদ্যার-চান্দকে খুঁজিয়া ফিরিল। লোকালয় খোঁজা শেষ হইলে সে অরণ্যে ঢুকিল। বন মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে সে বিকাল বেলায় এক ভাঙ্গা মন্দির দেখিল। মন্দিরের কাছে গিয়া দেখে, সেখানে এক মানুষের দেহ পড়িয়া, অনেক দিনের মরা। সে দেহ সর্পদংশনে মৃত নদ্যার-চান্দের। দেহ লইয়া কন্যা হাহুতাশ করিল। মুখে জলের ঝাপ্টা দিল, লতাপাতা আনিয়া রস বাহির করিয়া মুখে ঢালিল। কোনো ফল হইল না। সকালে সে এক সন্ন্যাসীর দেখা পাইল। সন্ন্যাসীকে সে আত্মপরিচয় দিল না, শুধু বলিল, আমার স্বামী সাপের কামড়ে মারা গিয়াছে। সন্ন্যাসী অনেক যত্নে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করাইল। তাহার পর কয়েকদিন ধরিয়া পুনর্জীবিতের শুশ্রূষা চলিল। যেদিন নদ্যার-চান্দ ভাত খাইতে চাহিল সেদিন মেওয়ার অপার আনন্দ।

চাউলের খুদ লবণ ভিক্ষা কৈরা আনি
রান্ধিয়া খাওয়াইল কন্যা বাঁচাইল পরানি।
মনের গৌরবে কন্যা শুইয়া নিদ্রা যায়
তুলিয়া আনন্দের পাল রজনী পোহায়।

মনের সুখ ফিরিয়া আসিতে মেওয়ার দেহের সৌন্দর্যও যেন নূতন করিয়া ফুটিল। এখন তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া সন্ন্যাসীর লোভ জন্মিল। একদিন সে মনের কথা মেওয়াকে বলিয়া ফেলিল। চতুর মেওয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া রাখিল। তাহার পর নদ্যার-চান্দের চিকিৎসা শেষ হইলে সে গভীর রাত্রিতে নদ্যার-চান্দের

কাঠিসারা দেহখানি পিঠে বান্ধ্যা নিল
সন্ন্যাসীর দুয়ারেতে শিকল লাগাইল।

পলাইয়া যায় কন্যা পিছে নাহি চায়
বন ছাড়্যা নিশাকালে দুই জনে পলায়।

নদ্যার-চান্দ ও মেওয়া পরম আনন্দে ছয় মাস বনবাসে রহিল। নদ্যার-চান্দ মেওয়াকে বেদের মেয়ে বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না। তাহার পরিচয় জানিতে চায়। অনেক সাধিবার পর মেওয়া বলিল, আমি পালং-সইয়ের কাছে শুনিয়াছি যে আমার বাবার নাম জনার্দন ঠাকুর। বেদে আমাকে ছয় মাস বয়সে চুরি করিয়া আনিয়াছিল।

পরের দিন সকালে মেওয়া পালং-সইয়ের বাঁশীর সঙ্কেত শুনিয়া বুঝিল, বেদের দল শিকারী কুকুর তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়াছে। কিন্তু তখন আর পলাইবার পথ নাই। দুই জনেই ধরা পড়িল। বেদে আবার মেওয়াকে বিষ মাখানো ছুরি দিয়া নদ্যার-চান্দকে মারিয়া ফেলিতে বলিল

বাঘের ঘরে চুরি কৈরা জাইত খোয়াইল মোর
ছুরিটা মারিয়া আয় বুকের উপর।
আমার পালক-পুত সুজন খেলোয়ার
তোমারেত দিবাম বিয়া সহিতে তাহার।

বেদে হাত বাড়াইয়া ছুরি দিল, মেওয়া তাহা লইল, এবং নদ্যার-চান্দের কাছে আগাইয়া গিয়া সেই ছুরি নিজের বুকে বসাইয়া দিল। কি করিলে, কি করিলে—বলিয়া নদ্যার চান্দ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। অমনি বেদেরা তাহার উপর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। মেওয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া নদ্যার-চান্দ সেইখানেই দেহত্যাগ করিল। এতক্ষণ

মুখ ফিরাইয়াছিল বাদ্যার সর্দার
চাহিয়া দেখিয়া পরে করে হাহাকার।

যখন আর উপায় নাই তখন তাহার মনে এই কথাই জাগিতে লাগিল

বাড়ি ঘর রাজ্যপাট সকল ছাড়্যা দিয়া
নদ্যা-ঠাকুর পাগল হৈল মেওয়ার লাগিয়া।
দুইজনেরে মিলাইয়া দিয়া দেখ্‌তাম যদি চাইয়া
আমার জামাই হৈত আমার থাক্‌ত মাইয়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতাব্দী

১। গদ্যের উপক্রম

অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে দুই-একখানি আইনের বই বাঙ্গালায় লেখা হইয়াছিল। এইসব বই সাহিত্যের মধ্যে পড়ে না। এগুলির ভাষা দলিলপত্রের মতই আরবী-ফারসী শব্দে পূর্ণ। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের রীতিমত ব্যবহার শুরু হইল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর হইতে। বিলাত হইতে সদ্য আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান কর্মচারিগণের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইল। কলেজে প্রাচ্যভাষা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন শ্রীরামপুরের মিশনারি পাদরি উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪)। অল্পকাল পরে এই বিভাগে কেরির সহকারী কয়েকজন পণ্ডিত ও মুন্‌শি নিযুক্ত হন। তখন হইতেই কলেজের প্রকৃত কার্যারম্ভ।

সিভিলিয়ানদের বাঙ্গালা পড়াইতে গিয়া দেখা গেল যে, প্রচলিত বাঙ্গালা গ্রন্থ সবই পদ্যে। ইঁহাদের প্রয়োজন ব্যবহারোপযোগী ভাষা শিক্ষা, সুতরাং গদ্য-পুস্তকই তাহাদের উপযুক্ত পাঠ্য। অতএব কেরি তাঁহার সহকারীদের দিয়া বাঙ্গালা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক লেখাইতে লাগিলেন এবং নিজেও একটি ব্যাকরণ, একখানি অভিধান, একটি কথোপকথনের বই, এবং আর একখানি গল্পের বই সংকলন করিলেন। কলেজের কার্যারম্ভের প্রথম বৎসরেই (১৮০১) কেরির ব্যাকরণ ও কথোপকথন, রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং গোলোক শর্মার হিতোপদেশ প্রকাশিত হয়। রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা প্রথম মৌলিক (অর্থাৎ যাহা অনুবাদ নহে) বাঙ্গালা গদ্য-গ্রন্থ। ইহার পূর্বে পোর্তুগীস্ পাদরিরা যে সকল গদ্য-রচনা বাহির করিয়াছিলেন সে সবই ইংরেজী (অর্থাৎ রোমান) অক্ষরে মুদ্রিত। কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যে তিনখানি আইনের অনুবাদ বাহির হইয়াছিল এবং ১৮০০-১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের যেটুকু অনুবাদ শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই প্রথম বাঙ্গালা ছাপা বই।

রামরাম বসুর অপর গদ্যগ্রন্থ 'লিপিমালা' বাহির হয় পর বৎসরে (১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে)। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর 'তোতা ইতিহাস' রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্', এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন'।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে বাঙ্গালা গদ্য রচনায় সর্বাপেক্ষা দক্ষ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (মৃত্যু ১৮১৯)। ইনি সংস্কৃতে বড় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাকে কেরির দক্ষিণহস্ত বলা যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলায়। তখন এই অঞ্চল উড়িষ্যার মধ্যে গণ্য ছিল। মৃত্যুঞ্জয় কয়েকখানি বাঙ্গালা গদ্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রাজাবলি (১৮০৮) এবং প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩) উল্লেখযোগ্য। রাজাবলি দেশী লোকের লেখা প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাস। প্রবোধচন্দ্রিকা যখন বাহির হয় তাহার অনেককাল আগেই, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হইয়াছিল। বইখানি অনেকদিন ধরিয়া, এমন কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অবশ্যপাঠ্যরূপে নির্ধারিত ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অন্য পুস্তকগুলিও কলিকাতায় (হিন্দু কলেজ ১৮১৭) ও পরে অন্যত্র কলেজের পাঠ্য পুস্তক রূপে চলিত।

কেরি, মার্শম্যান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ধর্ম-ও শিক্ষা-প্রচারকগণ নিজেরা লিখিয়া অথবা পণ্ডিতদের দিয়া লেখাইয়া লইয়া বিভিন্ন বিষয়ে বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই কার্যে বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত লোকেরাও অনতিবিলম্বে যোগ দিলেন। ইউরোপীয়দের উদ্যোগে যে গদ্যরীতি সৃষ্টি হইল তাহাতে সংস্কৃত শব্দের ভাগ খুব বেশি। তাহার প্রধান কারণ হইল এই, যাঁহারা এই গদ্য লিখিয়াছিলেন তাঁহারা সংস্কৃত ভালো করিয়া জানিতেন এবং তাঁহারা মনে করিতেন যে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা, সুতরাং দুহিতাকে যতদূর সম্ভব মাতার অনুশাসনে চলিতে হইবে। তখনকার দিনে বাঙ্গালা গদ্যের ব্যবহার ব্যক্তিগত ও ব্যবসায় ঘটিত চিঠিপত্রে, জমি বিক্রয় ও বন্ধক ইত্যাদি দলিলে, আদালতের আরজিতে ও নথিপত্রে পর্যবসিত ছিল। সে গদ্য ছিল অত্যন্ত কাজের ভাষা, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতের ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য হাট-বাজারের ভাষা। সে ভাষায় না ছিল বিশুদ্ধি না ছিল সুষমা। এত বেশী ফারসী আরবী শব্দ থাকিত যে ভাষাকে মিশ্র ভাষা বলিলে অন্যায় হয় না। একটু নমুনা দিতেছি, আর্জির।

গরিব পরওর[1] সলামত (।)[2] আমার ও আমার বড় ভ্রাতা হরিশচন্দ্র রায়ের ঠাকুর সেবার দেবোত্তর ও পেট ভাতা এ সকল লাখেরাজ জমিন চাকলে বোদা ওগয়রহ[3] মতালকে[4] জিম্বে থানে বেহার আছে (।) তাহাতে সন ১১৯০ বাঙ্গলাতে আজরাহে জবরদস্তী[5] সর্বানন্দ অধিকারী থানে বেহারের মহারানীর উসিলাতে[5] আপনে ও অন্য দ্বারায় আমার দিগেক বেদখল করিয়া মোতসরফ[6] হয়(।) এ জন্যে হুজুরে আরজী গুজরাইয়াছিলাওঁ[7] (।) তাহাতে সন ১৭৮৮ ইসবিতে[8] আমারদিগের আরজীতে করমবকশি ফরমাইয়া[9] মেস্তর[10] মেরসর সাহেব ও মেস্তর যুবিট সাহেব নামে তজবিজে[11] হুকুম হইয়াছিল (।) হুজুরের হুকুম মতে সাহেব মউযুফ[12] মোকদ্দমা তজবিজ করিয়া হুজুরে রেপোর্ট[13] করিয়াছেন (।) আমি তজবিজের ওক্তে সাহেব মউষুফ নিকট আপন হকের[14] ইসরাত[15] পহুছাইয়াছি তত্রাচ অদ্যাবধি আপন হকেক পহুছিতেছিনা (।) ইহার সহিত তুলনা করা যায় নূতন গদ্যের সরকারি ব্যবহারের নমুনা।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা 'কর্ণওয়ালিস কোড্' অর্থাৎ লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত আইনের অনুবাদের একটু অংশ "৩০ ধারা" উদ্ধৃত করিতেছি।

> কোনো মহল্লায় ডাকাতি ও চোর ও অপর দুষ্ট লোক লুকাইয়া থাকিলে কিম্বা বসতী করিলে সে সংবাদ তথাকার দারোগা অতি ত্বরাতে পাইবার কারণ প্রতি মহল্লায় এক ২ মহল্লাদার ও মহল্লাদারাণী মোকরর হইবেক। এবং তাহারা দারোগার হুকুমের নীচে রহিয়া যে ডাকাইত ও চোর এবং যে দুষ্ট লোক সেই মহল্লায় থাকে তাহার সমাচার অব্যাজে দারোগাকে দিবেক ইতি।

২. রামমোহন রায় ও নবজাগরণ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকেরা যে গদ্যরীতির সৃষ্টি করিলেন সে গদ্যরীতি পাঠ্য পুস্তকে বিধৃত হইয়া রহিল। পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে যিনি

---

১ পালক। ২ বহু সেলাম। ৩ ইত্যাদি। ৪ অধীন। ৫ জবরদস্তিক্রমে। ৫ সহায়তায়। ৬ অধিকারী। ৭ আবেদন পাঠাইয়াছিলাম। ৮ খ্রীষ্টাব্দে। ৯ অনুগ্রহ আদেশ দিয়া। ১০ মিষ্টর। ১১ অনুসন্ধানে। ১২ উক্ত। ১৩ report। ১৪ স্বত্বের। ১৫ প্রমাণ।

বাঙ্গালা ব্যবহারিক গদ্যের সৃষ্টি করিলেন তিনি হইলেন আমাদের দেশে সবদিক দিয়াই আধুনিক চিন্তার অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)।

কেরি প্রভৃতি মিশনারিদের আর এক বড় প্রচেষ্টা ছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা, অর্থাৎ হিন্দুকে খ্রীষ্টান করা। এ কাজে অবশ্য গভর্ণমেন্টের কোনই পোষকতা ছিল না। তবুও দেশের মাতব্বর ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই। জাতিচ্যুতকে আরো কোণঠেসা করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন। রামমোহনই এইভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে খাড়া হইয়াছিলেন। তিনি এ কাজে হিন্দুসমাজের সমর্থন পান নাই। তাহার প্রধান কারণ তাঁহার নিজস্ব ধর্মমত নয়, সে হইল তাঁহার আহারবিহারে গোঁড়ামি পরিহার। রামমোহন আরবী-ফারসী পড়িয়াছিলেন, সে ভাষায় লিখিতেও পারিতেন। অহিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশা তিনি পরিহার করিতেন না, ইউরোপীয়দের সঙ্গেও তিনি তাহাদের সমান হইয়া আচরণ করিতেন। এইসব কারণে গোঁড়া হিন্দু সমাজ তাঁহাকে, উপেক্ষা বলিলে অল্প হয়, বিদ্বেষ করিত, ভয়ও করিত। পরবর্তী কালে অনেক গ্রন্থে রামমোহন রায় কল্কি-অবতার রূপে চিত্রিত হইয়াছিলেন। তবে সমসাময়িক শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বাঙ্গালীরা রামমোহনকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। তাঁহার ক্ষমতা সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী কাহারও সংশয় ছিল না। রামমোহন বুঝিয়াছিলেন যে হিন্দুর ধর্ম সামাজিক ও সাংসারিক আচারবিচার-উৎসবের সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত। তাহার উপর থাকে নানান বর্ণ ভেদ ও জাতি ভেদ। এইসব কারণে, হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রকরণের দ্বারা, মানুষে মানুষে ভেদ ও অনৈক্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাই রামমোহনের বিশেষ চেষ্টা হইল হিন্দুধর্মের সার্বজনিক সনাতন মর্মটিকে ব্যক্তিগত উপাসনায় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে এমন রূপ দিবেন যাহা সকলের গ্রহনীয় হইবে এবং ধর্মের সমভূমিতে কি হিন্দুর কি অহিন্দুর কোন রকম পার্থক্য অথবা জাতি ভেদ থাকিবে না। তাই তিনি বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার পরিবর্তে উপনিষদবেদান্তের প্রতিপাদ্য একমাত্র ঈশ্বর ব্রহ্মকেই শুধু উপাস্য বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি ব্রাহ্মসমাজের পূর্বরূপ 'ব্রহ্মসভা'র প্রতিষ্ঠা (১৮২৮) সম্ভাবিত করিলেন। হিন্দুধর্মের বাহিরে না গিয়া রামমোহন এই যে নবীন একেশ্বরবাদ আবিষ্কার করিলেন তাহাতে পাদরিরা

মনে মনে খুব খুশি হন নাই। তবে তাঁহারা প্রকাশ্যে রামমোহনের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুদের বিপক্ষাচরণে তাঁহাদের সহানুভূতি ছিল।

রামমোহন তাঁহার প্রচারিত একেশ্বরবাদের সূত্রপাত করিয়াছিলেন বাঙ্গালা গদ্যে কয়েকটি ছোটখাট উপনিষদের অনুবাদ করিয়া (—ঈশা, কেন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য—) এবং 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫) লিখিয়া। এই হইল আধুনিক কালে বাঙ্গালা দেশে উপনিষদ পাঠের ও বেদান্ত চর্চার সূত্রপাত। বেদান্তগ্রন্থ শুধুই যে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম বেদান্তকথা তাহাই নয়, ইহা প্রথম গদ্য গ্রন্থ যাহা পাঠ্য পুস্তক নয়, অনুবাদসর্বস্ব নয়, চিন্তাগর্ভ মৌলিক রচনা।

গোঁড়াদের (এবং পাদরিদের) তরফে প্রতিবাদ তুলিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি লিখিলেন 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭)। রামমোহন সমুচিত প্রত্যুত্তর দিলেন 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' পুস্তিকায়। উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পাইয়া মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার প্রতিবাদ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই চুপ করিয়া গেলেন। তাহার পর আরও দুই তিন জন পণ্ডিত—সবাই বেনামিতে—রামমোহনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও রামমোহনের জবাবে নিরুত্তর হইয়াছিলেন।

তাহার পর রামমোহন সমাজসংস্কারের দিকে এবং সেই ফাঁকে ফাঁকে তখনকার দিনে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার দিকে মন দিলেন। তাহার উদ্যমে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হইল (ডিসেম্বর ১৮২৯)। দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহের পক্ষ সমর্থন করিতে ও ইংরেজ শাসনাধীন ভারতীয়দের অধিকার বৃদ্ধির দাবি জানাইতে রামমোহন রায় বিলাতে গেলেন। সেইখানেই তাঁহার দেহত্যাগ হইল (১৮৩২)।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বাঙ্গালা দেশের সকল উন্নতির প্রচেষ্টায় রামমোহনের আগ্রহ ও সহায়তা ছিল। ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। নারীশিক্ষায় তাহার অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম ফারসী ভাষায় সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন (১৮২২)। পত্রটির নাম 'মীরাতুল আখবার'। তাহার একবছর আগে ইংরেজী-বাঙ্গালা দ্বিভাষিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা অংশের নাম 'ব্রাহ্মণসেবধি' (১৮২১)।

রামমোহন ফারসী ও ইংরেজী খুব ভালো করিয়া জানিতেন। বাঙ্গালা রচনার কথা আগে বলিয়াছি। ইংরেজীতে রামমোহন যে বাঙ্গালা

ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন (১৮২৬) তাহাতে তাঁহার মাতৃভাষায় গভীর বোধের পরিচয় আছে। এই ব্যাকরণখানি তিনি বাঙ্গালাতেও অনুবাদ করেন। তাহা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাহির হইয়াছিল (১৮৩৩)। এই বইটি, 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ,' দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দু কলেজে পাঠ্য নির্ধারিত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশের ভাব ও ভাষার সংঘাতে আসিয়া বাঙ্গালীর যে জাগরণ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নূতন উদ্যম দেখা গেল তাহার সংস্কারের দিকটায় অধিনায়ক ছিলেন রামমোহন রায়। উদ্দীপনার ও সাহিত্য গড়িবার দিকটার ভার কোন ব্যক্তির উপর পড়ে নাই। তাহাতে প্রথম উদ্যোগী হইয়াছিল হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা, এবং সবচেয়ে যে ছাত্রেরা বিদ্যাপরায়ণ ছিলেন তাঁহাদের গোড়াকার দলের প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন, দুই অধ্যাপক তরুণ ডিরোজিও ও প্রবীণ রিচার্ডসন। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষকরূপে যোগ দিবার আগে যাঁহারা ছাত্র ছিলেন তাঁহারা ইংরেজী কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু বাঙ্গালা কবিতাকে তুচ্ছ করিতেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ ইংরেজীতে কবিতাও লিখিয়াছিলেন (যেমন কাশীপ্রসাদ ঘোষ)। কিন্তু ডিরোজিওর সংস্পর্শে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে আসিয়াছিলেন তাঁহারা উগ্রভাবে ইংরেজীনবীশ ও বিদেশীপন্থী হইয়াছিলেন। আর ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহারা পরবর্তীকালে বাঙ্গালী মনীষীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭১), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮) ইত্যাদি। প্রথম প্রথম এই "ইয়ং বেঙ্গল"দের মধ্যে অবিনয় ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু সমাজ চিত্তে তখন শুভবুদ্ধি জাগিতেছে। রামমোহনের প্রচেষ্টা, ডেভিড হেয়ারের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, এবং সর্বোপরি শিখিবার ও শিখাইবার—এই আগ্রহ ইয়ং বেঙ্গলের চিন্তায় স্থৈর্য ও আচরণে ধৈর্য আনিয়া দিয়াছিল।

হিন্দু কলেজে (এবং সংস্কৃত কলেজে) প্রাপ্ত শিক্ষা ইঁহাদের জ্ঞানার্জনের স্পৃহা বাড়াইয়া দিয়াছিল। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া জ্ঞানের পরিমাণ ও প্রসার বাড়াইতে ইঁহারা সভা-সমিতি করিতে লাগিলেন। সে সব সভাসমিতি অধিকাংশই ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বড় কথা

নয়, বড় কথা হইল তাহাদের এই ছটফটানি-উদ্যম। অধিকাংশ সভাসমিতি অত্যন্ত ক্ষণজীবী হইয়াছিল। তাহার মধ্যে যেটি কয়েকবছর টিকিয়া কিছু কাজ করিয়াছিল—সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা—তাহার সভাপতি ও মধ্যমণি ছিলেন পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫)।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু কলেজের সর্বোত্তম ছাত্র ছিলেন বলিলে অযথা হইবে না। বহু ভাষা ও নানা বিদ্যার অধিকারী কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ধর্মযাজক পদে বৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষকতা কাজ তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি বিশপ্‌স্‌ কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত যুবকদের শিক্ষার জন্য এই কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে গ্রীক লাটিন হিব্রু ইংরেজী ফরাসী জর্মন ছাড়া তামিল তেলুগু সংস্কৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হইত। কৃষ্ণমোহন প্রথম জীবনে ইংরেজীতে একটি সাময়িকপত্র চালাইয়াছিলেন। ইংরেজীতে তিনি একটি নাটকও লিখিয়াছিলেন, নাম The Persecuted (অর্থাৎ 'নির্যাতিত', ১৮৩১)। নিজেরই অভিজ্ঞতা অবলম্বনে লেখা। আধুনিক কালে ভারতবাসীর লেখা প্রথম নাটক এইখানিই।

কৃষ্ণমোহন সেকালের পক্ষে বাঙ্গালা ভালোই লিখিতেন, তবে তাঁহার ইংরেজী রচনায় স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি ছিল। পাদরিরূপে তিনি যে সব অভিভাষণ দিতেন এবং বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের পঠনীয় পত্রিকায়—অধিকাংশ তাঁহারই সম্পাদিত—যে সব প্রবন্ধ লিখিতেন তাহাতে তাঁহার দক্ষতার পরিচয় আছে। তাঁহার প্রধান কীর্তি হইল তেরো খণ্ডে সঙ্কলিত একটি ইংরেজী বাঙ্গালা দ্বিভাষিক জ্ঞানকোষ, নাম বাঙ্গালায় 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ইংরেজীতে Encyclopædia Bengalensis (১৮৪৬-৫১)। অধিকাংশ নিবন্ধ কৃষ্ণমোহনের রচনা,—ইংরেজী, গ্রীক, লাটিন ইত্যাদি হইতে অনূদিত। অপরের রচনা অল্প স্বল্প আছে। বিদ্যাকল্পদ্রুমে ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান ইত্যাদি তখনকার পাঠ্য অধিকাংশ বিষয়ের নিবন্ধ ছিল। এগুলি পাঠ্যরূপে খুব চলিত। কৃষ্ণমোহনের 'ষড়্‌দর্শন-সংবাদ'ও (১৮৬৭) পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সমাদৃত হইয়াছিল। ইহাতে সংলাপের আকারে হিন্দু দর্শনের আলোচনা আছে।

শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব খ্রীষ্টধর্মের প্রসারে কিছু উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু সে উৎসাহ টিকে নাই।

রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইল। সেই ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের ধার্মিকতা, সরল জীবন, সত্যপরায়ণতা ও স্বদেশপ্রেম শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আধুনিক জীবনের দিক্‌দর্শন করাইল। শিক্ষিত বাঙ্গালী আর স্বধর্মত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিল না।

দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করিলেন (১৮৩৮), তাহার পর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪১)। তাহার পর তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র বাহির করিলেন, 'তত্ত্ববোধিনী প্রত্রিকা' (১৮৪৩)। এই পত্রিকাই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা।

৩. সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের রচিত পাঠ্যপুস্তকের ভাষা দিন দিন বেশি করিয়া সংস্কৃতঘেঁষা হইতে থাকায় তাহার দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতির খুব সাহায্য হইল না। বইগুলির প্রচারও সীমাবদ্ধ ছিল। এ সব বই যাহাদের হাতে পৌঁছিত তাহারাও "খ্রীষ্টানী কাণ্ড" বলিয়া পড়িতে উৎসাহ বোধ করিত না। কিন্তু শ্রীরামপুরের পাদরিদের দ্বারাই শীঘ্র এমন এক বস্তুর সূচনা হইল যাহার জন্য পঠনক্ষম জনসাধারণ গদ্যরচনার প্রতি অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

কেরি ও মার্শম্যানের উদ্যোগে শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইল। প্রথমে এপ্রিল মাসে 'দিগ্‌দর্শন' নামে মাসিকপত্র বাহির হইল। এটি অল্পকাল পরে বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর ২৩শে মে তারিখে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র 'সমাচারদর্পণ' বাহির হইল। পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক। সম্পাদক জন মার্শম্যান নামেমাত্র, আসলে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরাই সমাচারদর্পণ সম্পাদন করিতেন। সমাচারদর্পণ-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে (অল্প কিছুদিন আগেও হইতে পারে), গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 'বাঙ্গাল গেজেটি' (অর্থাৎ বেঙ্গল গেজেট) বাহির করেন। ইহাই পুরাপুরি বাঙ্গালীর উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র। তবে এ পত্রিকাখানির শুধু নামমাত্র জানা আছে।

সমাচারদর্পণের মত সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়াই পঠনক্ষম বাঙ্গালী সর্বপ্রথম গদ্যরচনার রস গ্রহণ করিতে শিখে। তখনকার সাহিত্য বলিতে সবই পদ্য রচনা এবং সে সাহিত্যের বিষয় ধর্মঘটিত ও সর্বজনবিদিত। নূতন বিষয়ের সন্ধানও নূতন কথার রস তাহাতে পাইবার কোন উপায় ছিল না। এখন, অন্যত্র অপ্রাপ্ত সেই নূতন কথার, নূতন খবরের রস বাঙ্গালী পাঠক সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়া পাইল। পাঠকের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং নূতন নূতন সাময়িকপত্রের চাহিদা দেখা দিল। তাহার দ্বারা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ-উন্নতির পথ মুক্ত হইল। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সত্যকার উদ্ভব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদের রচিত পাঠ্যপুস্তকে নয়। তাহার সন্ধান খুঁজিতে হইবে পুরানো সাময়িক পত্রিকাগুলির পাতায়।

সমাচারদর্পণের জনপ্রিয়তার ফলে অচিরে যে সকল সাময়িক ও সংবাদ পত্র দেখা দিল সেগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে সংবাদকৌমুদী (১৮২১) এবং সমাচারচন্দ্রিকা (১৮২২)। রামমোহন রায় সংবাদকৌমুদীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সমাচারদর্পণে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যেসব লেখা থাকিত, সংবাদ-কৌমুদীতে তাহার প্রতিবাদ বাহির হইত।

সমাচারচন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৫৮) কতকগুলি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ভবানীচরণ একদিক দিয়া যেমন তাঁহার হাস্যরসপূর্ণ ব্যঙ্গরচনা দ্বারা কলিকাতার ধনী ব্যক্তিদের অনাচার-কদাচার উদ্‌ঘাটন করিতে ব্যগ্র ছিলেন, অপরদিকে তেমনি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া এবং রামমোহন রায়ের মত প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া রক্ষণশীল সমাজের ঘাঁটি আগলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ভবানীচরণ পদ্য ও গদ্য উভয় রীতিতেই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার লেখার মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই ধারা—প্রাচীন পদ্যবন্ধ এবং আধুনিক গদ্যবন্ধ—উভয়েরই সম্মিলন ঘটিয়াছিল। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে কৌতুকরচনার ইতিহাসে ভবানীচরণের নববাবুবিলাস উল্লেখযোগ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ও নবীন দুই যুগের মধ্যে সেতুসংযোগ করিয়াছিলেন। ইনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্রসেবী সাহিত্যিক। নৈহাটির নিকটে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা বেশি দিন মিলে নাই। নিজের চেষ্টাতে ইনি উত্তমরূপে বাঙ্গালা, চলনসই রকম সংস্কৃত এবং কিছু কিছু ইংরেজী শিখিয়াছিলেন। ১২৩৭ সালের মাঘ মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদপ্রভাকর নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে ইনি আরও কয়েকটি সাময়িকপত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলির কোনটিই সংবাদপ্রভাকরের মত দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। সংবাদপ্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের লেখা ছাড়া তাঁহার ছাত্রস্থানীয় অল্পবয়স্ক লেখকদের রচনা প্রকাশিত হইত। পরবর্তী কালের অনেক বিশিষ্ট লেখক সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় সাহিত্যসৃষ্টিকর্মে শিক্ষানবীশি করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে ইঁহাদের সাহিত্যগুরু ছিলেন, সেকথা ইঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গদ্য লিখিতেন বটে, কিন্তু ইঁহার পদ্যরচনার তুলনায় গদ্যরচনা নীরস ও সৌষ্ঠবহীন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা ছিল, কিন্তু তাঁহার কবিতা আর কিছু না করুক পুরানো কবিতাকে নবীন পাঠকদের কাছে যথার্থই পুরানো করিয়া তুলিয়াছিল। কবিতার বিষয়নির্বাচনে ঈশ্বরচন্দ্রের মৌলিকতা সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট। ইঁহার রচনার মধ্য দিয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যে সমাজচেতনার প্রথম প্রকাশ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশে (১৮৪৩) সাময়িক পত্রে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হইল। তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্যের দুইজন প্রধান লেখক সংশ্লিষ্ট ছিলেন—অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর ভাষাসৌষম্যের ও ভাবসম্পদের জন্য পত্রিকাটির কোন কোন সংখ্যা সেকালের কলেজে পাঠ্য নির্ধারিত হইয়াছিল।

৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও গদ্যের প্রতিষ্ঠা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকেরা পাঠ্যাপুস্তকের মধ্য দিয়া যে গদ্যরীতি চালাইলেন তাহা মোটামুটি একই-ভাবে পরবর্তী কালের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের লেখার ভিতর দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি চলিয়া আসিয়াছিল। একে তো এই গদ্যে শ্রী-ছন্দ বড় কিছু ছিল না, তাহার উপর চলিত-ভাষার শব্দের সঙ্গে আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার,

সর্বোপরি সংস্কৃত অথবা ইংরেজী ছাঁদে বাক্যগঠন। এই তিন কারণে এই গদ্যসাহিত্য সর্বত্র ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল। প্রথম দিকে পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণে বাক্যবিন্যাস করিতেন। তাহা যদিও বা বোঝা যাইত, কিন্তু অধিকাংশ—বিশেষ করিয়া পরবর্তী কালের এই শ্রেণীর প্রায় সব লেখক—ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিতেন বলিয়া—বাক্যরচনায় বিদেশী রীতি অনুসরণ করিতে ইতস্তত করিতেন না। এই হেতু এই গদ্যভঙ্গী ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট সদৃশ বোধ হইত। বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদের মধ্যে এই রীতি এখনও কতকটা বজায় আছে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের দিগন্ত হইতে ইহা বহুকাল পূর্বেই অপসৃত হইয়াছে।

সাময়িক পত্রিকার মধ্য দিয়া সাধারণ লোকের বোধগম্য গদ্য কিছু চলিল বটে, তবে সে রীতির মধ্যেও অনেক দোষ ছিল। চলতি বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। বাক্যের বহর মাপসই ছিল না। বাক্যসমাপ্তির সময়ে বাক্যের আরম্ভের কথা মনে থাকিত না। বাক্যে ছন্দ বা তাল (অর্থাৎ অর্থ ও শ্বাসের সমানুপাত) না থাকায় শ্রুতিমাধুর্য ছিল না। বাক্যরচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারা প্রধানভাবে অবলম্বন করা হইত। আর, ছেদচিহ্নের যথোপযুক্ত প্রয়োগ না থাকায় অর্থগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটিত। এই সকল দোষ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যকে সাহিত্যে ব্যবহারের পক্ষে অচল করিয়া রাখিয়াছিল।

বাঙ্গালা গদ্যের এই সকল দোষত্রুটি দূরীভূত করিয়া, ইহার পঙ্গুত্ব মোচন করিয়া, যিনি ইহাকে উচ্চশ্রেণী সাহিত্যের আধার করিয়া তুলিয়া অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন তিনি আধুনিক বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সন্তান পুরুষসিংহ প্রাতঃস্মরণীয় মনস্বী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পূর্বে হুগলী অধুনা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র তেজস্বী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে ১২২৭ সালে (অর্থাৎ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে) ১২ই আশ্বিন তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে ১২৯৮ সালে (অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে) ১০ই শ্রাবণ তারিখে ইঁহার তিরোধান ঘটে। এই মহাপুরুষের জীবনকাহিনী সকলের সুপরিচিত।

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরিতে ঢুকিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন।

ইঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বাসুদেবচরিত' কলেজ কর্তৃপক্ষের মনোমত না হওয়ায় প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার দ্বিতীয় রচনা বেতালপঞ্চবিংশতির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্যে নূতন রীতির পথ উন্মুক্ত হইল,—আমরা যে গদ্য এখন লিখিয়া থাকি সেই গদ্য ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার পরে বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবনচরিত (১৮৪৯), শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ বা বোধোদয় (১৮৫১), শকুন্তলা (১৮৫৪), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), মহাভারতের উপক্রমণিকা-পর্ব (১৮৬০), সীতার বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩), এবং ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯)—এই কয়খানি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। এই বইগুলির বস্তু হয় হিন্দী, নয় সংস্কৃত, নতুবা ইংরেজী গ্রন্থ হইতে নেওয়া বটে, কিন্তু সেগুলি রচনায় নূতন সৃষ্টি, অনুবাদ বলিলে যাহা বুঝি তাহা নয়। অনেকের ধারণা বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা মাত্র। এ ধারনা ঠিক নয়। ইঁহার অনেক মৌলিক রচনা আছে। যেমন, সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (দুই খণ্ড), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (দুই খণ্ড), বিদ্যাসাগর-রচিত (স্বরচিত) ও প্রভাবতীসম্ভাষণ। এই রচনাগুলি সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট। বিদ্যাসাগর শুধু যে সাধুভাষায় গুরুগম্ভীর ছাঁদে লিখিতেই দক্ষ ছিলেন তাহাও নয়। বিদ্যাসাগর কয়েকখানি বিতর্কমূলক বই ছদ্মনামে লিখিয়াছিলেন। যেমন ব্রজবিলাস রত্নপরীক্ষা। কথ্যভাষায় হাল্‌কা ছাঁদে লেখা এই বইগুলির রচনা ভঙ্গী নিরতিশয় উপভোগ্য। এই সব বই ছাড়া তিনি উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ-কৌমুদী—এই দুইখানি সংস্কৃত ব্যাকরণের বই বাঙ্গালায় লিখিয়া বাঙ্গালী ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃত-শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। বহু সংস্কৃত-গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরই প্রথম মহাভারতের যথাযথ অনুবাদে হাত দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যের জনক বিদ্যাসাগর,—এ কথাটা একেবারেই অত্যুক্তি নয়। পূর্ববর্তী বাঙ্গালা গদ্যের বিশ্লিষ্ট কঙ্কালে মেদ-মাংস-রক্ত-সংযোজন এবং প্রাণ-সঞ্চারণ করিয়া বিদ্যাসাগরই ইহাকে সাধারণের ব্যবহার্য জীবন্ত ভাষারূপে দাঁড় করাইয়া দেন। পদ্যের যেমন ছন্দ ও যতি আছে, গদ্যেরও তেমনি একটা তাল বা রীদ্‌ম্ (rhythm) আছে। বিদ্যাসাগরই

সর্বপ্রথম বাঙ্গালা গদ্যের স্বাভাবিক তাল লক্ষ্য করেন এবং তদনুযায়ী বাক্য গঠন করিয়া সাহিত্যের উপযোগী গদ্যভঙ্গীর সৃষ্টি করেন। পূর্বেকার গদ্যে হয় অপ্রচলিত সংস্কৃত অথবা চলিত সাধারণ শব্দের বাহুল্য কিংবা উভয়ের বিসদৃশ মিশ্রণ থাকিত। বিদ্যাসাগর এই দুইজাতীয় শব্দের প্রয়োগে এমন একটা সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন, যাহাতে ভাষার জোর বাড়িল এবং লালিত্যও উজ্জ্বল হইল। মোটামুটি বলিতে গেলে বাঙ্গালা গদ্যের প্রসাধনে ইহাই বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব। ইহারই অভাবে ১৮৪৭ সালের পূর্বেকার বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ও সাধারণ কাজকর্মের পক্ষে ভদ্র ভাষা হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা পায় নাই।

বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগী ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। নবদ্বীপের নিকটে, বর্ধমান জেলায়, চুপী গ্রামে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। অক্ষয়কুমার বাল্যকালেই কলিকাতায় আসেন এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। অবস্থাগতিকে তাঁহাকে স্কুল ছাড়িতে হয়, তবে নিজের চেষ্টায় গৃহে পড়াশোনা করিয়া ইনি গণিত ভূগোল পদার্থবিদ্যা উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষা করেন। দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইলে অক্ষয়কুমার তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া পত্রিকাটি সম্পাদন করেন। এই পত্রিকায় অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধ তিনি পরে গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিতেন। ইঁহার প্রথম পুস্তক 'ভূগোল' (১৮৪১) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় পঠনপাঠনের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে ইঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' প্রথম ভাগ ১৮৫২ বাহির হয় (১৮৫২)। তাহার পর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ, চারুপাঠ (তিন ভাগ), ধর্মনীতি, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (দুই ভাগ) ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ গ্রন্থ ও গ্রন্থাংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

অক্ষয়কুমারের অনেক রচনা ইংরেজী হইতে সংকলিত। তবে ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় গ্রন্থে নিজস্ব মৌলিক উপাদান অনেক আছে। অক্ষয়কুমারের রচনাভঙ্গী বিদ্যাসাগরের লেখার তুলনায় নীরস ও লালিত্যহীন বোধ হইলেও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের পক্ষে অনুপযোগী নয়। সাহিত্যিক হিসাবে অক্ষয়কুমারের

কৃতিত্ব হয়ত বেশি নয়, কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞান আলোচনার পথপ্রদর্শক বলিয়া তাঁহার স্থান সবিশেষ উর্ধ্বে।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক যাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা গদ্যের অনুশীলনে হাত দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার ছাড়া উল্লেখযোগ্য হইতেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) বাঙ্গালা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ও উপদেশাবলী একদা বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ইঁহার অত্যন্ত অগ্রহ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের প্রকৃত শিষ্য। ভারতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণ প্রধানত দেবেন্দ্রনাথের ও তাঁহার পরিবারবর্গের উদ্যোগে শুরু হইয়াছিল।

৫. রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিবিধ গদ্য লেখক

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণব ঘরের সন্তান। ইঁহার প্রপিতামহ পীতাম্বর মোঘল দরবার হইতে মহারাজা উপাধি ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে জায়গীর পাইয়াছিলেন। শেষ বয়সে ইনি বৃন্দাবনে বাস করেন। ইনি ব্রজভাষায় কয়েকটি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন। পীতাম্বরের পৌত্র, রাজেন্দ্রলালের পিতা জন্মেজয় বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি ভাষায় অনেকগুলি বৈষ্ণবপদ লিখিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ভক্ত বৈষ্ণব হন নাই, পণ্ডিত ও তর্ককুশলী বাগ্মী হইয়াছিলেন। সরকার হইতে রাজেন্দ্রলাল রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম দেশের যে দুই পণ্ডিতকে ডাক্তার (D.L.) উপাধি দিয়াছিলেন তাঁহাদের একজন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অন্য জন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণমোহনের মতই রাজেন্দ্রলাল ইংরেজী বলায় ও লেখায় দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। তবে কৃষ্ণমোহনের ঝোঁক ছিল বিভিন্ন ভাষায় ও দর্শন আলোচনায়। রাজেন্দ্রলালের ঝোঁক ছিল ইতিহাসে ও প্রত্নতত্ত্বে। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রথম পথ কাটিয়াছিলেন রাজেন্দ্রলাল। সমসাময়িক রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি অপরিচিত ছিলেন না।

রাজেন্দ্রলাল প্রায় সম্পূর্ণভাবে আত্মশিক্ষিত। তিনি শৈশবে মক্তবে ফারসী পড়িয়াছিলেন। তাহার পর ইস্কুলে বাঙ্গালা ও ইংরেজী। তাহার পর মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতে থাকেন। তাঁহার মেধা দেখিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা—তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বিলাতে ডাক্তারি পড়িবার জন্য লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাবক তাঁহাকে বিলাতে যাইতে দেন নাই। তখন রাজেন্দ্রলাল ডাক্তারি পড়া ছাড়িয়া দিয়া আইন পড়িতে থাকেন। সেখানেও গোলমাল হইয়াছিল। পরীক্ষায় রাজেন্দ্রলালের উত্তর পত্র হারাইয়া গেল। তখন তিনি আইন পড়াও ছাড়িয়া দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি অনেক বিষয়ে পড়াশোনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়ে তাঁহার কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই কৌতূহল মিটাইবার সুযোগ মিলিল। ছাব্বিশ বছর বয়সে রাজেন্দ্রলাল এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর এসিয়াটিক সোসাইটির সহিত তাঁহার কখনও বিচ্ছেদ হয় নাই। এখানে থাকিয়া তিনি বহু গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বহু পুঁথি ঘাঁটিয়া সেগুলির বিবরণ সংকলন করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সোসাইটির সভাপতিও হইয়াছিলেন (১৮৮৪)। তাহার আগে আর কোন দেশীয় পণ্ডিত এই সম্মান পান নাই।

রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গালায় বেশি কিছু লিখেন নাই। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা কয়েকটি ছোটখাট প্রবন্ধ। এগুলি তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকা দুইটিতে—বিবিধার্থসংগ্রহে ও রহস্যসন্দর্ভে—বাহির হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলালের সম্পাদিত 'বিবিধার্থসংগ্রহ' পত্রিকার প্রকাশ (১৮৫১) বাঙ্গালা সংস্কৃতি ইতিহাসে একটি খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই পত্রিকা ছাত্রদের ও সাধারণ পাঠকের পাঠযোগ্য ছিল। প্রচুর ছবি থাকিত এবং দামও খুব সস্তা ছিল। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রথম (তবে সংক্ষিপ্ত) আলোচনা রাজেন্দ্রলাল এই পত্রিকাতেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক বইয়ের ও নাটক-অভিনয়ের সমালোচনাও রাজেন্দ্রলাল করিতেন। অতএব সাহিত্যপত্রিকা বলিতে যাহা বোঝায় তাহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম হইল বিবিধার্থসংগ্রহ। বালক রবীন্দ্রনাথ বিবিধার্থসংগ্রহ পড়িয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন। বিবিধার্থসংগ্রহের প্রকাশ ১৮৫৯ সালে বন্ধ হয়। পর বৎসর হইতে কালীপ্রসন্ন

সিংহ ইহার নবপর্যায় সম্পাদন করিতে থাকেন। তাহা বেশি দিন চলে নাই। ১৮৬৩ সালে রাজেন্দ্রনাথ বিবিধার্থসংগ্রহের অনুরূপ 'রহস্যসন্দর্ভ' বাহির করিয়াছিলেন। রহস্যসন্দর্ভ পত্রিকার ষষ্ঠ খণ্ড অবধি রাজেন্দ্রলাল সম্পাদন করিয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজের ভালো ছাত্র, দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার উৎসাহী তরুণ সভ্য ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) সমসাময়িক স্থিতধী মনীষীদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইনি বাঙ্গালায় অনেক ছোটখাট বই লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪-৭৫) অত্যন্ত উপাদেয় রচনা। বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দুই কবির সঙ্গে রাজনারায়ণের হৃদয়সম্পর্ক ছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রাজনারায়ণের সহপাঠী ও বাল্যসুহৃদ ছিলেন। রাজনারায়ণের সমালোচনা অনুসারে মাইকেল তাঁহার রচনা কিছু কিছু বদলাইতেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন রাজনারায়ণের বন্ধু আর রাজনারায়ণ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগী। এই সূত্রে বালক রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণের প্রশংসা বালক কবিকে কাব্যচর্চায় উৎসাহিত করিয়াছিল। বস্তুত রাজনারায়ণের অসামান্য প্রাণপ্রাচুর্য এবং তাহা হইতে উদ্ভূত সহজ রসবোধ ছিল। ইঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮) উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৬-১৮৯৪) ব্রাহ্মণপণ্ডিত-ঘরের সন্তান। সংস্কৃত পড়ায় ইঁহার আগ্রহহীনতা দেখিয়া পিতা হিন্দু কলেজে ভর্তি করেন। হিন্দু কলেজে ভূদেব মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন। সিনিয়র পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া ইনি শিক্ষকতা কার্য গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ সাল হইতে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' প্রত্রিকার ভার ভূদেবের উপর পড়ে। ইঁহার বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পুষ্পাঞ্জলি, আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ইত্যাদি পুস্তকের মধ্য দিয়া চরিত্রগঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ও 'স্বপ্নলব্ধ ভারবর্ষের ইতিহাস' ভূদেবের উল্লেখযোগ্য রচনা। ভূদেবের রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসে (১৮৫৭) দুইটি গল্প আছে। শেষেরটির নাম 'অঙ্গুরীয়বিনিময়'। এই গল্পটির কাহিনী কতকটা ইতিহাস হইতে নেওয়া হইলেও গল্পটিকে

মৌলিক পর্যায়ে ফেলিতে হয়। বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইহাতেই সূত্রপাত। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে অঙ্গুরীয়বিনিময় গল্পের প্রভাব আছে।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে লেখক হিসাবে সমুন্নত দুইজনের, প্যারীচাঁদ মিত্রের ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের, কথা পরে বলিতেছি।

বাঙ্গালা গদ্যের পরিচালনায় বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের যে পথ দেখাইয়াছিলেন তাহার অনুসরণে সেকালের কয়েকজন লেখক গদ্য রচনায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরী (১৮৫৪) সে কালের একটি সমাদৃত গদ্য গ্রন্থ। ইহা বাণভট্টের সংস্কৃত গদ্য-কাব্য কাদম্বরী অবলম্বনে রচিত। তারাশঙ্কর সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার অপর বাঙ্গালা গ্রন্থ 'রাসেলাস' ইংরেজী বইয়ের অনুবাদ।

তারাশঙ্কর তর্করত্নের মত রামগতি ন্যায়রত্নও (১৮৩১-১৮৯৪) সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ইনি অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক এবং 'রোমাবতী' ও 'ইলছোবা' নামক দুইখানি আখ্যায়িকা রচনা করেন। ইঁহার রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ (দুইখণ্ডে, ১৮৭৩-৭৪)।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০?-১৯৩২) সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং সেকালের একজন বিখ্যাত বিদ্বান্ মনীষী ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ ও আইনবেত্তা বলিয়া ইঁহার খুব খ্যাতি ছিল। বিদেশী ভাষা হইতে মনোজ্ঞ কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইনি দুই-একটি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইঁহার লিখিত এই কাহিনীগুলি সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত বাঙ্গালা উপন্যাসের পথ পরিষ্কার করিয়াছিল। কৃষ্ণকমলের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' সিপাহী যুদ্ধের সময়ে ১৭৭৯ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৮৫৭ কিংবা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। ইনি 'বিচারক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় কৃষ্ণকমলের মৌলিক রচনা ও অনুবাদ বাহির হইত। ফরাসী হইতে অনূদিত পল-বর্জিনিয়া কাহিনী অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কাহিনী বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

সংস্কৃত কলেজের আর এক বিখ্যাত ছাত্র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-৮৬) সেকালের একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। ইঁহার সম্পাদিত সোম প্রকাশ পত্রিকা তখনকার দিনে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতির ও সাহিত্যের পোষকতায় বর্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদের (১৮২০-১৮৭৯) প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের মূল এবং গদ্যে ও পদ্যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া এবং হাতেমতায়ি, চাহারদরবেশ, সেকন্দরনামা ও মস্‌নবী প্রভৃতি ফারসী ও উর্দূ আখ্যায়িকা বাঙ্গালা গদ্যে অথবা পদ্যে অনুবাদ করাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। মহাতাবচাঁদ গুণী ও পণ্ডিতের বিশেষ সমাদর করিতেন। ইঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজা আফতাবচাঁদও যথাসাধ্য পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন।

৬. কবিতায় পালাবদল

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণব-পদাবলী ও পৌরাণিক কাব্য, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ধরণে লৌকিককাহিনী কাব্য, এই দুই ধারা চলিয়া আসিয়াছিল। ইহার উপর বৈঠকি সঙ্গীত ও তরজা এবং কবি-গান প্রভৃতির আদরও খুব ছিল। বৈষ্ণব-পদাবলীর ও পৌরাণিক কাহিনীর লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন রঘুনন্দন গোস্বামী (জন্ম ১১৯৩ সাল)। ইঁহার রচিত তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। রামরসায়নে রামকাহিনী, গীতমালায় কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গীতি, এবং রাধামাধবোদয়ে বিবিধ ছন্দে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত। রামরসায়ন সুললিত কাব্য। ইহা প্রচলিত বাঙ্গালা রামায়ণ কাব্যগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এইটিই ইঁহার প্রথম রচনা বলিয়া অনুমান হয়। রাধামাধব ঘোষের 'সারাবলি' বা 'পুরাণসংগ্রহ' (১৮৪৮) বাঙ্গালা সাহিত্যের বৃহত্তম পুরাণসঙ্কলন গ্রন্থ। বইটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। "কবিকেশরী" রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারও অনেকগুলি পৌরাণিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অনেক লেখক ভারতচন্দ্রের অনুসরণে প্রেমকাব্য লিখিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের রচনারীতি অনুশীলনকারী কবিদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৬-১৮৫৮)। মদনমোহন

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ছিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি দুইখানি কবিতার বই রচনা করেন—রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা। দুইটিই সংস্কৃত কবিতার ও কাব্যের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। মদনমোহনের ছন্দঃকুশলতা ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথা আগে বলিয়াছি। ইঁহাকে পুরানো ধারার কবিতার শেষ লেখক এবং নূতন ধারার কবিতায় প্রথম লেখক বলা যায়। ইঁহার কাব্যে দেশপ্রীতি যে নূতন ঝঙ্কার তুলিয়াছিল তাহাতে তখনকার দিনের সহৃদয় ব্যক্তিরা ও শিক্ষিত যুবকেরা অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র এবং তাঁহার শিষ্যদের দ্বারাই বাঙ্গালা কাব্যের নবীন রীতির সূচনা হইয়াছিল।

অল্পবয়সেই ঈশ্বরচন্দ্রের পদ্যলেখার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রথম জীবনে তিনি কবি-গাইয়ের দলের জন্য গান রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার কবিতা সংবাদপ্রভাকর ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলি ছয় শ্রেণীতে পড়ে, — (১) ধর্ম-ও নীতিশিক্ষা-বিষয়ক, (২) সমাজ-বিষয়ক—হাস্যরস ও ব্যঙ্গপ্রধান, (৩) সমসাময়িক ঘটনা-বিষয়ক, (৪) প্রেমমূলক, (৫) ঋতু ও অন্যান্য বর্ণনা-বিষয়ক, এবং (৬) গীতি-কবিতা অর্থাৎ গান।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার রচনাভঙ্গি ছিল—সংবাদপত্রসেবীর যেমন হইয়া থাকে—ব্যঙ্গবিজড়িত ও হাস্যরসপ্রধান, চটুল এবং সময়ে সময়ে (তখনকার রুচির উপযোগী) একটু গ্রাম্যতাঘেঁষা। কবিতার ছন্দে, বিশেষ করিয়া ছড়াজাতীয় কবিতার ছন্দে, ইনি নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। তখনকার দিনের কবিতার প্রধান প্রসাধন ছিল অনুপ্রাসের অট্টহাস। ঈশ্বরচন্দ্রের লেখাতেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। রচনাভঙ্গী বিচার করিলে মনে হয় ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন রীতিরই লেখক। তাঁহার কাছে আদর্শ কবি ভারতচন্দ্র। কিন্তু ভাবের বিবেচনা করিলে জানি ঈশ্বরচন্দ্র আধুনিক রীতির পক্ষপাতী, এবং এ বিষয়ে তিনি কিছু পরিমাণে পথপ্রদর্শক। বাঙ্গালা সাহিত্যের সঞ্চয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে—স্ব-সমাজের যাহা কিছু প্রাচীন ও প্রচলিত রীতি, তাহা যতই অপকৃষ্ট বা অশ্রদ্ধেয় হোক না কেন, সবই গ্রহণীয়। এবং গদ্যপদ্যের মধ্য দিয়া ঈশ্বরচন্দ্র ইহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক ব্যঙ্গ-কবিতার

মূলেও এই প্রীতি, এবং আগেকার কবিদের কাব্য প্রচারে ও জীবনীসংগ্রহেও এই প্রীতি। প্রধানত এই স্বদেশ ও সমাজ-প্রীতির জন্যই তাঁহার ছাত্র-শিষ্যগণ তাঁহাকে সাহিত্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, যদিও তাঁহার রচনার গ্রাম্যরুচি অনেক সময়েই এইসব কলেজে-পড়া উদীয়মান লেখকদের রুচিকর ছিল না। তবে সমাজে সংসারে, দেশে-বিদেশে কোন রকম ভণ্ডামি ঈশ্বরচন্দ্র বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। রক্ষণশীলতার দিকে মনের ঝোঁক থাকিলেও ঈশ্বরচন্দ্র একেবারে সংস্কারবিমুখ ছিলেন না। তবে তিনি সংস্কারকদের দোষত্রুটি সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত সজাগ ছিলেন। ব্রাহ্ম ও হিন্দু উভয় সমাজেই তাঁহার পসার ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পদ্যরচনায় যে সহজসুগমতা ছিল, তাহা তাঁহার গদ্যরচনায় ছিল না। আগে বলিয়াছি, তাঁহার গদ্যরীতি নিতান্ত গুরুভার ও মন্থরগতি।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবৎকালে তাঁহার একখানিমাত্র রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়, ১২৬৪ সালে। বইটির নাম প্রবোধপ্রভাকর। হিতপ্রভাকর এবং বোধেন্দুবিকাস তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরে বাহির হয়। শেষের বইটি প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত নাটকের প্রথম তিন অঙ্কের অনুবাদ।

ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যেরা তাঁহার সম্পাদিত 'সংবাদপ্রভাকর' ও 'সংবাদসাধুরঞ্জন' পত্রিকায় নিজেদের রচনা প্রকাশ করিতেন। উত্তরকালে ইঁহাদের কেহ কবি, কেহ নাট্যকার, কেহ বা ঔপন্যাসিক হিসাবে যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দ্বারকানাথ অধিকারী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছু পরিমাণে ঈশ্বরচন্দ্রের পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন না, ভাবশিষ্য ছিলেন।

ইংরেজীতে লিখিত আখ্যায়িকা-কাব্যের অনুবাদের মধ্য দিয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরেজীর প্রভাব এবং সেই সূত্রে আধুনিকতা সর্বপ্রথম দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ইংরেজী মূল অবলম্বনে বিবিধ নীতিগল্প এবং পারস্য-ইতিহাস ও আরব্য-উপন্যাস প্রভৃতি আখ্যায়িকা গদ্যে ও পদ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর খাশ ইংরেজী কাব্যের অনুবাদ আরম্ভ হয়। এই ধরণের অন্যতম প্রথম বাঙ্গালা রচনা হইল মিল্টনের প্যারাডাইজ লষ্ট্-এর অনুবাদ 'সুখদ-উদ্যান ভ্রষ্ট' কাব্য (১৮৫৪)।

ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা কাব্যে যে আধুনিকতার বীজ বুনিলেন, তাহা তাঁহার সহকারী এবং মুখ্য শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৮৭) কবিতায় অঙ্কুরিত হইল। রঙ্গলাল হুগলী কলেজের ছাত্র, কিন্তু কলেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ পান নাই। ঘরে পড়িয়াই রঙ্গলাল ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কার্যসূত্রে ইঁহাকে কিছুকাল উড়িষ্যায় কাটাইতে হইয়াছিল। সেই সুযোগে ইনি উড়িয়া শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাঙ্গালার তথা বহির্জগতের কাছে পরিচিত করাইয়াছিলেন। গুরুর মত ইনিও প্রথমে কবি-গান রচনা করিতেন। তখনকার বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় ইঁহার কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। রঙ্গলালের প্রথম (?) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাব্য হইল 'ভেক-মুষিকের যুদ্ধ' (১৮৫৮)। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি গ্রীক মহাকবি হোমরের নামে প্রচলিত একটি ব্যঙ্গকাব্যের ইংরেজী অনুবাদের তর্‌জমা। ছোট ছোট মৌলিক কবিতা এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী হইতে অনূদিত কবিতা ও কাব্য ছাড়া ইনি চারিখানি মৌলিক আখ্যায়িকা (কাব্য) রচনা করিয়াছিলেন—পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), কর্মদেবী (১৮৬২), শূরসুন্দরী (১৮৬৮), এবং কাঞ্চী-কাবেরী (১৮৭৯)। পদ্মিনী কাব্যের বিষয়বস্তু হইতেছে মেওয়ারের রানী পদ্মিনী ও দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীনের কাহিনী। কর্মদেবী ও শূরসুন্দরীর বিষয়বস্তুও রাজপুত ইতিহাস হইতে গৃহীত। কাঞ্চী-কাবেরীর মূলে আছে উড়িষ্যার এক রাজা ও রাজমহিষীর প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী। রঙ্গলালের কাঞ্চী-কাবেরী উড়িষ্যার প্রাচীন কবি পুরুষোত্তমদাসের কাব্য অনুসরণে বিরচিত।

রচনারীতিতে যত না হোক বিষয়বস্তুতে বিশেষ করিয়া, পদ্মিনী-উপাখ্যান বাঙ্গালা কাব্যে আধুনিকতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ। কেন যে প্রচলিত পুরাণকহিনী ত্যাগ করিয়া রাজপুত ইতিহাস হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিলেন তাহার কৈফিয়তে রঙ্গলাল বলিয়াছেন, "স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্য-পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষক এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি-প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্বক রচিত করিলাম।"

দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা রঙ্গলালের কাব্যের মূল সুর। তাঁহার গুরুর কাব্যেও দেশপ্রীতি ফুটিয়াছিল বটে, কিন্তু সে প্রীতি আত্মসচেতন

ছিল না। তাহা ছাড়া, ঈশ্বরচন্দ্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা অবধি পৌঁছাইতে পারেন নাই। রঙ্গলাল গুরুর অপেক্ষা দুই এক ধাপ বেশি আগাইয়া গিয়াছেন। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে রঙ্গলাল অনেক ভাব ইংরেজ কবি স্কট মূর এবং বায়রনের লেখা হইতে আত্মসাৎ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের তত দূর ক্ষমতা ছিল না। সর্বশেষে, ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদপত্রসেবী ছিলেন, সুতরাং জীবিকা বলিয়া সাধারণ পাঠকের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে বাজে লেখাও লিখিতে হইত। রঙ্গলালের সে দুর্ভাগ্য বেশি দিন ভোগ করিতে হয় নাই। রঙ্গ লাল যথার্থই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম কবি। তবে পূর্বের প্রভাব তিনি একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। পূর্ববর্তী সাহিত্যের প্রথামত তাঁহার কাব্যে উপাখ্যান ও বর্ণনাই মুখ্য।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১২৪৪-১৩১৩) কবিতা প্রধানত ধর্ম- ও নীতি-বিষয়ক। ইনি যশোরের লোক। শিক্ষকতা করিতেন এবং কিছু কাল ঢাকায় কাটাইয়া ছিলেন। সেখান হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় ইনি কবিতাবিষয়ক মাসিকপত্র চালাইয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ফারসীনবীশ ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, ইংরেজী ভালো জানিতেন না। তাই ইঁহার লেখায় সংস্কৃত এবং ফারসীর ছায়া সুলভ। ইঁহার প্রথম ও একদা পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে বহুসমাদৃত কবিতাগ্রন্থ হইতেছে সদ্ভাব-শতক (১৮৬১)। সদ্ভাব-শতকের অধ্যাত্ম- ও নীতি-বিষয়ক কবিতাগুলিতে প্রায়ই ফারসী কবি হাফেজের কবিতার ভাব অনুকৃত অথবা ভাষা অনূদিত। রচনায় খুব বৈচিত্র্য নাই, তবে প্রসাদগুণ বেশ আছে। কয়েকটি কবিতায় ও গানে মিল নাই।

সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আলোচনা পরে করিতেছি।

৭. নাটকের কথা

প্রাচীন যাত্রা হইতে বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি হয় নাই। ইংরেজী ধরণের রঙ্গমঞ্চ-প্রবর্তনের পর হইতে বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙ্গালা নাটকের গঠনে ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাটকের প্রভাব তুল্যরূপেই আছে। বাঙ্গালা সংলাপ- ও গান-যুক্ত নাটক-পালা লইয়া প্রথম অভিনয় হয় অষ্টাদশ

শতাব্দীর একেবারে শেষে। হেরাসিম্ (বানানে গেরাসিম Gerasim) লেবেডেফ নামে একজন রুশ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি নাট্যশালা খুলিয়া সেখানে একখানি ইংরেজী নাটকের প্রথম দুইটি অঙ্ক সম্পূর্ণ ও তৃতীয় অঙ্কের একটি দৃশ্য বাঙ্গালায় আংশিক অনুবাদ করাইয়া বাঙ্গালী নট-নটীদের দ্বারা দুইদিন অভিনয় করাইয়াছিলেন। নাটক দুইটিতে ভারতচন্দ্রের গান সংযোজিত হইয়াছিল। প্রথম অভিনয় হয় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখে এবং শেষ অভিনয় হয় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে। ইহার পর বহুকাল আর বাঙ্গালা নাট্যশালা অথবা বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়-সম্বন্ধে কোন খবর পাওয়া যায় না। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এক নাট্যশালা স্থাপিত করেন। দেশীয়-ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত ইহাই প্রথম নাট্যশালা। ইহাতে যে কয়খানি নাটক অভিনীত হইয়াছিল সেগুলি প্রায় সবই ইংরেজী। তাহার পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে একটি নাট্যশালার আয়োজন হয়। এখানে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া বাঙ্গালী নট-নটী কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। এই থিয়েটার-সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

বাঙ্গালা নাটকের অভাবেই সে-যুগে বাঙ্গালা নাট্যশালা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এই অভাব তখন অনেকেই অনুভব করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিকারের চেষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে বাঙ্গালা নাটক-রচনার সুত্রপাত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে যে দুই একটি সংস্কৃত নাটক ও প্রহসনের অনুবাদ বাহির হইয়াছিল সেগুলি গদ্যে কিংবা পদ্যে অনুবাদ। প্রথম দুই মৌলিক নাটক হইতেছে গোবিন্দচন্দ্র (জি.সি.) গুপ্তের কীর্তিবিলাস (১৮৫২) এবং তারাচরণ শীকদারের ভদ্রার্জুন (১৮৫২)। প্রথমটি বিয়োগান্ত ("ট্রাজেডি"), দ্বিতীয়টি মিলনান্ত ("কমেডি")।

কীর্তিবিলাস নাটকের (১৮৫২) কাহিনী বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত উপকথা অবলম্বনে গদ্যে-পদ্যে লেখা পঞ্চাঙ্ক নাটক। শেক্‌স্পিয়রের হ্যামলেট নাটকের প্রভাব আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক প্রবর্তনের কৈফিয়ৎ হিসাবে লেখক একটি দীর্ঘ ভূমিকা দিয়াছেন। প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটকের মত। দৃশ্য বা Scene অর্থে "অভিনয়" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

ভদ্রার্জুন (১৮৫২) নাটকের বিষয় অবশ্য মৌলিক নয়, কিন্তু রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব। সংস্কৃত নাটক-রচনার পদ্ধতি ইংরেজী পদ্ধতির সঙ্গে মিলাইয়া তারাচরণ এই নাটকটি রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত নাটকের নান্দী ও প্রস্তাবনা এবং বিদূষকের ভূমিকা পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর ইংরেজী নাটকের মত ঘটনা ও সংস্থান এবং অঙ্কের অন্তর্গত একাধিক scene ('সংযোগস্থল') প্রযুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা রীতি অনুযায়ী নাটকের প্রারম্ভে পয়ারে কাহিনীর ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে। ভদ্রার্জুন অংশত গদ্যে এবং বেশির ভাগ পদ্যে—পয়ারে—রচিত।

এ সময়ের অধিকাংশ "নাটক" ঠিক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লেখা হইত না। ভদ্রার্জুন কিন্তু অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা হইয়াছিল। এবিষয়ে তারাচরণ ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এতদ্দেশীয় কবিগণ-প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদি পর্ব হইতে সুভদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম।"

সোজাসুজি ইংরেজী নাটক অবলম্বনে রচিত প্রথম বাঙ্গালা নাট্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—হরচন্দ্র ঘোষের (১৮১৭-৮৪) 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটক' (১৮৫৩)। বইটি শেক্‌স্পিয়রের মার্চেন্ট অব ভিনিসের বাঙ্গালা রূপান্তর। হরচন্দ্র নাটকটিকে পাঠ্যপুস্তকের মত করিয়া লিখিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য মূল নাটকের অঙ্গহানি করিতে হইয়াছিল। পদ্যাংশের বাহুল্য বইটির একটি বড় দোষ। এই দোষ পরিহার করিয়া হরচন্দ্র কয় বৎসর পরে আর একটি নাটক লিখিলেন মহাভারত-কাহিনী অবলম্বনে, 'কৌরব-বিয়োগ (১৮৫৮)। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হইতে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মাহুতি পর্যন্ত ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। পদ্যের অংশ কমানো সত্ত্বেও নাটক হিসাবে ইহার উপযোগিতা কিছুমাত্র বাড়ে নাই। গুরুগম্ভীর রীতিতে রচিত দীর্ঘ উক্তির বাহুল্য কৌরববিয়োগের প্রধান দোষ। গ্রন্থকারের আশা ছিল যে নাটক

বলিয়া না হোক পাঠ্যপুস্তক বলিয়া ইহা গৃহীত হইবে। তাঁহার সে আশা সফল হয় নাই। হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক চারুমুখ-চিত্তহরা (১৮৬৪) শেক্‌স্‌পিয়রের রোমিওজুলিয়েট অবলম্বনে লেখা। এ রচনাও ব্যর্থ হইয়াছিল। অতঃপর ইনি নাটক ছাড়িয়া উপন্যাসের ও কাব্যের পথ ধরিয়াছিলেন। ইঁহার শেষ দুই রচনা হইতেছে 'সপত্নী সরো' (১৮৭৪) উপন্যাস এবং 'রাজতপস্বিনী' (১৮৭৬) কাব্য।

সে সময়ের এইসব মৌলিক ও অনুবাদ নাটক পড়িবার বই রূপেই রহিয়া গিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-সৌভাগ্য এগুলির হয় নাই। সংস্কৃত হইতে অনূদিত নাটকগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম নন্দকুমার রায়ের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটক (১৮৫৫) অভিনয়ে বেশ জমিয়াছিল। তাহার পর রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী (১৮৫৮) প্রভৃতি অনুবাদাত্মক নাটক রঙ্গমঞ্চে সমাদৃত হইয়াছিল। এই রত্নাবলী নাটকের অভিনয়গৌরব দেখিয়াই মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালা নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ তিন-চারিখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার প্রথম নাট্যরচনা 'বাবু নাটক' নাটক কি প্রহসন, এবং কখন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কিছুই জানা যায় নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সাবিত্রী-সত্যবান্ নাটক (১৮৫৮) মৌলিক রচনা। মালতীমাধব (১৮৫৯) ভবভূতির মালতীমাধব নাটকের অনুবাদ। নাট্যকার হিসাবে কালীপ্রসন্নের কৃতিত্ব অকিঞ্চিৎকর। তবে এগুলির কোন কোনটি লেখকের গৃহে নিজস্ব বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা নাটকের প্রত্যূষকালের প্রধান নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬)। রামনারায়ণের প্রথম নাট্যরচনা 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) বিষয়গৌরবে রচনাচাতুর্যে এবং নাট্যবন্ধে ভালো লেখা না হইলেও তখনকার দিনের দুই-তিনটি বাঙ্গালা নাটকের মধ্যে বিষয়বৈচিত্র্য আনিয়া এবং গ্রাম্যতাহীন কৌতুকরসের যোগান দিয়া বাঙ্গালা নাটকের ভবিষ্যৎ কিছু পরিমাণে নির্দিষ্ট করিয়াছিল। ব্রাহ্মণসমাজে কৌলীন্যপ্রথার শোচনীয়তা কুলীন-কুলসর্বস্বের প্রতিপাদ্য। প্লট বলিতে বিশেষ কিছু নাই। আছে কতকগুলি কৌতুকপূর্ণ

দৃশ্যপরম্পরা মাত্র। তবে আখ্যানবস্তুর অভিনবতা আর সরস ও সরল রচনাভঙ্গী দৃশ্যগুলিকে মনোরম করিয়াছে। শিক্ষিতসমাজের নবজাগরিত সংস্কারস্পৃহা ইহাতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত বলিয়া কুলীনকুলসর্বস্বের যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। ব্রাহ্মণসমাজের সংস্কারবিষয়ে ইনি আরও একটি নাটক লিখিয়াছিলেন—নবনাটক (১৮৬৬)। দুইটি নাটকই ফরমায়েসি রচনা। প্রথমটি লেখা হয় রঙ্গপুরের কালীচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রদত্ত পারিতোষিকের জন্য, দ্বিতীয়টি রচিত হয় জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে। নবনাটকে বহুবিবাহের দোষ চিত্রিত। এটি জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে) অভিনীত হইয়াছিল। বেণীসংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী (১৮৫৮), অভিজ্ঞানশকুন্তল (১৮৬০) ও মালতীমাধব (১৮৬৭)—সংস্কৃতমূলের অনুসরণে লেখা। রুক্মিণীহরণ (১৮৭১), কংসবধ (১৮৭৫) এবং ধর্মবিজয় (১৮৭৫)—পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে মৌলিক রচনা। স্বপ্নধন (১৮৭৩) একটি রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা। যেমন কর্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট (১৮৬৯) ও চক্ষুদান (১৮৬৯) প্রভৃতি কয়েকখানি প্রহসনও রামনারায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালায় রামনারায়ণের প্রহসনগুলি বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়ার জমিদার দুই ভাই রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাঁহাদের বেলগাছিয়া বাগানবাড়ীতে মহাসমারোহে রামনারায়ণের রত্নাবলীর অভিনয় হইয়াছিল। এই অভিনয়ের বিরাট সাফল্যই মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাঙ্গালা নাটকরচনায় প্রেরণা দিয়া বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ে এবং নাট্যরচনায় যথার্থ প্রাণসঞ্চার করাইয়াছিল। মদুসূদনের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠাও ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল। বাঙ্গালা নাটকের ও নাট্য-অভিনয়ের ইতিহাসে বেলগাছিয়া বাগানবাড়ীর অভিনয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

রামনারায়ণের কুলীন-কুলসর্বস্বের অনুকরণে ও অনুসরণে সামাজিক কুপ্রথা এবং সামাজিক সংস্কার, বিশেষ করিয়া বিধবাবিবাহ, বিষয়ে বহু নাটক অতি অল্প সময়ের মধ্যে রচিত হইয়া গেল। এই সকল নাট্যরচনার মধ্যে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' (১৮৫৬) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বইটি পূর্ববর্তী নাট্যরচনাগুলির তুলনায় উন্নত, এবং অভিনয়ে সাফল্যমণ্ডিত। নাটকটির অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং অভিনয়ে ইহার সমাদর বহুদিন অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল। তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক' এর (১৮৫৮) প্রথম ভাগ মাত্র বাহির হইয়াছিল। কাহিনী অসম্পূর্ণ, এবং নাটক হিসাবে বইটি মূল্যহীন। ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব পরিস্ফুট, এবং ভাবে গ্রাম্যত্ব বিরল নয়। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব কিছু দেখা যায়। তবুও সপত্নী নাটক গতানুগতিক রচনা নয়। কাহিনীর ট্রাজিক অংশ বাস্তব ও মর্মস্পর্শী। হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলভঞ্জন (১৮৬২) নাটকের বিষয় হইতেছে কতকগুলি পাড়াগেঁয়ে নেশাখোর ব্যক্তিকর্তৃক বিধবাবিবাহ আয়োজন পণ্ড করিবার ষড়যন্ত্র। ভূমিকায় নাট্যকার লিখিয়াছেন, "অস্মদেশে দলাদলি-প্রথা প্রচলিত থাকাতে যে সকল মহৎ অনিষ্টপাত হইতেছে, তাহা যতদূর ব্যক্ত করা আমার সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহাই এই দলভঞ্জন নাটকে উল্লেখ করিয়াছি।" নাটকটি আগাগোড়া কথ্যভাষায় লিখিত। কৌতুকরসও প্রায় সর্বত্র জমিয়াছে। হারাণচন্দ্র আরও একটি নাটক লিখিয়াছিলেন, নাম বঙ্গ কামিনী (১৮৬৮)।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯) বাঙ্গালা নাটকে জীবনসঞ্চার করিয়াছিল। একদিকে গুরুভার রচনারীতি, অপরদিকে ইতর কৌতুকরস অথবা ভাঁড়ামি—এই দোটানার মধ্যে ও সমাজসংস্কার ঝোঁকের চাপে পড়িয়া বাঙ্গালা নাটকের সম্মুখে যখন পথ একেবারে রুদ্ধ দেখাইতেছিল তখন মধুসূদন লঘুতর রচনারীতি, প্লট্-রচনার দক্ষতা এবং বিশুদ্ধ কৌতুকরসের অল্পস্বল্প যোগান দিয়া বাঙ্গালা নাটকের পথ পরিষ্কার করিলেন। মধুসূদন সর্বসমেত চারিখানি নাটক ও দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ নাটক—মায়াকানন—তাঁহার মৃত্যুর পরে (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে) প্রকাশিত হইয়াছিল। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী—এই নাটক তিনখানির আখ্যানবস্তু যথাক্রমে মহাভারত, গ্রীক-উপাখ্যান ও রাজপুতকাহিনী হইতে গৃহীত। শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী নাটকের সংস্কৃত নাটকের—বিশেষ করিয়া কালিদাসের শকুন্তলার—প্রভাব সবিশেষ লক্ষণীয়। কৃষ্ণকুমারী নাটকের ঘটনাসংস্থানে গ্রীক নাটকের প্রভাব আছে। শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রধান দোষ হইতেছে প্লটের শৈথিল্য। আর এক দোষ—নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব ঘটনাই নেপথ্যে ঘটিয়াছে। পদ্মাবতী (১৮৬০) বিশুদ্ধ রোমান্টিক নাটক।

কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১, ১৮৬৫) মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক। ইহাতে প্লটের সংহতি ও ট্রাজেডি অবান্তর কোন ঘটনার দ্বারা ব্যাহত হয় নাই। কৃষ্ণকুমারী নাটকের অনুসরণে পরে বহু নাট্যকার রাজপুত-ইতিহাস হইতে আখ্যানবস্তু আহরণ করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের প্রহসন দুইটি—'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম উৎকৃষ্ট প্রহসন। প্রথমটিতে উন্নতির নামে যথেচ্ছাচারী নব্যসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং দ্বিতীয়টিতে ধর্মের নামে অধর্মচারী প্রাচীন সমাজের কপটতা ফটোগ্রাফসুলভ যথাযথতায় ও সহৃদয়তায় চিত্রিত। এই প্রহসন দুইটি সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরবর্তী কালের প্রায় সব প্রহসন এই ছাঁচে ঢালা হইয়াও অনুকৃত রচনা দুইটিকে শিল্পনৈপুণ্যে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালায় কৃষ্ণকুমারী নাটক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা?' সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

তাঁহার প্রথম নাটক নীলদর্পণ (১৮৬০) প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা নাটকরচনায় নূতন প্রেরণা দিলেন দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-৭৩)। নীল-চাষ সে সময়ে আমাদের কৃষিজীবী-সমাজে যে নিষ্ঠুর সমস্যা আনিয়া দিয়াছিল এবং নীলকর ইংরেজদের যে নিদারুণ অত্যাচার মধ্য বাঙ্গালার পল্লীজীবনের নিঃশ্বাসরোধ করিয়া আনিতেছিল, এই নাটকটিতে তাহারই নিষ্ঠুর ও বীভৎস বাস্তব চিত্র প্রকটিত হইয়া স্বদেশে-বিদেশে শিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তিদের সমবেদনা আকর্ষণ করিয়াছিল। আমেরিকায় মিসেস্ স্টো-এর 'আঙ্কল টম্‌স্ ক্যাবিন' উপন্যাস যেমন দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার উচ্ছেদ করিতে বিশেষ সাহায্যে করিয়ছিল, নীলদর্পণও তেমনি নীলকরদের অত্যাচার সকলের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া তাহার প্রশমনে কার্যকর হইয়াছিল। নাটক হিসাবে নীলদর্পণে অনেক ত্রুটি আছে। প্লটে নাটকীয় গুণ নাই। ভাষা সংলাপের অনুপযুক্ত, হয় অত্যন্ত গ্রাম্য নয় নিতান্ত গুরুগম্ভীর। স্বগত উক্তির বাহুল্য এবং দীর্ঘ বক্তৃতা রসহানি ঘটাইয়াছে। সর্বোপরি মৃত্যুর ঘনঘটা কাহিনীকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বইটির প্রধান গুণ হইতেছে যে ভূমিকাগুলি জীবন্ত ও বাস্তব, এবং দেশের কোন ধর্ম বা নীতিঘটিত সংস্কারকল্পনা নয়, দেশের যাহারা প্রাণ সেই চাষীদের মরণবাঁচনের সমুপস্থিত

সমস্যাই নাটকটির নীলদর্পণ এমন যথাযথভাবে এবং সহৃদয়তার সহিত লিখিত যে বইটি প্রকাশিত হইবার পরই নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। প্রকাশিত পুস্তকে দীনবন্ধুর নাম ছিল না, থাকিলে হয়তো তাঁহার চাকরি যাইত। কারণ সে সময়ে শাসন-কর্তৃপক্ষের নিকট নীলকরদের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। মধুসূদন বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন বলিয়া শোনা যায়। ইহাতে তাঁহার নাম ছিল না, প্রকাশক বলিয়া পাদ্‌রি লঙ্‌ এর নাম ছিল। নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আনিল। বিচারে লঙ্‌ সাহেবের একমাস কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা হইল। কিন্তু কিছুতেই নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন রোধ করা গেল না। নীলদর্পণের অনুবাদ বিলাতে পৌঁছাল, সেখানেও আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং অল্পকালমধ্যে নীলকরদের অত্যাচার প্রশমিত হইয়া গেল। অবশ্য আর একটা কারণও ছিল—কৃত্রিম নীল রঙের আবিষ্কার।

নীলদর্পণের পর দীনবন্ধুর এই নাটকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল—নবীন তপস্বিনী (১৮৩৩), বিয়েপাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাইবারিক (১৮৭২), এবং কমলে কামিনী (১৮৭৩)। নানা দিক দিয়া 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর সর্বোত্তম রচনা, যদিও নাটকটি একেবারে নির্দোষ নয়।

নীলদর্পণ ছাড়া দীনবন্ধুর অপর সব নাট্যরচনা হাস্যরসপ্রধান নাটিকা অথবা প্রহসন মাত্র। তবে এই সকল রচনার মধ্যে কমবেশি বাস্তব ঘটনার অথবা ব্যক্তিবিশেষের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। নবীন তপস্বিনীর মধ্যে শেক্‌স্‌পিয়রের মেরি ওয়াইভ্‌স্‌ অব্‌ উইণ্ডসর্‌ নাটকের প্রভাব আছে। হয়ত নীলদর্পণ দীনবন্ধুর সবচেয়ে সার্থক রচনা, কিন্তু নাট্যরচনা হিসাবে সধবার একাদশী অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে। দীনবন্ধু বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। সত্য বটে তাঁহার রচনায় ভদ্র রুচির সীমা ক্বচিৎ উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে দোষ তাঁহার অপেক্ষা সে সময়ের রুচিরই বেশি। সেকালের পাঠক ও দর্শক এইরূপ স্থূল রসিকতাই পছন্দ করিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দীনবন্ধুর অঙ্কিত ভূমিকা কোথাও একেবারে অসার নয়। নাট্যকারের সহানুভূতি অনেক সময় ভূমিকার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে রক্তমাংসের মানুষের মত করিয়া তুলিয়াছে। পরবর্তী নাট্যকারেরা সুযোগ পাইলে বাড়াবাড়ি

করিতে ছাড়েন নাই। দীনবন্ধুও মধ্যে মধ্যে বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বটে, তথাপি তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি সর্বদা ব্যঙ্গমূর্তি বা ক্যারিকেচারে পরিণত না হইয়া জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদের দোষগুণ লইয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। নাট্যকারের পক্ষে ইহা একটি প্রধান গুণ। এই গুণ দীনবন্ধুর যে পরিমাণে ছিল তাহা সমসাময়িক বাঙালার আর কোন নাট্যকারের ছিল না।

দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি মধুসূদনের প্রহসন দুইটির তুলনায় অনেক ম্লান। ক্বচিৎ মধুসূদনের অনুকরণও দীনবন্ধুর লেখায় দেখা যায়। লঘু কৌতুক এবং ভাঁড়ামির বাহুল্যে নীলদর্পণ ছাড়া তাঁহার অন্য নাটকগুলিও যেন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নাট্যকার-রূপে দীনবন্ধুর যে অনন্যসাধারণ যোগ্যতা, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি, ছিল তাহাতে তিনি মনোযোগ দিলে, অনেক ভালো নাটক রচনা করিতে পারিতেন।

দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনে কোন না কোন সমসাময়িক ব্যক্তির অথবা ঘটনার ইঙ্গিত ছিল বলিয়া ধনিব্যক্তিদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত কোন রঙ্গমঞ্চে সেগুলি অভিনীত হয় নাই, কিন্তু সাধারণত মফঃস্বলে দীনবন্ধুর নাটকের অকুণ্ঠ আদর হইয়াছিল। কলিকাতার সাধারণ (public) রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের আরম্ভ দীনবন্ধুর নাটক লইয়াই, এবং তাহাই সাধারণ নাট্যশালার অসাধারণ সাফল্যের সূচনা করিয়াছিল।

রামনারায়ণের পৌরাণিক নাটকগুলি গুরুভার সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত এবং সেই হেতু যেন প্রাণহীন। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা হইলেও ইহাকে রোমান্টিক নাটকই বলিতে হয়। পৌরাণিক নাটকের বিষয় মহাভারত, রামায়ণ বা পুরাণের মধ্য দিয়া সকলেরই পরিচিত। সুতরাং ভক্তিরসের কিছু যোগান না থাকিলে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় আমাদের দেশে কখনই জমিতে পারিত না। এইদিকে যিনি প্রথম দৃষ্টি দিলেন তিনি মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ভক্তিভাবের অবতারণা করিয়া মনোমোহন বাঙ্গালা নাটককে নূতন পথে, কতকটা যেন যাত্রার দিকে, চালাইলেন। ইঁহারই অনুসরণে পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং রাজকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক নাটকরচনায় সবিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। মনোমোহন শুধু নাট্যকার ছিলেন না, কবিতা-লেখায় এবং হাফ-আখড়াই,

কবি ও পাঁচালীর গানরচনায় তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি ছিল। ইঁহার প্রথম নাট্যরচনা 'রামাভিষেক নাটক' (১৮৬৭) ভক্তির সহিত করুণরসের মিশ্রণের জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। প্রণয়-পরীক্ষা নাটক (১৮৬৯) একাধিক বিবাহের কুফল-বিষয়ক। রামনারায়ণের নবনাটকও এই বিষয় অবলম্বনে রচিত বটে, কিন্তু নাটক হিসাবে মনোমোহনের রচনা হইতে নিকৃষ্ট। সতী নাটক (১৮৭৩) দক্ষযজ্ঞ-বিষয়ক। ইহা ছাড়া মনোমোহন হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৭৫), পার্থপরাজয় নাটক (১৮৮১), রাসলীলা নাটক (১৮৮৯), আনন্দময় নাটক (১৮৯০) প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত নাটক তিনখানি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট রচনা। মনোমোহন বসুর নাটক বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত হইয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইঁহার দুই-একখানি নাটক এই নাট্যালয়ে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা হইয়াছিল। মনোমোহনের লেখার একটি বড় বৈশিষ্ট্য দেশপ্রীতির অকপট উদ্দীপনা।

কামিনীসুন্দরী দেবী বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম মহিলা নাট্যকার। ইঁহার 'উর্বশী নাটক' মুদ্রিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর নামের বদলে "দ্বিজতনয়া" বলিয়া উল্লেখ ছিল। ইঁহার অপর নাট্যরচনা ঊষা নাটক (১৮৭১) এবং রামের বনবাস। সব কয়টিই পৌরাণিক নাট্য।

প্রথম মুসলমান নাট্যকার হইতেছেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)। ইনি দুইখানি নাটক লিখিয়াছিলেন—বসন্তকুমারী (১৮৭৩) এবং জমীদারদর্পণ (১৮৭৩)। দ্বিতীয় বইটির বিষয় হইতেছে পল্লীগ্রামের জমীদারের অত্যাচার।

আমাদের পুরাতন যাত্রায় গীতেরই সমধিক প্রাধান্য ছিল। ইংরাজী নাটকে গীতের স্থান নাই বলিলেই হয়। তাই প্রথম যুগের বাঙ্গালা নাটকে গানের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল। এইজন্য বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় প্রাচীনরুচি শ্রোতা-দর্শকদের হৃদয়গ্রাহী হইত না। এই অসুবিধা দূর করিয়া নাটককে যাত্রার কাছাকাছি আনিবার প্রচেষ্টায় "গীতাভিনয়" অর্থাৎ আধুনিক যাত্রার প্রবর্তন হইল ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, সে জন্যও গীতাভিনয়ের আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। গীতাভিনয়ের প্রথম সঙ্কলয়িতাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান হরিমোহন কর্মকার। বেলগাছিয়া বাগানবাড়ীতে রত্নাবলীর অভিনয়ের খ্যাতি দেখিয়া ইনি রামনারায়ণ তর্করত্নের এই নাটকটি অবলম্বন করিয়া 'রত্নাবলী

গীতাভিনয়' (১৮৬৫) রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীবৎসচিন্তা (১৮৬৬) এবং জানকী-বিলাপ (১৮৬৭) ইত্যাদি গীতাভিনয়। মাগ-সর্বস্ব (১৮৭০) প্রহসনও ইঁহারই রচনা।

বাঙ্গালা নাটকের প্রথম যুগ হইতে নাট্যকাহিনী এই কয় ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল—(ক) পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান, (খ) বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কন্যাশুল্ক, পানদোষ, লাম্পট্য, অশিক্ষা, ভণ্ডামি, দলাদলি ইত্যাদি সমাজদোষ-ঘটিত, (গ) ধনী, জমিদার, কুঠিয়াল, পুলিশ ইত্যাদি প্রবলের অত্যাচার-বিষয়ক, (ঘ) রোমাঞ্চকর কাহিনী, (ঙ) বাঙ্গালা কাব্য-আখ্যায়িকা-উপন্যাস কাহিনী, (চ) সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও অনুসরণ এবং (ছ) ইংরেজী নাটকের অনুবাদ ও অনুসরণ। এই সকল ধারার আদি রচনাগুলির কথা বলিয়াছি। এখন বাঙ্গালা কাব্য-উপন্যাসঘটিত ও ইংরেজী নাটক-আশ্রিত রচনাগুলির সম্বন্ধে কিছু বলিলেই আদি-যুগের কথা শেষ হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের মোহ বোধ হয় চরমে উঠিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে নাটক নামে অজস্র তুচ্ছ রচনা প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যরসিকদের কাছে নাট্যরচনাকে নিতান্ত হেয় করিয়া তুলিয়াছিল। একে তো বাঙ্গালা নাটক ভুঁইফোড় বস্তু, তাহার উপর নাটক রচনায় যে কল্পনাবৃত্তি ও রসদৃষ্টির প্রয়োজন তাহা দুই-একজন ছাড়া কোন লেখকেরই ছিল না, সুতরাং কি রঙ্গমঞ্চে কি পাঠ্যহিসাবে বাঙ্গালা নাটকে মনোহারিত্বের কোনই উপাদান ছিল না,—শুধু রঙ্গরস ছাড়া। এইজন্য সাধারণ নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ এমন নাটক খুঁজিতে লাগিলেন যাহা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত বাঙ্গালী দর্শকের আগ্রহ আকর্ষণ করিবে। তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যে-পদ্যে নব-জাগরণ আসিয়াছে। এইজন্য মধুসূদনের মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল, বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরী, রামগতি ন্যায়রত্নের রোমাবতী, বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি, রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতা, নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি পদ্য ও গদ্য গ্রন্থ নাট্যরূপ গ্রহণ করিয়া রঙ্গালয়ে দর্শকের ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছিল। মেঘনাদবধ অবলম্বনে অনেকেই নাটক লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৭) প্রথম। উমেশচন্দ্র মিত্রের সীতার বনবাস (১৮৬৬) এই ধারার প্রথম রচনা।

বাঙ্গালা নাটক অভিনয়ের প্রথম যুগকে সখের যুগ বলা যাইতে পারে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম "সাধারণ" অর্থাৎ পেশাদারি (পাবলিক থিয়েটার—ন্যাশন্যাল থিয়েটার—প্রতিষ্ঠিত হইয়া রঙ্গাভিনয়ে দ্বিতীয় যুগের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের ও অভিনয়ের দ্বারা অর্থোপার্জনের যুগের, সূচনা করিল।

ঠিক এই সময়েই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালা দেশে জাতীয়-জাগরণের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল। অনেককাল পরে কংগ্রেসে যে আবেদন-নিবেদনমূলক জাতীয় আন্দোলন শুরু হইয়াছিল এই আন্দেলনকে তাহার ঠিক পূর্বাভাস বলা চলে না, কেননা ইহা ছিল সক্রিয় এবং গঠনমূলক। রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন। সাহিত্যে এই নব-জাগরণের আভাস পাওয়া গেল হরলাল রায়ের ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে। তাই এই দুইজনকেই বাঙ্গালা নাটকের মধ্যকালের ইতিহাসে প্রথমেই স্থান দিতে হয়। ইঁহাদের অনুসরণে অনেক নাট্যকার তাঁহাদের নাটকে দেশপ্রেমের মহিমা খ্যাপন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

হরলাল রায়ের প্রথম রচনা হেমলতা নাটক (১৮৭৩) ইংরেজী রোমান্টিক নাটকের ছাঁচে ঢালা। দ্বিতীয় রচনা শত্রুসংহার নাটক (১৮৭৪) সংস্কৃত বেণীসংহার নাটক অবলম্বনে লেখা। বঙ্গের সুখাবসানে (১৮৭৪) বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গবিজয় বর্ণিত হইয়াছে। রুদ্রপাল নাটক (১৮৭৪) ও কনকপদ্ম যথাক্রমে শেক্‌স্পিয়রের হ্যামলেট ও কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল অবলম্বনে রচিত। হরলালের নাটকগুলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম রচনা হইতেছে—'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২) প্রহসন। পরে ইনি আরও দুইখানি মৌলিক প্রহসন লিখিয়াছিলেন—'এমন কর্ম আর করব না' বা 'অলীক বাবু' (১৮৭৭) ও 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) ফারসী নাট্যকার মোলিয়ের-এর দুইখানি প্রহসন ইনি বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন— 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮১) এবং 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৯০২)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটক চারিখানি — পুরুবিক্রম (১৮৭৪), সরোজিনী বা চিতোর-আক্রমণ (১৮৭৫), অশ্রুমতী নাটক (১৮৭৯) এবং স্বপ্নময়ী (১৮৮২)। চারিখানি নাটকেই দেশানুরাগ এবং বিশেষ করিয়া বিদেশীর আক্রমণ ও শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। পুরুবিক্রম

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ লইয়া রচিত। ইহার প্রধান ভূমিকা ঐলবিলার চরিত্রে গ্রীক নাটকের ছায়াপাত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সব নাটকেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা নারীর, এবং এই নারী-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য দৃঢ়তা ও দেশপ্রেম। সরোজিনী নাটকের প্লট পরিকল্পিত হইয়াছে রাজপুত ইতিহাসের পটভূমিকায়। প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেস্-এর ইফিগেনীয়া নাটকের ছায়া এখানে সুস্পষ্ট। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের কিছু প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। প্রতাপসিংহ-মানসিংহের দ্বন্দ্বের পরিণামের উপর অশ্রুমতী-কাহিনী গড়া হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে বর্ধমানে শোভাসিংহের বিদ্রোহ-কাহিনী অবলম্বন করিয়া স্বপ্নময়ীর প্লট বিরচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন নাটককেই ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। কেননা কয়েকটি নাম এবং দুই-চারিটি অবান্তর ঘটনা ছাড়া প্রায় সবই নাট্যকারের উদ্ভাবনা। সরোজিনী, অশ্রুমতী এবং স্বপ্নময়ী এই তিনটি নারীভূমিকার মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র আছে। তিনজনেই পিতৃবৎসল এবং পিতৃস্নেহলালিত দুহিতা, এবং তিনজনকেই দৈববশে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত পিতৃইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল। তাহার ফলেই তাহাদের জীবনের পরিণতি নিতান্ত ট্র্যাজিক হইয়াছিল। (এই তিনখানি নাটকে রবীন্দ্রনাথ-রচিত কয়েকটি গান এবং কবিতা গৃহীত হইয়াছে। এই রূপ গান ও কবিতা স্বপ্নময়ীতে সব চেয়ে বেশি আছে। স্বপ্নময়ী ভূমিকার পরিকল্পনাতেও রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার প্রভাব নিতান্ত দুর্লক্ষ্য নয়।) অভিনয়ে আর পাঠে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্তী একাধিক নাট্যকারের দ্বারা অনুকৃত হইয়াছিল। সরোজিনী নাটক যাত্রার পালা রূপেও খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুইটি ইংরেজী নাটকের ও বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কোন ভালো সংস্কৃত নাটকই তিনি বাদ দেন নাই। তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিক্রমোর্বশী নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৬৮)। ইহা তাঁহাদের নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছিল। বহুকাল পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও স্বতন্ত্রভাবে এই নাটকটি অনুবাদ করিয়াছিলেন। ফরাসী সাহিত্য হইতে তিনি নাটক ছাড়াও অনেক কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ দাসের (১৮৪৮-১৮৯৫) সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকে (১৮৭৫)

নব-উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবোধ এক নূতন পথ অনুসরণ করিল। গভর্নমেন্টের এক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর অত্যাচার ও তাহার বিরুদ্ধে শারীরিক বলপ্রয়োগ এই নাটকটির বিষয়। ইহার পূর্বে রচিত শরৎ-সরোজিনী নাটকেও (১৮৭৪) দেশপ্রীতির এবং পরাধীনতাবেদনার পরিচয় আছে। এই নাটক দুইটি বাঙ্গালা নাটকরচনায় ও অভিনয়ে নূতনত্ব আনিয়া দিয়াছিল। আধুনিক ইংরেজী "থ্রিলার" জাতীয় গল্পে যেমন অদ্ভুত দুঃসাহস, খুন-জখম-লাঠি-পিস্তল ইত্যাদির অকুণ্ঠ ব্যবহার এবং ঘটনার দ্রুতগতি দেখা যায়, এই দুই নাটকের কাহিনীতেও তাহাই পাই। এই কারণে নাটক হিসাবে মোটেই উঁচুদরের না হওয়া সত্ত্বেও বই দুইটি অভিনয়ে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নাটক দুইটির কোনটিই গ্রন্থকারের নামে প্রকাশিত হয় নাই। শরৎ-সরোজিনী "দুর্গাচরণ দাস" এই ছদ্মনামে ছাপা হইয়াছিল। সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতে উপেন্দ্রনাথ দাসের নাম ছিল প্রকাশক বলিয়া। উপেন্দ্রনাথ অনেককাল পরে আরও একটি নাটক লিখিয়াছিলেন—দাদা ও আমি (১৮৮৮)। এ নাটকটি ইংরেজী ছায়াবলম্বনে লেখা, অভিনয়ে তেমন সমাদর লাভ করে নাই। উপেন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় রঙ্গালয়ের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এবং উপেন্দ্রনাথের নাটকের সাফল্য অনেক উদীয়মান নাটকরচয়িতার মনে ঈর্ষাক্ষুব্ধ অশান্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। উমেশচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক নাটকে "গ্রন্থ-সম্বন্ধে একটি কথা"-য় তাঁহার পূর্বতন নাটক "বীরবালা"-র উপযুক্ত সমাদর না হওয়া প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "এখনকার রুচি, নায়ককে ডনকুইকসটের মত সাজাইয়া এবং নায়িকাকে হারমনিয়ম বাজাইতে বাজাইতে গান করাইয়া পাঠকের এবং গ্রন্থ অভিনয়কালে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখবর্তী করা, দুই একটি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নায়ক দ্বারা বা কোন উপায়ে জুতা লাঠি পিস্তল মারা কিংবা প্রাণে বধ করা, একটি বাঙ্গালী বালিকা কর্তৃক বহুসংখ্যক গোরা সৈনিকের প্রতি বন্দুক বা পিস্তল ছোড়া, এ সকল তোমার বীরবালাতে কিছুই নাই, গতিকেই ইহা মিষ্ট লাগিলেও দুর্গন্ধ-যুক্ত।"

উমেশচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন ঐতিহাসিক ও গদ্যলেখক রজনীকান্ত গুপ্তের ভ্রাতা। ইঁহার প্রথম নাট্যরচনা হেমনলিনী (১৮৭৪)। ইতিহাসের পটভূমিকায় উপস্থাপিত হইলেও নাটকটির বিষয় গার্হস্থ্য। বীরবালা নাটকে (১৮৭৫)

পুরুবিক্রম-কাহিনীর যেন অনুবৃত্তি করা হইয়াছে। আখ্যানবস্তু হইতেছে—গ্রীক ক্ষত্রপ সেলেউকস ("শিলবক্ষ") এবং চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ, সেলেউকসের পরাজয়, তাঁহার কন্যা বীরবালার চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরাগ ও অবশেষে দুইজনের পরিণয়। চাণক্যের ভূমিকা অপ্রধান, এবং নারীচরিত্রগুলি সর্বাংশে বাঙ্গালী নারী রূপে পরিকল্পিত। মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক (১৮৭৬) নাটকের কয়েকটি ভূমিকা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও নাটকটি ঐতিহাসিক নয়। উমেশচন্দ্রের নাটক রঙ্গালয়ে চলে নাই।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ কৃতী নট-নাট্যকার। ইঁহার নাটক সংস্কৃত অথবা ইংরেজী নাটকের অনুকরণ বা অনুসরণ মাত্র নয়। বাঙ্গালীর জাতীয়প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইনি নিজস্ব আদর্শে নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর মন রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকাহিনীর রসে চিরদিনই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়াছে। শুধু বাঙ্গালীর মন কেন, নিখিল ভারবর্ষের অন্তরাত্মা যুগে যুগে পুরাণকাহিনীর আদর্শ চরিত্রের ছবি-প্রতিচ্ছবি কাব্যে নাটকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে পুরাণবর্ণিত অনেকগুলি আদর্শ চরিত্র নূতনভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। মনোমোহন বসুর নাটকে যে ভক্তিরসের প্রথম আবির্ভাব দেখিয়াছি তাহাই গিরিশচন্দ্রে নাটকগুলিতে গাঢ়তর হইয়াছে। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব গিরিশচন্দ্রে পৌরাণিক নাটকগুলির জনপ্রিয়তার হেতু। পাগল মাতাল গাঁজাখোর অথবা সেই রকম নির্লিপ্ত উদাসীন ব্যক্তির ভূমিকা গিরিশচন্দ্রের নাটকের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহারও পূর্বাভাস পাইয়াছিলাম মনোমোহন বসুর নাটকে। শুধু পৌরাণিক কাহিনী নহে, গিরিশচন্দ্র কতিপয় গার্হস্থ্য চিত্র এবং বীররসাশ্রিত ঐতিহাসিক উপাখ্যান লইয়াও অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সর্বত্রই ভক্তি ও কারুণ্যের প্রবাহ।

'আনন্দ রহো' (১৮৮১) গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক। তাহার পর ইনি সীতার বনবাস, রাবণবধ, সীতাহরণ, লক্ষ্মণবর্জন, অভিমন্যুবধ প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক এবং মোহিনীপ্রতিমা, মলিনমালা মায়াতরু প্রভৃতি গীতিনাট্য রচনা করেন। ইঁহার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম হইতেছে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

(১৮৮৩), চৈতন্যলীলা (১৮৮৪), বুদ্ধদেব-চরিত (১৮৮৫), বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (১৮৮৬), প্রফুল্ল (১৮৯১), জনা (১৮৯৪), পাণ্ডব গৌরব (১৯০০), সৎনাম বা বৈষ্ণবী (১৯০৪), সিরাজদ্দৌলা (১৯০৫), বলিদান (১৯০৫) ইত্যাদি।

বাঙ্গালীর মন ভক্তি ও করুণরসে যত সহজে আর্দ্র হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। এই দুই রসের সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্র বিশেষ নিপুণতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রায় আশীখানি নাটক-নাটিকা-গীতিনাট্যে সাত-আট শতেরও উপর বিভিন্ন চরিত্র কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার দক্ষতায় এই বিভিন্ন চরিত্রের অনেকগুলিই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের সন্তান। গ্রীক-ট্র্যাজেডি লেখকগণের অথবা শেক্‌স্‌পিয়রের দরের নাট্যকার তাঁহাকে বলা চলে না। তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সমাজের পারিপার্শ্বিক অনেক সঙ্কীর্ণ ছিল। তাঁহার ধর্ম-বিশ্বাসনিষ্ঠ বুদ্ধি উচ্চশিল্পের স্বাধীনতাকে প্রায়ই সঙ্কুচিত ও ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে। তাহা না হইলে তাঁহার নাট্যসৃষ্টি আরও মূল্যবান্ হইতে পারিত।

আমাদের দেশে সাধারণ নাট্যশালা অর্থাৎ যাহা অবৈতনিক বা সখের থিয়েটার নহে, তাহার প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালার দুইটি নট-নাট্যকার পরস্পর সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এই দুইজনের একজন হইতেছেন গিরিশচন্দ্র, আর একজন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)। গিরিশচন্দ্রের মত অমৃতলালও ছিলেন একাধারে সুদক্ষ অভিনেতা এবং যশস্বী নাট্যকার। সরস রচনায় অমৃতলালের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। ইঁহার নাট্যগ্রন্থগুলি প্রায়ই লঘুধরণের, হাস্যরসবহুল। অমৃতলালের প্রথম নাটক হইতেছে 'হীরকচূর্ণ' বা 'গাইকোয়াড় নাটক' (১৮৭৫)। স্থানীয় রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপ্রয়োগে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে বরোদার গাইকোয়াড় মলহর রাওয়ের বিচার ও নির্বাসন—এই সমসাময়িক ঘটনা লইয়া নাটকটি লেখা। (এই সময়ে আরও দুইজন নাট্যকার এই বিষয়ে নাটক লিখিয়াছিলেন—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রনাথ মিত্র।) সমাজ- ও ব্যক্তি-বিশেষের দৌর্বল্য এবং সাময়িক ঘটনা লইয়া লেখা নক্‌শা ও প্রহসনগুলিতে অমৃতলাল চমৎকার সরসতার অবতারণা করিয়াছেন। বিবাহ-বিভ্রাট (১২৯১), বাবু (১৩০০), একাকার (১৩০১), গ্রাম্যবিভ্রাট (১৩০৪), অবতার (১৩০৮), খাসদখল (১৩১৮) ইত্যাদি প্রহসন

অমৃতলালের ভালো রচনা। অমৃতলালের কতকগুলি প্রহসনের বিষয়বস্তু বিদেশী সাহিত্য হইতে পরিগৃহীত।

এই যুগের পৌরাণিক নাট্যকারদিগের মধ্যে গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালের পরেই বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের (মৃত্যু ১৯০১) এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯-১৮৯৪) নাম করিতে হয়। বিহারীলালের রচিত অনেকগুলি পৌরাণিক নাট্য এবং প্রহসন অভিনয়ে লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। ইনিও বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসকে অভিনয়োপযোগী নাট্যরূপ দিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—কাব্য, উপন্যাস এবং নাটক। ইঁহার অনলে বিজলী (১৮৭৮), প্রহলাদচরিত্র (১৮৮৪) প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। নাটকে এবং কাব্যে রাজকৃষ্ণের প্রতিভার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয় অবস্থা অনুকূল হইলে ইঁহার রচনা উৎকৃষ্টতর হইত। নাটকে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরের ব্যবহারে রাজকৃষ্ণ অগ্রণী ছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) পৌরাণিক নাটককে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব হইতে কতকটা মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহার নাটক গিরিশচন্দ্রের নাটকের মত অতটা ভক্তি-রসসিক্ত নয়। পৌরাণিক মহৎচরিত্রগুলিকে ইনি বুদ্ধির দিক দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের প্রভাব ক্ষীরোদচন্দ্রের কয়েকটি নাটকে সুস্পষ্টভাবে পড়িয়াছে। ইঁহার নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রঘুবীর (১৯০৩), ভীষ্ম (১৯১৩), নরনারায়ণ (১৯২৬) ইত্যাদি। কিন্তু ইঁহার সর্বাধিক জনপ্রিয় রচনা 'আলিবাবা' (১৮৯৭) আরব্য-উপন্যাস কাহিনী লইয়া বিরচিত। এই গীতিনাট্যটি বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে চিরনবীন রহিয়াছে। ইহার পূর্বে ইনি বেদৌরা নাটক (১৮৯৬) রচনা করিয়াছিলেন। তবে আরব্য-উপন্যাসের কাহিনী লইয়া নাট্যরচনার সূচনা গিরিশচন্দ্রের দ্বারা হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) নাট্যকার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেও এবং ইঁহার চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান প্রভৃতি নাটক অভিনয়ে অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও ইনি একখানি—সীতা (১৯০২)—ছাড়া যথার্থ ভালো নাটক রচনা করিতে পারেন নাই। প্লটের মধ্যে সরল প্রবাহের অভাব, ভূমিকাগুলিতে

স্বাভাবিক পরিণতির ব্যতিক্রম, স্থান-কাল-পাত্রের বৈসাদৃশ্য এবং কথোপকথনের কৃত্রিমতা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রধান দোষ। ইঁহার সবচেয়ে খ্যাত নাটক—চন্দ্রগুপ্ত—উমেশচন্দ্র গুপ্তের বীরবালা নাটকের প্রায় যথাযথ অনুকরণ। তবে দুর্গাদাস (১৯০৬), নুরজাহান (১৯০৭), মেবারপতন (১৯০৭), সাজাহান (১৯১০) ও চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১)—এই ইতিহাসাশ্রিত নাটকগুলি অভিনয়ে অত্যন্ত সাফল্যলাভ করিয়াছিল।

নাট্যকার বলিয়া যেমন হোক কবি এবং বিশেষ করিয়া 'হাসির গান' রচয়িতা-রূপে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে একটি গৌরবময় আসন অধিকার করিয়া থাকিবেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, কলিকাতায় অন্যত্র এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটক-গীতিনাট্যের যে অভিনয় করাইতেন তাহাতে রঙ্গমঞ্চে নাট্যপ্রয়োগে অভিনবতা দেখা গিয়াছিল। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী (মৃত্যু ১৯৫৯) সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাট্যপ্রয়োগে যুগান্তর আনিয়াছিলেন। এই নাট্যাচার্যের প্রতিভায় এবং কতকটা সিনেমার প্রভাবে বাঙ্গালা নাটক রচনায় নূতন রীতি দেখা দিয়াছে।

৮. সরস গদ্যরচনা

কোন সাময়িক-পত্রে গোড়া হইতেই ব্যঙ্গরচনার কিছু কিছু চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। কলিকাতার ধনীসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা, ইংরেজী শিক্ষিতের আচরণ ধর্ম-অনুষ্ঠানে কদাচার ইত্যাদি বিষয় তখনকার ব্যঙ্গরচনার সামগ্রী ছিল। এই ধরণের বই লেখার প্রথম প্রচেষ্টা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস'। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কোন কোন কবিতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ব্যঙ্গরচনার সবচেয়ে ভালো নিদর্শন পাই।

রঙ্গব্যঙ্গের জন্য নয়, শুধুই অল্পশিক্ষিতের মনোহরণের জন্য—অবশ্য শিক্ষার অনুপান রূপে—প্রথম সার্থক বই লিখিলেন "টেকচাঁদ ঠাকুর" ছদ্মনামধারী প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)। হিন্দু কলেজের একজন নামজাদা ছাত্র, দেশি ও বিলাতি উভয় সমাজেই সমাদৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতায় শিক্ষিত মনস্বী ও কর্মদক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে প্যারীচাঁদ একজন। গৃহস্থঘরের

মেয়েদের পড়িবার জন্য ইনি 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি ক্ষুদ্রকায় পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা রচনা 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) প্রথমে এই পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল। কলিকাতার উপকণ্ঠবাসী ধনীর ছেলে আদর পাইয়া ও শিক্ষা না পাইয়া কি করিয়া উচ্ছন্ন যায় তাহাই আলালের ঘরের দুলাল বইটিতে দেখানো হইয়াছে। ইহার পূর্বে কোন লেখক এক-আধটি ছোটবড় কাহিনী লিখিয়াছিলেন। তাহার কোন কোনটিতে—যেমন মিসেস্ মুলেন্স্-এর 'ফুলমণি ও করুণা'য়—উপন্যাসের আয়তন আছে। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের মত কোনটিতেই উপন্যাসের রসরূপ প্রতিফলিত নয়। অবশ্য আলালের ঘরের দুলালেও উপন্যাসের সমস্ত লক্ষণ নাই। তবে কাহিনীর বিস্তৃতি ও ধারাবাহিকতা, ভূমিকার বাহুল্য ও বৈচিত্র্য এবং বিষয়ের আকর্ষণ ও হৃদ্যতা—যাহা যাহা উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ তাহা সবই আছে। শুধু তাই নয়। রচনারীতি সরস এবং যথাসম্ভব কথ্যভাষার পদ-সংকলিত ও ইডিয়ম-মণ্ডিত। বিদ্যাসাগর যখন বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যে একচ্ছত্রতার অধিকারী তখন কথ্যভাষার ছাঁদে বই লিখিয়া প্যারীচাঁদ অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। সকলেরই সহজবোধ্য অথচ রসবান—ইহাই তাঁহার গদ্যরীতির বিশেষ গুণ। তবু দোষও কিছু ছিল। ইহা মুখের ভাষাও নয়। লেখার ভাষাও নয়। তবে পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ নব্যতন্ত্রের লেখকদের উপর ইহার প্রভাব পড়িয়াছিল। আলালের ঘরের দুলালে যে বাঙ্গালা উপন্যাসের পূর্বাভাস আছে তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। বইটিতে ঠকচাচার চরিত্র যেরূপ জীবন্তভাবে ফুটিয়াছে তাহা ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের লেখনীর অনুপযুক্ত নয়। ছোটখাট লিপিচিত্রে চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে প্যারীচাঁদের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। এই গুণে তাঁহার অপর গ্রন্থগুলি উপদেশাত্মক ও তত্ত্বকথাঘটিত হইলেও একেবারে রসহীন নয়। প্যারীচাঁদের অপর উল্লেখযোগ্য আখ্যায়িকা হইতেছে 'অভেদী' (১৮৭১)। ইহার ভাষা অনেকটা সাধুভাষা-ঘেঁষা। এটিকে ধর্মমূলক আখ্যায়িকা বলা যাইতে পারে। প্যারীচাঁদের অপর গদ্যরচনা এইগুলি—মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯), রামারঞ্জিকা (১৮৬০), যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫) এবং আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)। ইনি কিছু অধ্যাত্মসঙ্গীতও লিখিয়াছিলেন। সেগুলি 'গীতাঙ্কুর' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্বে একাধিক প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) নাম করিয়াছি। ইনি একজন ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। ত্রিশ বৎসরব্যাপী স্বল্পপরিসর জীবনের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সাহিত্য, সমাজ ও দেশের হিতকর বহু কাজ করিয়া গিয়াছেন। তের বৎসর বয়সে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্য "বিদ্যোৎসাহিনী সভা" প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার পক্ষ হইতে বাঙ্গালায় কাব্যরচনার জন্য মধুসূদন দত্তকে এবং নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য লঙ্ সাহেবকে সংবর্ধিত করা হইয়াছিল। সভার মুখপত্র 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' ছাড়া আরও দুই-একটি পত্রিকা তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। কয়েকখানি নাটক প্রকাশের পর কালীপ্রসন্ন 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' রচনা করেন (১৮৬২)। সেকালের কলিকাতার আচারব্যবহার, পালপার্বণ, সভাসমিতি ইত্যাদি সামাজিক উৎসব ও ঘটনা হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় সরসভাবে বর্ণিত ও উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। পুরাপুরি কথ্যভাষায় বই লেখা বাঙ্গালীর এই প্রথম। হুতোমের ভাষা কলিকাতার কথ্য ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা আলালের ঘরের দুলালের ভাষার মত সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ নয়। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় কোন কোন মান্য ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ ছিল। তাহার প্রতিবাদে এইধরণের দুই-একখানি বই লেখা হইয়াছিল। সাহিত্য হিসাবে সেগুলির কোন মূল্য নাই।

কালীপ্রসন্নের অক্ষয় কীর্তি অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারতের গদ্য অনুবাদ 'পুরাণ সংগ্রহ' প্রকাশ (১৮৫৮-১৮৬৬)। এই কার্যে তিনি বিদ্যাসাগর-প্রমুখ বড় বড় পণ্ডিতের সাহায্য পাইয়াছিলেন।

৯. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও সমসাময়িক কবিতা

আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যের যুগপ্রবর্তক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে যশোর জেলায় কপোতাক্ষ-তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ, মাতার নাম জাহ্নবী। পিতামাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া মধুসূদনের শৈশব ও বাল্যকাল অত্যধিক আদরে যাপিত হয়। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়া মধুসূদন কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। রাজনারায়ণ কলিকাতার সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করিতেন, থাকিতেন খিদিরপুরে। ভুদেব

মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন। এখানে ছাত্র হিসাবে মধুসূদন বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভিতরে যে অসামান্য তেজ এবং অদম্য উচ্চাভিলাষ ছিল তাহা অযথা প্রশ্রয় পাইয়া অচিরে ভবিষ্যৎ দুঃখদুর্দশার সূচনা করিল। ইংরেজী সাহিত্যের রস এবং ইংরেজ অধ্যাপকদের সাহচর্য পাইয়া স্ব-সমাজে ও স্ব-ধর্মে মধুসূদনের আস্থা কমিয়া গেল। খ্রীষ্টান হইলে পাকাপাকি সাহেব হইতে পারিবেন এই দুরাশার ছলনায় মধুসূদন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এখন তাঁহার নাম হইল মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাহার পর পাঁচ বৎসরকাল খ্রীষ্টান পাদ্‌রিদের শিক্ষায়তন বিশপ্‌স্‌ কলেজে তিনি হিব্রু গ্রীক লাতনী এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তাহার পর মাদ্রাজে গিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া, ও সংবাদপত্রে লিখিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে থাকেন। কবিজীবনের সূত্রপাতও সেইখানেই। মাদ্রাজে থাকিয়া তিনি ইংরেজীতে 'ক্যাপটিভ লেডী' ও 'ভিসন্‌স্‌ অব দি পাসট্‌' ইত্যাদি কাব্য ও কবিতা রচনা করেন। প্রথমে যে বিদেশিনী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন তাঁহার সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় মধুসূদন অন্য একটি বিদেশিনী মহিলাকে বিবাহ করেন। কিছুকাল পরে পিতামাতার পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া মধুসূদন কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে তাঁহার অধিকাংশ পৈতৃক সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। মধুসূদন পুলিশ-কোর্টে চাকরি করিতে লাগিলেন এবং ইংরেজীতে কাব্যরচনার প্রয়াস ব্যর্থ বুঝিয়া মাতৃভাষার অনুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন। বাঙ্গালাতে ভালো নাটকের অভাব দেখিয়া তিনি প্রথমে নাটক-ও প্রহসন-রচনায় মন দিলেন। শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০), বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০) এবং পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০) প্রকাশিত হইল। নাটকরচনা করিতে করিতে তাঁহার এমন এক নূতন প্রেরণা জাগিল যাহাতে বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের রূপ একেবারে বদলাইয়া গেল,—তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করিলেন। এই ছন্দে রচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবিধার্থসংগ্রহে অংশত প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুস্তকাকারে বাহির হয়। তাহার পর এই ছন্দে মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) ও বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), এবং বিচিত্র সমিল ছন্দে ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) প্রকাশিত হইল। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্বপ্রথম কবিচিত্তের আত্মপ্রকাশমূলক কবিতা 'আত্মবিলাপ'

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। কাব্য সৃষ্টির উন্মাদনার কালেও মধুসূদন নাটকরচনা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকুমারী নাটক প্রথম ছাপা হয়, বিক্রয়ার্থ প্রকাশিত হয় চারি বৎসর পরে। সেকালের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহা শ্রেষ্ঠ নাটক। নাটকটির প্লটে গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেস-এর ও ইংরেজ নাট্যকার শেক্স্পিয়রের প্রভাব আছে। মৃত্যুর পূর্বে কবি আরও দুইখানি নাটকরচনায় হাত দিয়াছিলেন। একখানি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই, অপরখানি—'মায়াকানন'—সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বিলাত যাইবার বাসনা মধুসূদনের বরাবরই ছিল, সুযোগের অভাবে যাইতে পারেন নাই। অবশেষে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি ব্যারিষ্টারি পড়িতে বিলাত যাত্রা করিলেন এবং সেখানে পাঁচ বৎসর থাকিয়া ফরাসী ইতালীয় প্রভৃতি বিবিধ ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করিলেন। বিলাতে যখন অর্থাভাবে পড়িয়া তিনি নিদারুণ কষ্ট পাইতেছিলেন তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অর্থ সাহায্য পাঠাইয়া উদ্ধার করেন। ইঁহার সহায়তা ব্যতিরেকে কবির ব্যারিষ্টারি পাশ তো দূরের কথা, প্রাণ বাঁচিত কিনা সন্দেহ। দেশে ফিরিয়া আসিলে বিদ্যাসাগরের নিকট তিনি পিতৃবৎ অভ্যর্থনা ও সহায়তা পাইয়াছিলেন। ফরাসী দেশে থাকিবার সময়ে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কবি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহাই প্রথম 'সনেট'-জাতীয় কবিতাবলী। মধুসূদনের পর অনেক কবি সনেট লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন ছাড়া কেহই মধুসূদনের মত কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া মধুসূদন ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে মোটেই সুবিধা করিতে পারিলেন না। তাঁহার আর্থিক ও মানসিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। ইহার পর তিনি দুইখানি মাত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—হেক্টর বধ (১৮৭১) এবং মায়াকানন (১৮৭৪)। হেক্টর বধে কবি বাঙ্গালা গদ্যে প্রাচীন গ্রীসের মহাকবি হোমরের ইলিয়দ্ মহাকাব্যের উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়াছেন। এই দুইখানি পুস্তকে কবির সে প্রচণ্ড প্রতিভার শুধু ভগ্নাবশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। আশাভঙ্গ -জনিত নিদারুণ মনোবেদনা এবং দেহযন্ত্রণা ও সংসারদুঃখ ভোগ করিয়া মধুসূদন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন তারিখে স্বর্গারোহণ করিলেন। বাঙ্গালার প্রচণ্ড কবি প্রতিভা আপনার অন্তর্দাহে আপনি দগ্ধীভূত হইয়া

নির্বাণ লাভ করিল, সম্পূর্ণভাবে স্ফূর্তি পাইবার সুযোগ ও অবকাশ পাইল না—ইহা—বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য।

হোমর ভার্জিল দান্তে তাসসো মিল্‌টন প্রভৃতি ইউরোপীয় কবির মহাকাব্যের অনুসরণে মধুসূদন বাঙ্গালাতে মহাকাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা সত্য কথা। কিন্তু মধুসূদনের মহাকাব্য অনুকরণ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, ইহা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি। বহু ভাষার ও সাহিত্যের রসবেত্তা কবির লেখার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের যে সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহা অপর কোন বাঙ্গালী লেখকের রচনায় দেখা যায় নাই। বাল্যকাল হইতে মধুসূদন রামায়ণ-মহাভারতের রসে মগ্ন ছিলেন। ফরাসী দেশে ভের্সাই শহরে বসিয়া তিনি যখন সনেট্-রচনা করিতেছেন, তখনও কাব্যের বিষয় বলিয়া তাঁহার মনে জাগিতেছে কাশীরাম দাস, বিজয়া দশমী, শ্রীমন্তের টোপর, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি। রামায়ণ-কাব্যের অপরূপ মাধুর্যে কবির চিত্ত সারাজীবন ভরিয়া ছিল। ভারতবর্ষীয় শাশ্বত-কবিচিত্ত-কমলবিহারিণী সীতাদেবীর কথা কবির মানসে সর্বদাই জাগরূক ছিল। একথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই,

> "অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
> বৈদেহি।"
> "কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
> নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
> নিত্যকান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে।"

তাই বাঙ্গালা সাহিত্যে ওজোগুণের অভাব দেখিয়া কবি যখন বীররসাশ্রিত "মহাকাব্য" প্রণয়ন করিতে সংকল্প করিলেন, তখন স্বভাবতই রামায়ণকাহিনীর প্রতি তাঁহার মন ঝুঁকিল। মেঘনাদ-বধ বাঙ্গালাতে প্রথম এবং একমাত্র বীররসানুপ্রাণিত "মহাকাব্য"।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ওজোগুণের অবতারণা করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল বাঙ্গালা ভাষার ও ছন্দের স্বরবহুলতা ও লালিত্য। কবি প্রথম দোষ শুধরাইয়া লইলেন প্রচুরভাবে আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়া এবং নামধাতুর সৃষ্টি করিয়া, আর ছন্দের ওজোহীনতা নিরাকরণ করিলেন অমিত্রাক্ষর

পয়ার প্রবর্তন করিয়া। প্রায় সকল বাঙ্গালা ছন্দের মূলে আছে পয়ার। পয়ারের প্রধান লক্ষণ হইতেছে অষ্টম ও চতুর্দশ অক্ষরের পর যতি, এবং শেষ যতিতে মিল। যতির স্থান নির্দিষ্ট থাকায় পয়ারে ব্যঞ্জনঝঙ্কারময় ওজস্বী সংস্কৃত শব্দ বেশি ব্যবহার করা অসম্ভব ছিল, এবং চরণে চরণে মিল থাকায় বাক্য এবং ভাব দুই চরণে শেষ করিতেই হইত। প্রতিভাবলে মধুসূদন এই দুই বাধা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিলেন, চরণের বাধা ছাড়াইয়া শেষে যতি উপচিয়া পড়িল, অথচ পয়ারের ঠাট ভাঙ্গিল না। তিনি যে অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিলেন তাহা মোটেই বিদেশী আমদানি নহে, ইহার মূলে বাঙ্গালা পয়ারেরই ধ্বনিপ্রবাহ এবং নির্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যা রহিয়াছে, কেবল অন্ত্য অনুপ্রাস (অর্থাৎ মিল) নাই এবং অষ্টম অক্ষরে যতি আবশ্যিক নয়। বাঙ্গালা ছন্দ স্বীয় বিশিষ্টতা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াই এই অভাবিতপূর্ব নূতন রূপ পাইল। বাঙ্গালা কবিতা নবজন্ম লাভ করিল।

বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে মশগুল থাকিয়া বিদেশী ধর্ম, পোষাক ও আচারব্যবহার অবলম্বন করিলেও মধুসূদন মনে-প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের আবহমান ধারার সহিত তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির ঐকান্তিক বিচ্ছেদ ঘটে নাই। অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও বৈষ্ণব গীতিকাব্যের সুর ভারতচন্দ্রের গানের মধ্য দিয়া আসিয়া তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মধ্যে অনুরণিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে ওজস্বী কাব্য মধুসূদনের পরে আর রচিত হয় নাই।

মধুসূদনের পরবর্তী দুইজন কবির রচনার মধ্যে ইংরেজী কাব্যসুলভ স্বানুভূতি-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রথম মিলিল। এই দুই কবি হইতেছেন বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮)। বিহারীলালের শিক্ষা সংস্কৃত কলেজে। ১২৬৫ সালে ইনি 'পূর্ণিমা' পত্রিকা প্রকাশ করেন, ইহাতে ইহার কয়েকটি কবিতা বাহির হয়। তাহার পর ইনি 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা সম্পাদন করেন, ইহাতে বঙ্গসুন্দরী কাব্যের (১৮৭০) কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যরূপে বিহারীলাল বাঙ্গালা কাব্যের আসরে নামেন। ইহার বন্ধুবিয়োগ এবং প্রেমপ্রবাহিণী (১৮৭০) কাব্য দুইটিতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে (১৮৭০) এই প্রভাবের চিহ্ন থাকিলেও কবির নিজস্ব রীতি দেখা দিয়াছে। বঙ্গসুন্দরীতে

বিহারীলালের প্রতিভা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদা-মঙ্গল। ইহার রচনা আরম্ভ হয় ১২৭৭ সালে। ইহা ১২৮৩ সালে আর্যদর্শন পত্রিকায় খণ্ডশ, আর ১২৮৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বিহারীলালের কাব্যপ্রেরণার মূলে ছিল প্রেমপ্রবণতা, এবং এই প্রেমপ্রবণতা প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহার পত্নীকে আদর্শ করিয়া। 'সাধের আসন' কাব্যে ইহা মাতৃমূর্তির এবং মহীয়সী নারীর সাধারণ আদর্শের কল্পলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কবিহৃদয়ের যে স্বতঃপ্রকাশ বিহারীলালের কাব্যে প্রথম দেখা গেল, মধুসূদনের কাব্যে তাহা আভাসিত ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিহারীলালই প্রথম প্রকৃত রোমান্টিক কবি। বিহারীলালের কাব্যে দোষ-গুণ প্রায় সমান সমান। বিহারীলাল শব্দশিল্পী ছিলেন না। তাঁহার ভাষায় অমার্জিত শৈথিল্য, এবং কাব্যের বস্তু স্পষ্ট ও সংহত নয়। কিন্তু কবি-অনুভূতির প্রগাঢ়তা, স্বতঃস্ফূর্তি ও অকৃত্রিম প্রকাশই বিহারীলালের কাব্যের অসাধারণতা। ছন্দের লঘুতায় ও লালিত্যে কবি নূতন পথ দেখাইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রবন্ধ ও কবিতা বিবিধার্থসংগ্রহ, মঙ্গল-ঊষা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। কয়েকটি ছোটখাট কবিতা ছাড়া ইনি একখানি নাটক—হামির—ও চারি-পাঁচখানি ছোটবড় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে 'মহিলা কাব্য'। এই কাব্য তিন অংশে বিভক্ত—উপহার, মাতা ও জায়া। ভগিনী নামক চতুর্থ অংশেরও পত্তন কবি করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প কয় ছত্রের পর কবি আর লিখিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ কাব্যে নারীর চারি মূর্তির—মাতা, জায়া, ভগিনী, দুহিতা—প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবেন। মহিলা কাব্যের রচনা ১২৭৮ সালে আরম্ভ হয়। কাব্যটি প্রকাশিত হইয়াছিল কবির মৃত্যুর পরে ১২৮৭-৮৯ সালে। সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বড় কবিতা সবিতা-সুদর্শন ১২৭৫ সালে রচিত এবং ১২৭৭ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অমতে ছাপা হইয়াছিল বলিয়া কবি কাব্যটির প্রচার বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যের সহিত বিহারীলালের কাব্যের কতকটা সাধর্ম্য আছে। উভয়ের কাব্যেই বর্ণনীয় বস্তুর বাহ্যরূপ অপেক্ষা কবিচিত্তে তাহা যে অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে তাহার মূল্য বেশী। এই হৃদয়াবেগের অনুভূতি ও প্রকাশ বিহারীলালের কাব্যে

যেমন বহির্নিরপেক্ষ ও আন্তরিক সুরেন্দ্রনাথের কাব্যে তেমন নয়। কিন্তু পদলালিত্যে না হউক রচনার প্রগাঢ়তায় সুরেন্দ্রনাথের রচনার অনন্যতা অস্বীকার করা যায় না। বিহারীলালের কাব্যে বিদেশী কবির প্রভাব নিতান্তই ক্ষীণ, সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণভাবে খাটে না। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যপদ্ধতি মধুসূদন প্রভৃতি কবিদের রচনাপদ্ধতি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়।

বিহারীলালের সুহৃদ্ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সর্বানুজ রবীন্দ্রনাথের মতই ইহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল। কাব্যকলা দর্শন-আলোচনা গণিতচর্চা সঙ্গীত রেখাক্ষর প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ইঁহার মৌলিক অধিকার ছিল কিন্তু কোন বিষয়ের অনুশীলনে আসক্তি ছিল না। তাই ইঁহার প্রতিভার যথোপযুক্ত সৃষ্টিকার্য নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বল্পসংখ্যক শ্রেষ্ঠ মৌলিক কাব্যের অন্যতম। কল্পনার ঐশ্বর্যে, অভিনবতায়, ভাবের প্রাচুর্যে এবং রচনার বৈচিত্র্যে এই রূপক কাব্যটি অসাধারণ ও অপরূপ মহিমা পাইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দে অথবা বাঙ্গালা ছড়ার ছন্দে কৌতুক-কবিতা রচনায়ও দ্বিজেন্দ্রনাথ অনায়াস দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যলেখার ষ্টাইলও তাঁহার নিজস্ব। ইঁহার গীতাপাঠ প্রভৃতি ঘোরতর দার্শনিক আলোচনাও রচনাগুণে অতিশয় সুখপাঠ্য।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর মহাকাব্য প্রাচীনপন্থীদের তুষ্ট করিতে না পারিলেও তাঁহাদের ভিন্ন পথে "মহাকাব্য"-রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। ইঁহারা অমিত্রাক্ষরের মাধুর্য ও শক্তি বুঝিতে পারেন নাই এবং বিদেশী কাব্যের রসও ইঁহাদের অনধিগত ছিল। তাই প্রধানত পয়ার এবং ক্বচিৎ সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বনে ইঁহারা পৌরাণিক আখ্যায়িকাকে "মহাকাব্য" রূপ দিতে লাগিলেন। যাঁহারা সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বনের দুঃসাহস দেখাইলেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ভুবনমোহন রায়চৌধুরী এবং বলদেব পালিত। কিন্তু এই প্রাচীন-পন্থীদের কোন রচনাই যথার্থ কাব্য-নামের যোগ্য নয়।

নবীনপন্থীরা মধুসূদনের অনুবর্তী হইয়াছিলেন। যাঁহাদের শক্তি নিতান্ত অল্প ছিল অথচ কবিযশের উপর লোভ কম ছিল না, তাঁহারা অমিত্রাক্ষরে

"মহাকাব্য" লিখিতে বসিয়া গেলেন। আর যাঁহারা অপেক্ষাকৃত শক্তিমান্ এবং যাঁহাদের রসবোধের একান্ত অভাব ছিল না, তাঁহারা মধুসূদনের দুরূহ পথ আদ্যন্ত অনুসরণের মত অবিবেচনা না দেখাইয়া মধ্যপথ ধরিলেন, অর্থাৎ ক্বচিৎ মিলহীন পয়ার এবং ক্বচিৎ পয়ার-ত্রিপদী ব্যবহার করিলেন। শেষোক্তদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)। কাব্যপদ্ধতিতে প্রধানত সাবেকি বর্ণনাত্মক রীতি অবলম্বন করিলেও হেমচন্দ্র পাশ্চাত্য কাব্য আদর্শকে অস্বীকার করেন নাই। ইঁহার কাব্যকলায় ইংরেজী সাহিত্যেরই প্রভাব সমধিক, সংস্কৃতের নয়।

বিহারীলালের সম্পাদিত 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় হেমচন্দ্র কবিতা লিখিতেন। বঙ্গদর্শনেও ইঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হয়। তাহার পর যথাক্রমে বীরবাহু কাব্য (১৮৬৪), নলিনীবসন্ত নাটক (১৮৬৮), কবিতাবলী—প্রথম ভাগ (১৮৭০), বৃত্রসংহার মহাকাব্য—প্রথম খণ্ড (১৮৭৫), ঐ—দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৭৭), কবিতাবলী—দ্বিতীয় ভাগ (১৮৮৭), ছায়াময়ী (১৮৮০), আশাকানন (১৮৭৬), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২), বিবিধ কবিতা (১৩০০), রোমিও-জুলিয়েট নাটক (১৮৯০), এবং চিত্তবিকাশ (১৩০৫) প্রকাশিত হয়। নাটক দুইখানি শেক্স্পিয়ার-প্রণীত 'দি টেম্পেষ্ট' ও 'রোমিও জুলিয়েট' অবলম্বনে রচিত। ইতালীয় কবি দান্তের 'লা কোমোদিয়া' কাব্যের ভাব অবলম্বনে 'ছায়াময়ী' লেখা হইয়াছিল। বৃত্রসংহার-রচনার মূলে মেঘনাধবধের প্রেরণা ছিল। বীররস সর্বত্র জমিয়া না উঠিলেও এবং বর্ণনার আতিশয্য-সত্ত্বেও বৃত্রসংহার যে বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য এবং ইহার আখ্যানবস্তু যে মহাকাব্যোচিত প্রশস্ত, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। হেমচন্দ্রের ছন্দোনিপুণতা ছিল। কথ্যভাষায় লঘু ছন্দে সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে ইনি বহু সরস ও উপভোগ্য কবিতা লিখিয়াছিলেন। এগুলি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সর্বোপরি, হেমচন্দ্রের লেখায় স্বদেশপ্রীতি এবং স্বাধীনতাকামনা যতটা নিষ্কপটভাবে ফুটিয়াছে, এমন আর পূর্ববর্তী কোন বাঙ্গালী কবির কাব্যে প্রকাশ পায় নাই।

হেমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের অল্পকাল মধ্যেই নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) আবির্ভাব। নবীনচন্দ্র অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহার

মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৫), এবং রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬)। শেষের কাব্য তিনখানি প্রকৃত প্রস্তাবে এক বিরাট কাব্যের তিন স্বতন্ত্র অংশমাত্র। এই কাব্যত্রয়ীতে কৃষ্ণচরিত্রকে কবি নিচিত্র কল্পনায় নূতনভাবে ফুটাইয়াছেন। কবির মতে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এবং আর্য-অনার্য দুই সম্প্রদায়কে মিলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের অপর কাব্যগ্রন্থ হইতেছে দুই ভাগ অবকাশরঞ্জিনী (১৮৭১), (১৮৭৭), ক্লিওপেট্রা (১৮৭৭), অমিতাভ (১৮৯৫), অমৃতাভ, রঙ্গমতী (১৮৮০) ও খৃষ্ট (১৮৯০)। নবীনচন্দ্র ভগবদ্‌গীতার এবং মার্কণ্ডেয়চণ্ডীরও পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের কবিত্ব স্থানে স্থানে চমৎকার, কিন্তু কবি এই চমৎকারিত্ব সর্বত্র বজায় রাখিতে পারেন নাই। এই কারণে এবং কাব্যে বাঁধুনি না থাকায় নবীনচন্দ্রের কবিত্বের ঠিকমত বিচার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নবীনচন্দ্র গদ্য-রচনাতেও হাত দিয়াছিলেন। এইজাতীয় রচনার মধ্যে তাঁহার আত্মকথা—'আমার জীবন'—উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য গ্রন্থ। নবীনচন্দ্র 'ভানুমতী' নামে একখানি উপন্যাসও রচনা করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মধুসূদনের ও হেমচন্দ্রের অনুকরণে অনেকেই কবিতা-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই-একজন অল্পবিস্তর সাময়িক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—যৌবনোদ্যান (১৮৭৮), মিত্রবিলাপ (১৮৬৯) ইত্যাদি রচয়িতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮-৮৬); নির্বাসিতের বিলাপ (১৮৬৮), হিমাদ্রিকুসুম (১৮৮৭), পুষ্পাঞ্জলি (১৮৮৮) ইত্যাদি রচয়িতা শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৮-১৯১৯); অবসর-সরোজিনী—প্রথম ভাগ (১৮৭৬), নিশীথচিন্তা (১৮৮৭), নিভৃতনিবাস (১৮৮৮) প্রভৃতি রচয়িতা রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪); এবং কবিকাহিনী (১৮৭৬), মানববিকাশ এবং মহাপ্রস্থান কাব্য (১৮৮৭) রচয়িতা দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-৯৯)। অন্যান্য কবিতা-রচয়িতার মধ্যে এই কয়জনের নাম করিতে পারা যায়—ভুবমোহিনী প্রতিভা (প্রথম ভাগ—১৮৭৫, দ্বিতীয় ভাগ—১৮৭৭), আর্যসঙ্গীত বা দ্রৌপদীনিগ্রহ কাব্য (১৮৭৯) ইত্যাদি রচয়িতা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; বৈরাগ্যবিপিনবিহার কাব্য ইত্যাদি

রচয়িতা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়; হেলেনা কাব্য (১৮৭৭), মিত্রকাব্য (প্রথম খণ্ড—১৮৭৪, দ্বিতীয় খণ্ড—১৮৭৭), ভারতমঙ্গল ইত্যাদি রচয়িতা আনন্দচন্দ্র মিত্র; এবং মেনকা (১৮৭৪), ললিতাসুন্দরী ইত্যাদি রচয়িতা অধরলাল সেন।

ব্যঙ্গ-রচনায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)। ইঁহার 'ভারত-উদ্ধার' (১৮৭৭) সাধারণ পাঠকসমাজে সমাদৃত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা লইয়া কাব্য-রচনা শুরু করিয়াছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার অনুসরণে অব্যবহিত পরে যে-সকল ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলি প্রায়ই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা। ইতিমধ্যে গদ্যে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা ও ঐতিহাসিক উপন্যাস চলিত হওয়ায় ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা-কাব্যের অনুশীলন অপ্রচলিত হইয়া গেল। পরবর্তী কালের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক কাব্য নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধ।

রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতার চলন শুরু করিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫৩-৯৮)। অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ইঁহার সাহিত্য-প্রীতি বালক রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্রের কবিপ্রতিভায় চমৎকারিত্ব ছিল না, তবে রচনায় স্বচ্ছতা ও কুণ্ঠাহীনতার পরিচয় যথেষ্ট। ইনি বহু কবিতা ও গান ক্ষিপ্রকারিতা সহযোগে রচনা করিতেন কিন্তু "নিজের এই সকল রচনাসম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমতা ছিল না।" অক্ষয়চন্দ্রের উদাসীনী (১৮৭৪) কাব্যের বিষয়ে একটি ইংরেজী কাব্যের প্রভাব আছে। উদাসিনী সেকালে সমাদর পাইয়াছিল। ইঁহার অপর সম্পূর্ণ কাব্য হইতেছে 'ভারতগাথা' (দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯০০) ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাসের মর্মকথা এই বিদ্যালয়-পাঠ্য কাব্যটিতে বর্ণিত হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র সেনও একটি আখ্যায়িকা-কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই রঙ্গমতী (১৮৮০) কাব্যে নবীনচন্দ্র সেন স্কটের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৫৬-৯৭) যোগেশ

(১৮৮১) কাব্য রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্যগুলির মধ্যে বিশিষ্ট। কাব্যটিতেও কবির নিজের হৃদয়বেদনা প্রকাশিত হওয়ায় বিশেষ মর্মস্পর্শী হইয়াছে। ইঁহার অপর কাব্যগ্রন্থ হইতেছে চিত্ত-মুকুর (১২৮৫), বাসন্তী (১৮৮০) ও চিন্তা (১৮৮৭)।

গাথা-কবিতা রচনায় অক্ষয়চন্দ্রের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোর রবীন্দ্রনাথ। স্বর্ণকুমারীর 'গাথা' (১২৯৭) কাব্যের কোন কোন কবিতার ছন্দে বিহারীলালের অনুসরণ আছে।

১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সমসাময়িক উপন্যাস

নৈহাটির নিকটে কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় (অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন) তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রেরা চারি ভাই ছিলেন—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেন এবং সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগে ভর্তি হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তিনি এই কলেজ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্‌স্ এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসর সর্বপ্রথম বি.এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়। এগার বৎসর পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

হুগলী কলেজে পড়িবার সময় হইতেই তাঁহার সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আদর্শে কবিতা লিখিতেন। কয়েকটি কবিতা ১৮৫২ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুইটি স্বতন্ত্র কাব্য একত্র ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ললিতা তথা মানস' নামে প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পুস্তক। কবিতা-রচনায় আশানুরূপ খ্যাতি লাভ না হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যসাধনায় শৈথিল্য আসে। তাহার পর তিনি উপন্যাস-রচনায় হাত দিলেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাসখানি বাঙ্গালায় কোন পুরস্কারের নিমিত্ত লেখা। পুরস্কার না পাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা লেখা ছাড়িয়া দিয়া ইংরেজীতে উপন্যাস লিখিলেন 'রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ'

নামে (১৮৫৯-৬০)। উপন্যাসটি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ফীল্‌ড নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরেজীতে যতই দখল থাকুক না কেন বাঙ্গালীর মনের ভাব বাঙ্গালাতেই ভালোভাবে প্রকাশ পায়। বিদেশী ভাষায় রচনা ভালো হইলে প্রশংসা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। ইংরেজী উপন্যাস লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তবে তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার প্রতিভার আসল পথ উপন্যাসরচনায়। এখন বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় রীতিমত উপন্যাস-রচনায় লাগিয়া গেলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে সহসা এক অপূর্ব রসভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল। তাহার পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃণালিনী বাহির হইল। ১২৭৯ সালে অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকা বাহির করিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। বঙ্গদর্শনের প্রথম চারিখণ্ড মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার পর ইহার সম্পাদনার ভার পড়িল তাঁহার মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের উপর। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই বইগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল—বিষবৃক্ষ (১২৭৯), ইন্দিরা (ঐ চৈত্র), যুগলাঙ্গুরীয় (১২৮০ বৈশাখ), সাম্য (১২৮০-৮১), চন্দ্রশেখর (ঐ), কমলাকান্তের দপ্তর (আরম্ভ ভাদ্র ১২৮০), কৃষ্ণচরিত্র (১২৮১), রজনী (১২৮১-৮২), রাধারাণী (কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১২৮২), কৃষ্ণকান্তের উইল (১২৮২), রাজসিংহ (১২৮৪-৮৫), মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১২৮৭), আনন্দমঠ (১২৮৭-৮৯), এবং দেবী চৌধুরাণী (আরম্ভ—পৌষ ১২৮৯, পুস্তকাকারে সম্পূর্ণ)। নবজীবন পত্রিকায় ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৭), এবং প্রচার পত্রিকায় সীতারাম (১৮৮৮) প্রকাশিত হইয়াছিল। সীতারাম বঙ্কিমের শেষ উপন্যাস। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অন্যান্য গদ্যরচনা লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (দুই ভাগ) ইত্যাদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩০০ সালে (অর্থাৎ ১৮৯৪) খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে চৈত্র তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

ইংরেজী রোমান্‌সের অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় যে উপন্যাস-রচনার রীতি প্রবর্তন করিলেন আজিও সে রীতির সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। ইংরেজীর অনুসরণ হইলেও বঙ্কিমের উপন্যাস সম্পূর্ণ দেশী জিনিস—

পাত্র-পাত্রী, দেশ-কাল, ঘটনা-পরিবেশ সবই দেশী। গল্প শোনার বাসনা মানুষের চিরন্তন। এতদিন বাঙ্গালী বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী আরব্য-উপন্যাস হাতেম-তায়ি ইত্যাদি পড়িয়া গল্পের পিপাসা কথঞ্চিৎ মিটাইয়াছিল। এখন বঙ্কিমের উপন্যাসে বাঙ্গালীর নিজের ঘরের মানুষ অপূর্বভাবে রূপায়িত হইয়া স্বপ্নলোকের মধ্যে দেখা দিল। বাঙ্গালীর সাহিত্যরসপিপাসা পরিতৃপ্ত হইল। সেই হইতে বাঙ্গালী পাঠকের ভক্তহৃদয়-সিংহাসনে বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আজ অবধি কোন লেখক বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণের হৃদয়রাজ্যে এমন অখণ্ড অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা গদ্যের ভাষা এতদিন ছিল ভারি চালের, দরবারি ঢঙের। এখন তাহা বঙ্কিমের হাতে পড়িয়া বিশেষভাবে লঘু এবং সর্বথা ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠিল। দুর্গেশনন্দিনী সম্পূর্ণভাবে বিদ্যাসাগরী রীতিতে লিখিত হইলেও বঙ্কিমের লেখনীর নিজস্ব রসস্পর্শ হইতে বঞ্চিত নয়। কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনীর ভাষাও মোটামুটি সেইরকমই। বঙ্গদর্শন-প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র কথ্যভাষার রীতি মিলাইয়া ও বাক্যের বহর কমাইয়া ছোট করিয়া ভাষাকে নমনীয় এবং সহজবোধ্য করিয়া তুলিলেন। ইহা বঙ্কিমের একটি প্রধান কৃতিত্ব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজী-শিক্ষিত মনস্বী বাঙ্গালীর প্রধানতম প্রতিনিধি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাবান্ এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকিয়াও যে গোঁড়ামি-বর্জন করিয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া হিন্দুশাস্ত্রের সার্থক আলোচনা করা যাইতে পারে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলন ইত্যাদি গ্রন্থে ও অন্যান্য প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব বিষয়েও তিনি সরসভাবে সার্থক আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতাকে জগতের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রকাশ সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের আসনে বসিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ একাধিপত্য আর দ্বিতীয়বার ঘটে নাই।

উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে তো বটেই, সাধারণ গদ্যসাহিত্যেও বঙ্কিমের ধারা তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্তী লেখকেরা উপেক্ষা করিতে পারেন

নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর সমাদর ও প্রসার ঘটিতে লেশমাত্র বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু অনুকারী জুটিতে কিছু দেরী হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব হইতেই কোন কোন লেখক বাঙ্গালায় উপন্যাস রচনা করিবার প্রযত্ন করিতেছিলেন। যাঁহারা সংস্কৃত অখ্যায়িকার পথ ধরিয়াছিলেন তাঁহাদের পথ ভুল হইয়াছিল। তবে যাঁহারা ইংরেজী রোমান্সের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা একেবারে বঞ্চিত হন নাই। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের (১৮৫৬) দ্বিতীয় গল্প অঙ্গুরীয়বিনিময় এই ধরণের প্রথম ভালো রচনা। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রকে দুর্গেশনন্দিনীর পথনির্দেশ করিয়াছিল।

সংস্কৃত আখ্যায়িকার সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের উপকথা মিশাইয়া উপন্যাস লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন গোপীমোহন ঘোষ। ইঁহার বিজয়বল্লভ (১৮৬৩) বিদ্যাসাগরী রীতিতে রচিত। ঘটনা-সংস্থানের দিক্ দিয়া বইটি উপন্যাসের পর্যায়ে খানিকটা উঠিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-লেখকরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে অবতীর্ণ হইবার পরে যে দুই-একজন লেখক তাঁহার প্রভাব এড়াইয়া সাহিত্যসৃষ্টি-কার্যে সফল হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম অগ্রগণ্য—প্রতাপচন্দ্র ঘোষ এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৫-৯১)। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে প্রতাপচন্দ্র বঙ্গাধিপ-পরাজয় (প্রথম খণ্ড—১৮৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড—১৮৮৪) রচনা করেন। এই সুবৃহৎ উপন্যাসটিতে ইতিহাসের মর্যাদা যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে এবং দেশকালানুগত্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ভাষা নীরস ও অমসৃণ বলিয়া এবং বর্ণনাপ্রাচুর্য থাকায় উপন্যাসটিতে রসসৃষ্টি ব্যাহত হইয়াছে।

বঙ্কিমের নায়ক নায়িকারা রোমান্সের রসলোকের অধিবাসী। সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখসুখের উর্ধ্বে তাহাদের জীবনস্রোত শুধু প্রেমের খাতেই বহিয়া চলিয়াছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতায় (জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় ১১৭৯, পুস্তকাকারে ১৮৭৪) আমরা পল্লীবাসী দরিদ্র-ভদ্র বাঙ্গালীর সাংসারিক দুঃখসুখের ঢেউখেলানো অনুজ্জ্বল জীবনের প্রথম পরিচয় পাইলাম। এই পরিচয় হয়ত সম্পূর্ণ নয় তবুও বাস্তব এবং হৃদয়গ্রাহী। উপন্যাসটির অধিকাংশ ভূমিকার পরিকল্পনা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। স্বর্ণলতা অত্যন্ত সবল রচনা।

তারকনাথের অপর উপন্যাস হইতেছে হরিষে বিষাদ, ও অদৃষ্ট (১২৯৮)। তিনটি গল্প (১২৯৫) গল্পের বই। এসব রচনাতেও লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা মালমশলা যোগাইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৫-৮৯) গল্প-ও উপন্যাস-রচনায় বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালের বৈশাখ মাসে ইনি ভ্রমর নামে মাসিকপত্রিকা বাহির করেন। ভ্রমরের প্রথম দুই সংখ্যায় ইঁহার দুইটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর আষাঢ় মাস হইতে কণ্ঠমালা (পুস্তকাকারে ১৮৭৭) বাহির হইতে থাকে। দ্বিতীয় উপন্যাস মাধবীলতা বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল (১২৮৫-৮৭)। ইঁহার অপর উল্লেখযোগ্য রচনা—'জাল প্রতাপচাঁদ' (বঙ্গদর্শন, ১২৮৯) ও পালামৌ (ঐ, ১২৮৭-৮৯)।

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাভঙ্গির অসাধারণতা হইতেছে কৌতুকদীপ্ত ঋজুতা। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের উপযুক্ত ক্ষমতা ও রসদৃষ্টি ইঁহার ছিল, কেবল ছিল না উদ্যম ও সাধনা। তাই প্রতিভার তুলনায় সঞ্জীবের সাহিত্যসৃষ্টি অপ্রচুর ও অপরিচ্ছন্ন।

ইঁহাদের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্রও গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। ইঁহার মধুমতী (বঙ্গদর্শন—বৈশাখ, ১৮৭৩) অধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্প। শৈশব-সহচরী উপন্যাসও (১৮৭৮) প্রথমে বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক অনুগত লেখকদের মধ্যে উপন্যাস-রচনায় রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) সবিশেষ কৃতকার্য হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধেই ইনি বাঙ্গালা উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গবিজেতা প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অপেক্ষা ইঁহার সামাজিক উপন্যাস দুইটি—সংসার (১৮৮৬) এবং সমাজ (১৮৯৩)—অধিকতর উপাদেয়। বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭), জীবন-প্রভাত (১৮৭৮) ও জীবন-সন্ধ্যা (১৮৭৯) যথাক্রমে আকবর শাহজাহান আওরঙ্গজেব ও জাহাঙ্গীরের সময়ের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। মোগল-সাম্রাজ্যের শতবর্ষের ইতিহাসের ঘটনা এই চারিটি উপন্যাসের বিষয় বলিয়া এগুলি একত্র 'শতবর্ষ' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৮৭৯)।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) সাহিত্যের নানা বিষয়ে লেখনী

পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইঁহার কবিতার কথা বলিয়াছি। তবে উপন্যাস গল্পেই ইঁহার কৃতিত্ব সমধিক পরিস্ফুট। শিক্ষিত-সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া ইঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'স্নেহলতা' (১৮৯২) রচিত। স্বর্ণকুমারীর অপর উপন্যাস—দীপনির্বাণ (১৮৭৬), ছিন্নমুকুল (১৮৭৯), হুগলীর ইমামবাড়ী (১৮৮৭), কাহাকে? (১৮৯৮) ইত্যাদি।

কপালকুণ্ডলার উপসংহাররূপে মৃন্ময়ী (১৮৭৪) লিখিয়া দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯০৯) পাঠকসমাজে পরিচিত হন। তাহার পর বিমলা (১৮৭৭), দুই ভগিনী (১৮৮১), সোনার কমল (১৯০৩) প্রভৃতি উপন্যাস বাহির হয়। দামোদরের বাস্তবদৃষ্টি ছিল। কিন্তু কাহিনীর চমৎকারিত্বের দিকে ঝোঁক দেওয়ায় বাস্তবতা কতকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। দামোদর দুই একখানি ইংরেজী উপন্যাসকেও বাঙ্গালা-রূপ দিয়াছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন—মেজ বৌ (১৮৮৮), যুগান্তর (১৮৯৫), নয়নতারা (১৮৯৯) ইত্যাদি। শিক্ষামূলক হইলেও লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি ও সহৃদয়তা উপন্যাসগুলিতে রসসঞ্চার করিয়াছে। শিবনাথের কবিতার কথা আগে বলিয়াছি। ইঁহার 'আত্মচরিত' (১৯১৮) অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ।

শক্তিকানন (১৮৮৭), ফুলজানি (১৮৯৪), বিশ্বনাথ (১৮৯৬) প্রভৃতির লেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (?-১৯০৮) রোমান্টিক উপন্যাসে বৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের অতীত-দিনের পল্লীচিত্র এই সুলিখিত কাহিনীগুলির রমণীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে।

বিশুদ্ধ রোমান্টিক কাহিনীর লেখক হিসাবে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) কুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি গার্হস্থ্যবিষয়েও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'লীলা' (১৮৯২) উল্লেখযোগ্য। ইঁহার প্রথম উপন্যাস পর্বতবাসিনী (১৮৮৩)। নগেন্দ্রনাথ কয়েকটি ভালো ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে মৌলিক ডিটেক্‌টিভ গল্প রচনাতেও ইঁহার কৃতিত্ব।

অন্যান্য উপন্যাস-লেখকের মধ্যে এই কয়জনের নাম করা যাইতে পারে—শরৎচন্দ্র (১৮৭৭), বিরাজমোহন (১৮৭৮) প্রভৃতির রচয়িতা দেবাপ্রসন্ন

রায়চৌধুরী (১৮৫৪-১৯২০), গিরিজা (১৮৮২), সুহাসিনী (১৮৮২) ইত্যাদির রচয়িতা তারকনাথ বিশ্বাস; আঙ্কল্ টম্‌স্ ক্যাবিনের অনুবাদক মহারাজ নন্দকুমার (১৮৮৫), দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৮৮৬) প্রভৃতির লেখক চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬); কনে বউ (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৮৯), প্রেমপ্রতিমা ইত্যাদির রচয়িতা যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং 'দুই ভাই' (১৮৮৪), রায় মহাশয় (১৮৯২) প্রভৃতির রচয়িতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যঙ্গ-উপন্যাসের সূত্রপাত করেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কল্পতরু' (১৮৭৪) লিখিয়া। ইহার পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন সুলভ সাপ্তাহিক পত্র 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫)। যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-৮৮) একদা বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। সমসাময়িক ব্যক্তি ও সম্প্রদায়-বিশেষকে উদ্দেশ করিয়া ইঁহার উপন্যাস ও ব্যঙ্গচিত্রগুলি লেখা।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে সুবৃহৎ রোমান্টিক উপন্যাস শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (১৮৯৬-১৯০২)। শতবর্ষ-পূর্বেকার বাঙ্গালী জীবনের আংশিক প্রতিচ্ছবি বইটিকে মূল্যবান করিয়াছে।

১১. বিবিধ গদ্য লেখক

বঙ্গদর্শনের আদর্শে যে দুই-একটি উৎকৃষ্ট পত্রিকা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতেও কয়েকজন ভালো গদ্যলেখক লিখিতেন। বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) বিদ্যাসাগরী রীতিতে নীতিগর্ভ চিন্তামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রভাত চিন্তা (১৮৭৭), নিভৃত-চিন্তা (১৮৮৩), নিশীথ-চিন্তা (১৮৯৬), প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকরূপে খুব সমাদৃত ছিল। আর্যদর্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (?-১৯০৪) ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনেতার জীবনী লিখিয়াছিলেন। 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) বাঙ্গালা গদ্যের শক্তিশালী লেখক ছিলেন।

ধর্মবিষয়ক ব্যাখ্যানে ও বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় নেতা সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রথম ভালো লেখক

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি সরল ও প্রসন্ন ভাষায় লিখিতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইঁহার বহু ব্যাখ্যান বক্তৃতা প্রবন্ধ পত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনিই সর্বপ্রথম ঋগ্বেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী বিশেষ উপাদেয় বই।

কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) বক্তৃতা ও ধর্মব্যাখ্যানের ভাষা সরল ও মর্মস্পর্শী। কেশবচন্দ্রের আত্মীয় ও অনুচরদের মধ্যেও কয়েকজন ভালো লেখক ছিলেন — "চিরঞ্জীব শর্মা" অর্থাৎ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (?-১৯১৫), কৃষ্ণবিহারী সেন (১৮৪৭-৯৫), গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) ইত্যাদি।

ইতিহাস-জীবনীতে রজনীকান্ত গুপ্তের (১৮৪৯-১৯০০) খ্যাতি সর্বাধিক। সাহিত্য-সমালোচনায় উল্লেখযোগ্য হইতেছেন চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২), ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩), পূর্ণচন্দ্র বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইত্যাদি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩৬) সরল সুন্দর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের ইনি একজন কনিষ্ঠ লেখক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার ও সাহিত্যের, বৌদ্ধধর্মের, ভারতীয় পুরাতত্ত্বের ও প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। হরপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বেনের মেয়ে' (১৯১৯) উপন্যাস।

১২. জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ী

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ী শিক্ষা-দীক্ষায় ও ঐশ্বর্য-সৌজন্যে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ঐশ্বর্যে দীপ্তির ও ভোগবিলাসের আড়ম্বরের জন্য এই বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) বিলাতে "প্রিন্‌স" নামে সংবর্ধিত হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) অসাধারণ মনস্বী পুরুষ ছিলেন। ইঁহার আধ্যাত্মিকতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠা যেমন গভীর ছিল, বিচক্ষণ বুদ্ধি, দৃঢ়চিত্ততা ও দূরদর্শিতা তেমনই প্রখর ছিল। দেশের লোকে শ্রদ্ধা করিয়া

ইঁহাকে "মহর্ষি" আখ্যা দিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেকালের ব্রাহ্মসমাজের মূলস্তম্ভ ছিলেন। সমাজসংস্কার-কার্যে ইঁহার বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন আচার-ব্যবহারের মধ্যে যেগুলি নির্দোষ ও শোভন তাহা পরিত্যাগ করিতে ইনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই কারণে কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ পরে স্বতন্ত্র হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলে পর দেবেন্দ্রনাথের সমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবর্তন (১৮৪৩) ইঁহার বিশিষ্ট কীর্তি। দেবেন্দ্রনাথের বাঙ্গালা রচনার কথা বলিয়াছি।

দেবেন্দ্রনাথের অসাধারণ সন্তান-সৌভাগ্য ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার কথা পুর্বে বলিয়াছি। উচ্চ-দর্শনকথা সরল ভাষায় সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করিবার যে দুরূহ শক্তি তাহা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছিল। মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ (১৭৪২-১৯২৩) ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে প্রথম সিভিলিয়ান ছিলেন। ইনিও সুসাহিত্যিক ছিলেন। বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীশিক্ষা ও অবরোধমোচন-বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কাহারো অপেক্ষা কম নয়। ভদ্র ও শিক্ষিত বাঙ্গালী নারীর আধুনিক সুরুচিসঙ্গত বেশ প্রথমে ইনি ও ইঁহার স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। চতুর্থ পুত্র জ্যেতিরিন্দ্রনাথের (১৮৪৮-১৯২৫) প্রতিভা নানামুখী ছিল। কবিতা, গান ও নাট্যরচনা হইতে সঙ্গীতকলা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে ইঁহার দক্ষতা ও অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চার মূলে প্রধানত ইঁহার এবং ইঁহার পত্নীর প্রেরণা ছিল। দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মহিলা-সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল যাবৎ 'ভারতী' পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইঁহার সাহিত্যসৃষ্টির কথা যথাস্থানে বলা গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) মত এমন বিচিত্র ও উত্তুঙ্গ প্রতিভা আজ পর্যন্ত কোন দেশে দেখা যায় নাই। দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রদের মধ্যেও সুসাহিত্যিকের অভাব ছিল না। গল্পে সুধীন্দ্রনাথের (১৮৬৯-১৯১৯) ও প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের দান উচ্চশ্রেণীর। অল্পবয়সে মৃত্যু না ঘটিলে বলেন্দ্রনাথের লেখনীদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হইত। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পৌত্র গগনেন্দ্রনাথ (১৮৬৭-১৯৩৮) ও অবনীন্দ্রনাথ (১৮৭১-১৯৫২) চিত্রকলায় নবযুগের অবতারণা করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা গদ্যেও এক অভিনব মনোজ্ঞ রীতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

মোট কথা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুর-বাড়ীকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, রুচি, সৌজন্য, জীবনাদর্শ, সঙ্গীত সাহিত্য ও শিল্পকলা—নবীন প্রেরণায় বিচিত্রভাবে পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়াছে। ঠাকুর-বাড়ীর প্রতিভা বঙ্গদেশকে সমুজ্জ্বল এবং ভারতবর্ষের দিগন্তকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষের চিত্তে জাতীয়তাবোধ আধ্যাত্মচেতনা এবং সৌন্দর্যানুভব ইত্যাদি উদ্বোধনে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের প্রচেষ্টা সর্বাধিক কার্যকর হইয়াছে।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাঙ্গালা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক এবং কালিদাসের মত ভারতবর্ষের মুখ্যতম কবি। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে ইঁহার তুল্য বিচিত্র প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যশিল্পী আর দেখা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে বাঙ্গালা দেশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন, পৃথিবীতে ভারতবর্ষের নাম গৌরবান্বিত করিয়াছেন এবং বোধ করি বিশ্বজগতে মর্ত্য পৃথিবীর নাম অমর করিয়াছেন।

কলিকাতার বিদ্যালয়ে নিয়মমত এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের হয় নাই। কৈশোরে প্রায় বৎসর খানেক লণ্ডনে ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়িয়াছিলেন। ইঁহার বাল্যশিক্ষা প্রধানত গৃহশিক্ষকের কাছে। বিশেষ করিয়া নিজের চেষ্টায় ইনি বাঙ্গালা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিলাতে কিছু লাতীন পড়িয়াছিলেন এবং যৌবনে কিছু ফরাসী ও জার্মান পড়িয়াছিলেন। তাহা ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞান-শাস্ত্রেরও অল্পবিস্তর চর্চা তিনি করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখার অভ্যাস। নিজের বাল্যকথা এবং সাহিত্যচর্চার গোড়ার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' বইটিতে দিয়াছেন।

তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া একাশী বৎসর বয়সে মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত প্রেরণায় অজস্রভাবে সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শুধু কাব্যে নয়, গল্পে-উপন্যাসে, নাটকে-প্রহসনে, প্রবন্ধে-পত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অজস্র ও অতুলনীয়। তবে কাব্যে—অর্থাৎ কবিতায়

এবং গানে—তাঁহার কবিপ্রতিভার মুখ্য ও ধারাবাহিক বিকাশ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার কবিখ্যাতি আর সব খ্যাতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কাব্যসৃষ্টিকালকে চারি যুগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম যুগে কবির চিত্ত অন্তর্মুখীন। হৃদয়াবেগের অস্পষ্টতা এবং তাহা প্রকাশের ব্যাকুলতা এই যুগের কাব্যের ভাবকে কুণ্ঠিত আর ভাষাকে অস্পষ্ট করিয়াছে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায়' প্রকাশিত 'বনফুল' হইতে 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) পর্যন্ত কাব্যগুলি এই যুগের রচনা। কাঁচা লেখা হইলেও এই সব রচনায় এক নূতন ধরণের কবিতার আস্বাদ পাওয়া গেল। দ্বিতীয় যুগে কবির চিত্ত বহির্মুখীন। হৃদয়াবেগের অস্পষ্টতা কাটিয়া গিয়াছে এবং রূপরসের জগতের নব নব সৌন্দর্যও মানবহৃদয়ের সংবেদন আকৃষ্ট করিতেছে। কবির কাব্যে প্রতিভাসূর্য এই যুগে ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্নগগনে উঠিয়া গিয়াছে এবং কাব্যের ভাব ভাষা ও ছন্দ বিচিত্র সৌন্দর্যের ও শক্তির বর্ণচ্ছটাবিকাশ দেখাইয়াছে। 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) হইতে 'খেয়া' (১৯০৬) পর্যন্ত কাব্যগুলি দ্বিতীয় যুগে পড়ে। তাহার পর 'বলাকা' (১৯১৬) হইতে 'পূরবী' (১৯২৫) পর্যন্ত তৃতীয় যুগ। এই যুগে কবির পরাঙমুখীন চিত্ত যেন পরকালের ডাক শুনিতে পিছু ফিরিয়াছে। তাই ধরণীর রূপরস যেন তাঁহার চোখে নূতন মায়া বিস্তার করিয়া দিয়াছে। পরলোকে নবজন্মের জন্য উৎসুক কবিচিত্তে যেন "মর্ত্তধরার পিছু ডাকা দোলা লাগায় বুকে"। সেইজন্য অতীতের স্মৃতি এই যুগের কাব্যগুলিতে প্রধান স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয়-তৃতীয় যুগের মাঝখানে তিনখানি অধ্যাত্মরস-গভীর গীতকাব্য—গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪) ও গীতালি (১৯১৪)। চতুর্থ যুগে রবীন্দ্রনাথ যেন নূতন সাজে দেখা দিলেন। জীবনে কোনও আর্টস্কুলে পড়েন নাই এবং ঘরে কখনও ছবি আঁকার অভ্যাস করেন নাই। এখন তিনি ছবি আঁকিতে লাগিয়া গেলেন। এ ছবিতে এমন অদ্ভুত শিল্পসৌন্দর্য দেখা গেল যা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। কবিতায়ও তিনি নূতন রীতি সৃষ্টি করিলেন—গদ্য কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বনফুল ১২৮৬ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম গদ্য প্রবন্ধ, সমালোচনা—'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুখসঙ্গিনী'—প্রকাশিত হয় জ্ঞানাঙ্কুরে ১২৮৩ সালে। বনফুলের পর রচিত হইলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্য কবিকাহিনী ১২৮৫

সালে বনফুলের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকা বাহির করিলেন। ভারতী পত্রিকার আসরে কবি জাঁকাইয়া বসিলেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্য বহু রচনা বাহির হইতে লাগিল। সকল রচনার পরিচয় দিতে গেলে স্বতন্ত্র বই লিখিতে হয়, সুতরাং ইহার পর প্রধান প্রধান রচনার কথাই বলিব।

ভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির অনুকরণে কয়েকটি ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়া 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে প্রকাশ করেন। বাল্যের রচনা হইলেও পদগুলি চমৎকার এবং বাল্যের রচনার প্রতি কবি যথেষ্ট নির্মমতা দেখাইলেও ভানুসিংহ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতার প্রতি তিনি একেবারে নির্মম হইতে পারেন নাই। এইগুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক গীতিকবিতা। বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল সুর গীতিকাব্য—যাহা জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া আবহমান কাল চলিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে নূতন প্রেরণা এবং অপূর্ব রূপরসায়ন লাভ করিয়াছে—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদগুলির মধ্যে তাহারই আগমনী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচিত হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের রচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিশিষ্টতা সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হইল। এই হইতে কবি আখ্যায়িকাকাব্য-রচনা ছাড়িয়া দিলেন। তরুণ কবির অপরিণত লেখনীর সৃষ্টি হইলেও কাব্যটির প্রতি সমজদার সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে বিলম্ব হয় নাই। কবি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সংবর্ধনা লাভ করিলেন। তাহার পর প্রভাতসঙ্গীত (১৮৮৩) কাব্যে দেখা যায় যে হৃদয়াবেগের অস্ফুটতা কাটিয়া গিয়া কবিচিত্তে মানবজীবনের বিচিত্র স্নেহসম্পর্ক-সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগিয়াছে। ভাষা এবং ছন্দও অনেকটা গাঢ় ও সংহত হইয়া আসিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ভারতীতে (১২৮৪-৮৫) রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত কাঁচা লেখা বলিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই। দ্বিতীয় উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' লেখার সময়ে গদ্যরচনায় কবির হাত পাকিয়াছে। বৌঠাকুরাণীর হাট পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালে, এবং তৃতীয় উপন্যাস রাজর্ষি ১৯২৩ সালে। ইতিমধ্যে কাব্যরচনায় উত্তরোত্তর বিস্ময়জনকভাবে কবির

প্রতিভাস্ফুরণ হইতেছে। কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) কাব্যে হৃদয়াবেগের অস্ফুটতা একেবারে কমিয়া গিয়াছে; ভাব সুনির্দিষ্ট এবং ভাষা ও ছন্দ পরিমিত হইয়াছে। তাহার পরে 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যে কবির প্রতিভা স্ফুটতর বিকাশ লাভ করিয়াছে; হৃদয়াবেগের বাষ্পাকুলতা কাটিয়া গিয়া ভাবে ও ভাষায় উচ্চ শিল্পসৌন্দর্য প্রকটিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের তখন পূর্ণ যৌবন, সেইজন্য প্রণয়ঘটিত কবিতাগুলি মানসীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। মানসীর কবিতাগুলি রচনা করিবার সময়ে 'রাজা ও রাণী' নাটক (১৮৮৯) লেখা হয়। বাসনাবিজড়িত প্রেমের সঙ্গে আদর্শগত প্রেমের দ্বন্দ্ব এই কাব্যরসপ্রচুর নাটকটির প্রতিপাদ্য। ইহার পর রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথম অংশ অবলম্বন করিয়া তিনি 'বিসর্জন' নাটক (১৮৮৯) রচনা করেন। বিসর্জন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি। তাহার কিছুকাল পরে নাট্যকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) রচিত হয়; ইহার মূল সুর নারীপ্রেমের চরিতার্থতা। তাহার পরে 'সোনার তরী' (১৮৯৪) কাব্য প্রকাশিত হয়। সোনার তরীর অনেক কবিতা পদ্মাতীরে বাসকালে লিখিত। তাই এই কবিতাগুলির মধ্যে নদীপ্রবাহের অবাধ ঔদার্য প্রবহমাণ। কবিচিত্তে নদীর ও নদীতীরের দৃশ্যের প্রভাবও সুস্পষ্ট। পৃথিবীর সঙ্গে কবি যেন একটা নাড়ীর টান অনুভব করিয়াছিলেন এবং জীবলীলার বিচিত্রতা তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবি ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'সাধনা' পত্রিকা বাহির করিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা তখন মধ্যাহ্নগগনে আরূঢ়; কবিতায়, গানে, গল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে, প্রহসনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সৃষ্টির প্রাচুর্যে অজস্রধারে উৎসারিত হইতে লাগিল। সাধনার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ "গদ্য-পদ্যের জুড়ি হাঁকাইতে" লাগিলেন।

১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ রীতিমত ছোটগল্প লিখিতে শুরু করিয়া আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের এক নূতন এবং প্রধান ধারার সৃষ্টি করিলেন। এই ছোটগল্পের ধারা এখনকার দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবল বেগে বহিতেছে এবং একাধিক প্রতিভাবান লেখক ছোটগল্পের মধ্য দিয়া উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লেখায় হাত দিবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি দুই একজন সাহিত্যিক গল্প লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র উপন্যাস বা "বড় গল্প" ধরণের রচনা, ছোটগল্প—

ইংরেজীতে যাহাকে বলে "শর্ট স্টোরি"—তাহা নহে। বাঙ্গালায় ছোটগল্পের উদ্ভাবন রবীন্দ্রনাথেরই কীর্তি এবং তাঁহার ছোটগল্প আজিও বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অপরাজিত রহিয়াছে। যথার্থ কথা বলিতে কি, রবীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-রচয়িতাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছয়সাতটি ছোটগল্প হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর সাধনা পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে প্রায় প্রত্যেক মাসে একটি-দুইটি করিয়া ছোটগল্প বাহির হইতে থাকে। চারি বৎসর পরে সাধনা উঠিয়া গেলে ভারতী ও প্রদীপ পত্রিকায় এবং পরে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ও প্রবাসী পত্রিকায় এবং আরও পরে সবুজপত্রে ও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প প্রকাশিত হইতে থাকে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখিয়া গিয়াছেন।

সোনার তরীর সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একটা বুদ্ধিনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক ভাবের সূচনা হইল। কবির কাব্যপ্রেরণার মূলে যিনি ছিলেন তিনি বা তাঁহার প্রেমই যেন কবিকে ইহজন্মের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া এমন কি জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন এবং তিনিই যেন তাঁহার সকল প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছেন, এমন একটা ভাব সোনার তরীর কয়েকটি কবিতার মধ্যে স্ফুটভাবে দেখা দিল। ইহার পূর্বে মানসীর "মানসী প্রতিমা" কবিতায় এই ভাবের সূত্রপাত দেখি। চিত্রা কাব্যে (১৮৯৬) এই ভাব স্ফুটতর বিকাশ লাভ করিল। চৈতালী কাব্যে (১৮৯৬) কবির দৃষ্টি যেন ভারতবর্ষের চিরাতীতের সুমহান আদর্শের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। কথা কাব্যে (১৯০০) অতীতকালের মহৎ চরিত্রের কাহিনী অঙ্কিত হইয়াছে। কল্পনা কাব্যে (১৯০০) অতীতের রোমান্টিক জীবনের স্বপ্নে কবি মগ্ন হইয়াছেন। মানসী হইতে কল্পনা পর্যন্ত এই যে যুগ ইহাকে রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পনৈপুণ্যের প্রথম যুগ বলা যাইতে পারে। ছন্দের বৈচিত্র্যে, অলঙ্কারের-ঐশ্বর্যে, ভাবের সমারোহে এই যুগের কবিতাগুলি অতুলনীয়। গদ্যেও তাহাই দেখি। এই সময়ে লেখা গল্পে ও প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রভঙ্গীতে বচনের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। গদ্য ও পদ্যের মত, হয়ত বা ততোধিক সুষমাযুক্ত এবং ছন্দোময় হইয়াছে।

ক্ষণিকা কাব্যে (১৯০০) রবীন্দ্রনাথ সুর বদলাইলেন। ভাষার ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য একেবারে চলিয়া গেল। তখন কবি নিজের মনে যে এক অপূর্ব

নিরাবিল নির্লিপ্ত মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই সহজ ভাষায় হালকা ছন্দে অভাবনীয়রূপে এই কাব্যের আড়ম্বরহীন সহজরীতির কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইল। এই কাব্যেরই শেষে যে দুইটি কবিতা আছে তাহাতে কবির আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার কবিত্বময় প্রকাশ দেখা গেল। ক্ষণিকার এই আধ্যাত্মিক ভাব সোনার তরীর যুগের বুদ্ধিমূলক অন্বেষণা নয়। এই ভাবের মূলে আছে গভীর উপলব্ধিসঞ্জাত ভক্তি, ঈশ্বরপ্রেম। পরবর্তী কালের অধিকাংশ কাব্যে বিশেষ করিয়া, গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪) ও গীতালি (১৯১৪) কাব্যত্রয়ীর কবিতা ও গানগুলির মধ্যে এই ভক্তিরস বিশেষভাবে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। চৈতালীতে ও কল্পনায় ভারতবর্ষের অতীত দিনের প্রতি কবির যে অনুরক্তি দেখা গিয়াছিল তাহা নৈবেদ্য কাব্যে (১৯০১) আত্মিক শক্তির জন্য ব্যাকুলতায় প্রকাশ পাইল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ হওয়ায় কনিষ্ঠ শিশু-সন্তানের বেদনা তাঁহার চিত্তকে করুণ বাৎসল্য রসে অভিষিক্ত করিল। তাহার ফলে শিশু কাব্যের (১৯০৩) অপূর্ব কবিতাগুলির উৎপত্তি। ক্ষণিকার নিরাসক্তি ভাব খেয়া কাব্যে (১৯০৬) আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার তলে তলে যেন একটু ক্ষীণ বিষাদের গাম্ভীর্য মিশিয়া রহিল। তাহার পর গীতাঞ্জলি (১৯১০)। গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য না হইলেও ইহার ও অন্যান্য কাব্যের কতকগুলি কবিতা এই নামে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ায় সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই গীতাঞ্জলির (এবং অন্যান্য রবীন্দ্র-রচনার) অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গীতাঞ্জলির ও গীতিমাল্যের অনেকগুলি গানে ও কবিতায় বাউল-গীতির প্রভাব রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর কবি রূপকনাট্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। রাজা (১৯১৩) নাটকে মানবাত্মার আধ্যাত্মিক অভিসার রূপকারূঢ় হইয়াছে। অচলায়তনে (১৯১১) ধর্মসাধনার কঠিন বাহ্যরূপের ছবি পাই। ডাকঘরে (১৯১২) কবির চিত্তগহনের অস্ফুট আকৃতি মূর্তিলাভ করিয়াছে।

রাজর্ষির পর রবীন্দ্রনাথ বহুকাল উপন্যাসরচনায় হাত দেন নাই। ১২৯৮ হইতে ১৩০৮ সাল পর্যন্ত সময় রবীন্দ্রনাথের গদ্যে ছোটগল্প-লেখার ও প্রবন্ধ রচনার যুগ বলা যাইতে পারে। এইগুলি প্রধানত হিতবাদীতে,

সাধনায় এবং ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৮ সালে কবি নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং ১৩১৩ সালে তাহা পরিত্যাগ করেন। এই সময়ের তাঁহার চতুর্থ ও পঞ্চম উপন্যাস —চোখের বালি ও নৌকাডুবি—বঙ্গদর্শনে বাহির হয়। বাঙ্গালা উপন্যাসরচনায় এখন যে পদ্ধতি চলিতেছে—অর্থাৎ সামাজিক-সংস্কার-নিরপেক্ষ ভাবে পাত্রপাত্রীর মানসলোকের বিবরণ ও বিশ্লেষণ—তাহার সূত্রপাত হইল চোখের বালিতে। ষষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস গোরা প্রথম প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় (১৩১৪-১৬)। গোরা বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তাহার পর প্রবাসীতে (১৩১৮-১৯) কবির 'জীবনস্মৃতি' বাহির হইল। ইহার রচনারীতি অত্যন্ত নিরাড়ম্বর, নিরতিশয় মধুর। জীবনস্মৃতি রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ।

ইহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। ভক্তিমূলক আধ্যাত্মিক কবিতারচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পয়ারমূলক সিঁড়িভাঙ্গা ছন্দে গভীর অনুভূতিপূর্ণ ও আত্মচিন্তাত্মক কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। ভাবের গভীরতায় এবং ভাষার দীপ্তিতে যেন সোনার তরীর যুগের পুনরাবির্ভাব ঘটিল। কথ্যভাষার ছাঁদে তিনি অনেকগুলি গল্প এবং দুইটি উপন্যাস রচনা করিলেন। উপন্যাস দুইটির নাম 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) এবং 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)। এ যুগের অধিকাংশ লেখা প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত সবুজপত্রে (১৩২১) প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। সবুজপত্রে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি 'বলাকা' কাব্যে গ্রথিত হইয়াছে। ভাবের ঐশ্বর্যে এবং শিল্পনৈপুণ্যে বলাকা (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির অন্যতম। এই কাব্যে বৃহত্তর জগতের এবং বিশ্বের বিবর্তনের বা গতিছন্দের স্পন্দন মূল-সুর হিসাবে অনুরণিত হইয়াছে। তাহার পরে 'পলাতকা' কাব্যে (১৯১৮) কতকগুলি ছোট ছোট কাহিনী বলাকার সিঁড়িভাঙ্গা ছন্দে লেখা হইয়াছে। 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে (১৯২২) শিশু কাব্যেরই ভাবের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে, তবে এখানে আধ্যাত্মিকতা সুস্পষ্ট। 'পূরবী' কাব্যে (১৯২৫) আবার পূর্বতন রচনার রস ও রঙ যেন ফিরিয়া আসিল। বলাকা ও পূরবী কাব্য দুইটি রবীন্দ্রকাব্যের শিল্প-নৈপুণ্যের দ্বিতীয় যুগের নিদর্শন। এই সময়ে কবি দুইটি রূপকনাট্য লিখিয়াছিলেন—মুক্তধারা (১৯২২) ও রক্তকরবী (১৯২৪)। নাটক দুইটিতে পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতা ও প্রচণ্ড ধনলোভের উপরে মানুষের সর্বজনীন

কল্যাণবুদ্ধির ও ত্যাগশক্তির জয় ঘোষিত। 'মহুয়া' কাব্যে (১৯২৯) নারীপ্রেম ও নারীচরিত্রে মাধুর্য প্রায় একমাত্র বর্ণনীয় বিষয়। 'পরিশেষ' কাব্যে (১৯৩২) যেন ক্ষণিকার লঘুতা ফিরিয়া আসিয়াছে। গদ্যকবিতাও এখানে প্রথম দেখা গেল। 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬) এবং 'শ্যামলী' (১৯৩৬)—গদ্যকাব্য। গদ্যকবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল নাই এবং পংক্তিতে সুনির্দিষ্ট যতিবিভাগ নাই, গদ্যকে পদ্যের মত সাজাইয়া পড়িলে যেমন হয় কতকটা যেন তেমনই। পূর্বে 'লিপিকা' (১৯২২) বইটিতে এই ধরণের রচনা সঙ্কলিত হইয়াছিল। তবে সেগুলি পদ্যের মত পংক্তিসজ্জিত ছিল না। 'বিচিত্রিতা' (১৯৩৬) কাব্যের কবিতাগুলি কয়েকটি ছবির ব্যাখ্যারূপে লেখা হইয়াছে। 'বীথিকা' (১৯৩৫) কাব্যের কবিতাগুলি সাধারণ রীতিতে লেখা। নিদারুণ পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রান্তিক' (১৯৩৮) রচনা করেন। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অবস্থিত কবিচিত্তের বিচিত্র অনুভূতি এই কবিতাগুলিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার পর যথাক্রমে 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৮), 'নবজাতক' (১৯৪০), 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যা' (১৯৪০), ও 'আরোগ্য' (১৯৪১) কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে শেষ প্রকাশিত কাব্য (১৯৪১) 'জন্মদিনে' বইটির কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কাব্যরীতিতে অদ্ভুত সংযম ও মিতভাষিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

সবুজপত্রের যুগের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ এই সব উপন্যাস ও বড় গল্প লিখিয়াছেন—যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪) এবং চার অধ্যায় (১৯৩৪)। শেষের কবিতায় কবি এক নূতন রীতির প্রবর্তন করিয়াছেন। পদ্যের মশলা-মিশ্রিত এই গদ্য রচনাটিকে বাঙ্গালায় "চম্পূকাব্য" বলা যাইতে পারে। এই কাব্যের ভাষা ও ভঙ্গি শাণিত অসিফলকের ন্যায় উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। শেষকালে রচিত তিনটি ছোটগল্প তিন সঙ্গী (১৯৪০) নামে প্রকাশিত।

শুধু সাহিত্যসৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়াবহ বিচিত্র প্রতিভা পর্যবসিত হয় নাই। ইন্দ্রধনুর মত পেলব ও বর্ণবহুল সুরসৃষ্টির প্রাচুর্যে তাঁহার সুগভীর রসানুভূতিরও অপরূপ আত্মবিকাশের আর একটি প্রধান উৎসমুখের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে সর্বভূমিক শিল্পরূপ গ্রহণ করিয়াছে। আর তাঁহার গানে সুরে তাঁহার রসসিদ্ধি প্রকৃতির ঋতুচক্রের

বিচিত্র সৌন্দর্যের সঙ্গে এক হইয়া গিয়া বাঙ্গালাভাষীর জন্য অক্ষয়রসভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড জীবনের কবি। শুধু চোখ মেলিয়া নয়, কান পাতিয়াও তিনি পরিপূর্ণভাবে বর্তমানের জীবনরস আস্বাদ করিয়াছিলেন, অতীতের জীবনরস অনুভব করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতের জীবনরস কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্তের ক্ষুধা মিটিত রূপরসের জগৎকে চোখে দেখিয়া, আর তাঁহার আত্মার পরিতৃপ্তি হইত শব্দরসের অভিষেকে। তাঁহারই কথায়—

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি,
তখন তারে জানি আমি তখন তারে চিনি।

রবীন্দ্রনাথের বাক্-বৈদগ্ধ্য তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি। নিজের হাতে ভাষা তৈয়ারী করিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টিকার্যে এমন পরম সিদ্ধি আর কোন দেশে কোন কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। বাঙ্গালা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে শক্তি ও শ্রী সঞ্চার করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কবিতার ছন্দে, গীতিতে ও ভাবে, গানের কথায় ও সুরে, গদ্যের প্রকাশক্ষমতায় এবং লালিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে ঐশ্চর্য প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার ফলে বাঙ্গালা দেশের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি আধুনিক ভারতবর্ষে তো বটেই, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আজ অবধি রবীন্দ্রনাথের মত আর কোন লেখক একাকী কোন ভাষায় এমনভাবে যুগপৎ শক্তি এবং মাধুর্য সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় অধিকার ছিল। উপনিষদের ও কালিদাসের কবিতার—বিশেষ করিয়া মেঘদূতের—তিনি ছিলেন অসাধারণ ভক্ত। উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তাঁহার ধারাবাহিক পরিচয় ছিল। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক চিন্তাধারার প্রবাহ রুদ্ধ হয় নাই। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। সে শ্রদ্ধা গতানুগতিক স্বীকৃতি নয়, তাহা অন্তরের গভীর উপলব্ধি হইতে উৎসারিত বোধ। সেকালে তপোবনে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচারী বালকেরা শিক্ষালাভ করিত। সেই আদর্শের অনুসরণে

রবীন্দ্রনাথ বোলপুরের নিকটে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এই বিদ্যালয় এখন বিশ্বভারতীতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এখানে স্কুল-কলেজের বিদ্যাচর্চা, প্রাচ্যতত্ত্বে গবেষণা এবং সঙ্গীত ও চিত্রকলার অনুশীলন হয়। বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংলগ্ন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানে কৃষি ও উটজ শিল্পের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিশ্বভারতী এখন ভারতবর্ষে শিক্ষার ও সংস্কৃতির অনুশীলনের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান বিশেষত্ব—অর্থাৎ যাহাতে পূর্ববর্তী বাঙ্গালী কবি হইতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়—তাহা সংক্ষেপে এই ঃ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিষয়বস্তু—তাহা বহিঃপ্রকৃতি হউক অথবা কোন ভাব বা আইডিয়া হউক—কবির মনে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করিয়াছে সেই অনুভূতিরই প্রকাশ। পূর্ববর্তী কবিদিগের কাব্যে বিষয়বস্তুরই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত কাব্যধারায় কবিচেতনা বিষয়বস্তুর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া এক অখণ্ডরূপ লাভ করিয়াছে। পূর্বের কাব্যরীতিতে কবিচিত্ত বিষয়বস্তু হইতে স্বতন্ত্র অথচ সাপেক্ষ হইয়া দর্পণের মত শুধু আদর্শ প্রতিবিম্বিত করিত; রবীন্দ্রনাথের রীতি হীরকখণ্ডের মত বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া অপূর্ব বর্ণচ্ছটা বিকিরণ করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিকে রোমান্টিক বলা চলে, কিন্তু তাঁহার রোমান্টিক প্রকৃতির মধ্যে একটা বৃহৎ ও সমুন্নত আদর্শের সুস্পষ্টতা আছে। আমাদের দেশের বাউল, দরবেশ, কবীরপন্থী ইত্যাদি সহজ-সাধকদিগের দৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির কতকটা সাম্য আছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে "মিষ্টিক" বা আধ্যাত্মিক কবিও বলা যায়।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। এখনকার দিনে সাহিত্যিকের এবং বৈজ্ঞানিকের পক্ষে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি জগতের সর্বোচ্চ সম্মান। ইহার অল্প কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে "ডকটর্ অব লিটারেচার" উপাধিতে ভূষিত করেন। তাহার পর দেশে বিদেশে—বিশেষ করিয়া ইউরোপে—ইনি যেরূপ অভূতপূর্ব সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আর কোনো কবির অদৃষ্টে ঘটে নাই। আধুনিক জগৎ রবীন্দ্রনাথকে শুধু শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াই জানে না, বরেণ্য জ্ঞানগুরু জানিয়া অপরিসীম শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

১৪. রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিতা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে কিংবা তাহার কিছু পূর্ব হইতেই বাঙ্গালা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইহা প্রবলতর হয় এবং অনতিবিলম্বে পূর্বতন পদ্ধতিকে অপ্রচলিত করিয়া দেয়। ইচ্ছা করিয়া আধুনিক ইংরেজী কবিতার অন্ধ অনুকরণ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াইয়া বাঙ্গালা কবিতা রচনা করা এখন অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের বর্ষীয়ান্ সমসাময়িকদিগের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০) অগ্রগণ্য। ইনি উত্তরপ্রদেশে ওকালতি করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কবিতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ইঁহার কবিতায় ঘরোয়াভাব ও স্নেহ-প্রেম-ভক্তির নিতান্ত সরল প্রকাশ লক্ষণীয়। ভারতী পত্রিকার প্রথম যুগে উহাতে দেবেন্দ্রনাথের কবিতা নিয়মিতভাবে বাহির হইত। ১২৮৭ সালে ইঁহার 'উর্মিলা কাব্য', 'ফুলবালা' ও 'নির্ঝরিণী' প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—অশোকগুচ্ছ (১৯০০) গোলাপগুচ্ছ (১৯১২), শেফালিগুচ্ছ (১৯১২) ও পারিজাতগুচ্ছ (১৯১২)।

কোন কোন হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহধর্মী ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮)। ইনি ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার কোন কোন কবিতায় পূর্ববঙ্গের স্থানকালের ছাপ আছে। দাম্পত্যপ্রেম ইঁহার কাব্যপ্রতিভারও প্রধান উৎস। গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন "স্বভাবকবি" বলিতে যাহা বুঝায় কতকটা তাই। ইঁহার কাব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে প্রেম ও ফুল (১২৯৪), কুঙ্কুম (১২৯৮), কস্তুরী (১৩০২), চন্দন (১৩০৩) ও ফুলরেণু (১৩০৩)।

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮) কলিকাতার বাসিন্দা। ইনি বিহারীলালের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন বলা যায়। অক্ষয়কুমারের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারে অলক্ষ্য নয়। নারীপ্রেমের শান্তরস অক্ষয়কুমারের কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব। ছন্দের চাতুর্যের দিকে বেশি ঝোঁক না রাখায় ভাবের প্রকাশ অকুণ্ঠিত হইয়াছে। তবে ভাবাবেগের তীব্রতায় কবি ভাষার উপর সর্বত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। অক্ষয়কুমারের প্রথম কাব্য প্রদীপ প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালে। তাহার পর কনকাঞ্জলি (১৮৮৫),

ভুল (১৮৮৭), শঙ্খ (১৯১০) ও এষা (১৯১২)।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) আলোচ্য সময়ের প্রথম উৎকৃষ্ট নারী কবি। শৈশবস্মৃতি অবলম্বনে পল্লীচিত্র এবং কলিকাতার অন্তঃপুরের ছবি ইঁহার কবিতায় ভালো করিয়া ফুটিয়াছে। ভাবে ও ভাষায় এই কবিতা গুলির মধ্যে যে নারীমানসের স্পর্শ এবং অকৃত্রিম সারল্য দেখা যায় তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্যত্র দুর্লভ। ইঁহার কবিতাগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— অশ্রুকণা (১৮৮৭), আভাষ (১৮৯০), শিখা (১৮৯৬), অর্ঘ্য (১৯০২) ইত্যাদি। ইঁহার প্রথম কবিতাপুস্তক কবিতাহার (১৮৭৩)।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) বাঙ্গালী নারীকবিদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট। অল্পবয়সেই ইঁহার কবিত্বপ্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকিলেও ইঁহার কাব্যে বেশ মৌলিকতা আছে। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ আলো ও ছায়া (১৮৮৯) বাঙ্গালা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইঁহার অপর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে পৌরাণিকী (১৯০১), অশোক সঙ্গীত (১৯০৭), মাল্য ও নির্মাল্য (১৯২০) এবং দীপ ও ধূপ (১৯২৯)।

মাতা প্রসন্নময়ীর মত প্রিয়ম্বদা দেবীও (১৮৭১-১৯৩৪) কাব্যরচনায় যশ লাভ করিয়াছিলেন। ইনিও গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। ইঁহার কবিতার ভাষা সংযত, আকারে ক্ষুদ্র এবং ভাব প্রগাঢ়। এই বিষয়ে ইঁহার ছোট ছোট কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ রচনার প্রতিযোগী। ইঁহার কবিতা রেণু (১৯০১), পত্রলেখা (১৯১০), অংশু (১৯২৭) কাব্যে সঙ্কলিত আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যে বিশেষভাবে পড়িয়াছে। তৎসত্ত্বেও কবির নিজস্বতা ঢাকা পড়ে নাই।

মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইঁহার কাব্যকলা মাইকেল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ধারায় প্রকাশিত। কাব্য-কুসুমাঞ্জলি (১৮৯৩), কনকাঞ্জলি (১৮৯৬) ও বিভূতি (১৯২৩)—ইঁহার প্রধান কাব্যগ্রন্থ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) নাট্যকার বলিয়া পরিচিত হইবার পূর্বে কাব্যরচনায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হইতেছে আর্যগাথা (প্রথম ভাগ ১৮৮২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৩)। আষাঢ়ে

(১৮৯৮), মন্দ্র (১৯০২), আলেখ্য (১৯০৭) এবং ত্রিবেণী (১৯১২)—পরিপক্ক রচনা। ভাষায় শৈথিল্য এবং ছন্দে স্বাধীনতা সত্ত্বেও ভাবের সরল এবং কবিত্বময় প্রকাশ ইহার কবিতাগুলিতে বিশেষ একটু মাধুর্যের সঞ্চার করিয়াছে। ইঁহার শ্রেষ্ঠ কৃতি 'হাসির গান' (১৯০০)।

রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) প্রতিভাস্ফূর্তি হইয়াছিল গানরচনার মধ্য দিয়া। বাণী, কল্যাণী (১৯০৪), অমৃত (১৯১০) ইত্যাদি কাব্যে ইঁহার গান ও কবিতা সঙ্কলিত আছে। রজনীকান্তের গানে সরলভাবে আন্তরিকতা প্রকটিত।

রবীন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ কবিদের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। সত্যেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। পিতামহের জ্ঞানতৃষ্ণা পৌত্র পাইয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণতা ছন্দের কৌশলে এবং ধ্বনিমুখর শব্দের নির্বাচনে। বাঙ্গালা ছন্দে তিনি অনেক নূতন দোলার ও ঝঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদেশী কবিতাকে ভাব ও ভাষা সমেত আত্মসাৎ করিতেও ইহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। রবীন্দ্র-অয়নের মধ্যাহ্নসময়ে আবির্ভূত হইয়াও রবীন্দ্রনাথকে যথাসম্ভব পাশ কাটাইয়া নিজের পথ নির্বাচন করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ সমসাময়িক কবিদের মধ্যে বিলক্ষণতা দেখাইয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হইতেছে দুইটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা—সবিতা (১৯০০) ও সন্ধিক্ষণ। ইঁহার প্রধান মৌলিক কাব্যগ্রন্থ হইতেছে বেণু ও বীণা (১৯০৬), ফুলের ফসল (১৯১১), কুহু ও কেকা (১৯১২), তুলির লিখন (১৯১৪), অভ্র-আবীর (১৯১৫), এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 'বিদায়-আরতি' ও 'বেলাশেষের গান'।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগেই এক তরুণ শক্তিশালী কবির আবির্ভাব হয়। ইনি কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম ১৮৯৯)। ইঁহার প্রথম কবিতার বই অগ্নিবীণা (১৯২২) প্রকাশিত হইয়াই বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণকে যতটা মুগ্ধ ও বিচলিত করিয়াছিল ততটা আগে ও পরে আর কোন রচনায় হয় নাই। সত্যেন্দ্রনাথের সমসাময়িক প্রবীণ কবি দুইচারিজন এখনও বর্তমান ও সৃষ্টিশীল। যাঁহারা আর ইহলোকে নাই তাঁহাদের মধ্যে চারিজন প্রধান—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৪৩)।

১৫. গল্প ও উপন্যাস

কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তনে যে সফলতা আসে নাই, সে সাফল্য গল্পে তাঁহার অনুবর্তীরা লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর সংসারে ও মানসপ্রকৃতিতে ছোটগল্পের যে চমৎকার উপাদান রহিয়াছে সে ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া দিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম অনুসরণকারী হইতেছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। নগেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প ঠিক ছোটগল্পের পর্যায়ে পড়ে না বটে, তবে তাঁহার সংগ্রহ (১৮৯২) বইটিতে যে কয়টি চিত্র আছে তাহার মধ্যে দুই-একটিকে উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের মর্যাদা দিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের গল্পের প্রধান গুণ হইতেছে প্লটের চমৎকারিতা এবং বর্ণনার দ্রুতগতি ও আড়ম্বরহীনতা।

রবীন্দ্রনাথের পরেই বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখক হইতেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭০-১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রভাত কুমারের প্রথম দিকের গল্পগুলিতে যতটা অনুভূত হয় পরবর্তী রচনায় তেমন নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথাসম্ভব অতিক্রম করিয়া প্রভাতকুমার তাঁহার ছোট গল্পে নিজের বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। প্রভাতকুমারের গল্পে ভাবাবেগ কম এবং কাহিনীর আকর্ষণ বেশী। এক কথায় বলিতে গেলে প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে বঙ্কিমের রোমান্স-দৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির সুন্দর মিলন হইয়াছে। সরল ও সচ্ছন্দ রচনাভঙ্গির তলে তলে প্রচ্ছন্ন কৌতুকপ্রবাহ এবং সমবেদনা লঘুভার গল্পগুলিকে নিরতিশয় সুখপাঠ্য করিয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের জীবনে রোমান্সের অবসর নিতান্ত কম। কিন্তু তাহারই মধ্যে যেটুকু দেখা যায় অথবা দেখা যাইতে পারে তাহার স্নিগ্ধ সরস আলেখ্য প্রভাতকুমারের ছোটগল্পগুলিতে রমনীয়ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বা বড় গল্পে যে রোমান্স আছে তাহা আধুনিক বাঙ্গালী জীবনের নয়, ঐতিহাসিক দূরত্বই এই রোমান্সগুলির রমণীয়তা বাড়াইয়াছে। প্রভাতকুমারের ছোটগল্পের রোমান্স সমসাময়িক ভদ্র বাঙ্গালী জীবনের রোমান্স, সেইজন্য সর্ববিধ পাঠক সমাজে এই গল্পগুলির আদর অসামান্য। প্রভাতকুমারের গল্পের বইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে নবকথা (১৮৯৯), ষোড়শী (১৯০৬), দেশী ও বিলাতী

(১৯০৯), গল্পাঞ্জলি (১৯১৩) ইত্যাদি। প্রভাতকুমার অনেকগুলি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলিতে তাঁহার ছোটগল্পের উৎকর্ষ নাই। উপন্যাসের মধ্যে স্থানে স্থানে যে চমৎকার উজ্জ্বল চিত্র আছে তাহাতে গল্পের রস জমিলেও সবশুদ্ধ প্লটে সংহতি এবং কাহিনীতে স্বচ্ছন্দ প্রবাহ বহমান নয়। প্রভাতকুমারের উপন্যাসের মধ্যে নবীন সন্ন্যাসী (১৯১১) শ্রেষ্ঠ।

প্রভাতকুমারের পর অনেক ভাল ছোট গল্পলেখক দেখা দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং জলধর সেন। সুধীন্দ্রনাথের গল্পে করুণরস অতি সামান্য আয়োজনে জমিয়া উঠিয়াছে। চরিত্রচিত্রণে সরসতার সঞ্চার সুরেন্দ্রনাথের গল্পের অসাধারণত্ব। ইঁহার রচনাভঙ্গি একান্ত নিজস্ব। জলধরের গল্প করুণরস-প্রধান। ছোটগল্পের মত সরসভাবে সেকালের পল্লীর কাহিনীবর্ণনায় ও চিত্র-অঙ্কনে দীনেন্দ্রনাথ রায় দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ইঁহার পল্লীচিত্র (১৩১৩), পল্লীবৈচিত্র্য ইত্যাদি গ্রন্থের প্রসঙ্গগুলি গল্পের মত সুখপাঠ্য। ইনি বহু রোমান্টিক ও ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখিয়াছিলেন।

সারগর্ভ প্রবন্ধরচনায় বিশিষ্টতা দেখইয়াছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) ও যোগেশচন্দ্র রায় (১৮৫৯-১৯৫৬)।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৮) একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্ভুতরসের স্রষ্টা। একটি ছেলে-ভুলানো ছড়া অবলম্বন করিয়া লুইস ক্যারলের Alice in Wonderland কাহিনীর ছায়া-অবলম্বনে রচিত কঙ্কাবতী (১২৯৯) উপন্যাসে বাস্তব জগতে এবং রূপকথার রাজ্যের সম্ভব-অসম্ভবকে বিশেষ নিপুণতার সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের ভূত ও মানুষ, মুক্তামালা ও ডমরু চরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের নব্য আরব্য-উপন্যাসমাল্য। শিশু ও বর্ষীয়ান্ সকলেই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলি হইতে সমান আনন্দ পায়। নিতান্ত স্বল্প আয়োজনে অনাবিল কৌতুকরসের সৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথের সমানধর্মা লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যে খুব অল্পই দেখা দিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের নিতান্ত ঘরোয়া এবং অত্যন্ত সরস লিপিভঙ্গি অননুকরণীয়। ফোক্‌লা দিগম্বর, পাপের পরিণাম, ময়না কোথায় প্রভৃতি উপন্যাসে হাস্য, করুণ এবং বীভৎস রসের নিপুণ

সমাবেশ হইয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের সহযোগিতায় তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা এন্‌সাইক্লোপীডিয়া 'বিশ্বকোষ' এর পত্তন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকালের অধ্যাবসায়ে নগেন্দ্রনাথ বসু ইহা সম্পূর্ণ করেন।

ত্রৈলোক্যনাথের পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্ভুতরসের কারবারে সফলকাম হইয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পিগুরু। প্রাচীন ভারতের লুপ্তশিল্পধারাকে ইনি নূতন খাতে এবং প্রবলতর বেগে প্রবাহিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও ইহার দান অসামান্য। অবনীন্দ্রনাথের রচনাপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব। ছেলেদের জন্য ইনি শকুন্তলা (১৮৯৫), ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৫), রাজকাহিনী ইত্যাদি যে-সকল বই লিখিয়াছেন, তাহার বর্ণনাভঙ্গি বয়স্কদেরও পরম উপভোগ্য। ভূতপত্রীর দেশ (১৯১৫) ও খাজাঞ্চির খাতা— দুইটি অপূর্ব অদ্ভুতরসের গল্পের বই। শিশুর অপরিণত মনের উপর বিশ্বের বিচিত্র রূপ ও অনুভূতি যেমন সংলগ্ন ও অসংলগ্নভাবে বিচিত্রতর আলোছায়া ফেলিয়া যায়, ভূতপত্রীর দেশেও তেমনি ছড়া ও ছবি, ইতিহাস ও গল্প, জাগরণ ও স্বপ্ন গল্পের ইন্দ্রজাল বুনিয়া চলিয়াছে। রঙে এবং রেখায় যেমন রূপচিত্র কাগজে এবং কলমেও তেমনি শব্দচিত্র সমান নৈপুণ্যে অবনীন্দ্রনাথের লেখনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পথে বিপথে (১৯১৯) বইটিতে ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মিলিবে।

উপন্যাসে, এবং বড়গল্পে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার নূতনত্বের অবতারণা করিয়া ছিলেন, একথা পূর্বে বলিয়াছি। শ্রীশচন্দ্রের অনুজ শৈলেশচন্দ্র (?-১৯১৪) গল্পচিত্র-রচনায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। ১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথকে সম্পাদক করিয়া শ্রীশচন্দ্র ও শৈলেশচন্দ্র নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারীর (?-১৯২০) শুভবিবাহ (১৩১২) এই ধরণের একটি ভালো রচনা। যতীন্দ্রমোহন সিংহের উড়িষ্যার চিত্রও (১৯০৩) সমাজ-ও সংসার-চিত্র উৎকৃষ্ট রচনা।

ভারতবর্ষের ও বাঙ্গালা দেশের অতীত ইতিহাসকে রূপদান করিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৩০) বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন। শশাঙ্ক (১৯১৪), ধর্ম্মপাল (১৯১৫), করুণা (১৯১৭) ও ময়ুখ (১৯১৬) এই চারিটি উপন্যাসে গুপ্ত, পাল ও মোগল যুগের ইতিহাস

যেন জীবন্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিক চিত্র হইলেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেণের মেয়ে (১৯১৯) পালযুগের শেষ আমলে পরিকল্পিত ঘটনা সবই কাল্পনিক হইলেও দেশ-কাল সমাজ সংসারের পরিবেশ সংস্থাপনের ফলে বইটি সাধারণ উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। স্বচ্ছন্দ কথ্যভাষামূলক লিপিভঙ্গি উপভোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে ভারতী পত্রিকাকে আশ্রয় করিয়া একটি তরুণ সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। ইঁহাদের গল্পে-উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী দেখা গেল। কাহিনীর মধ্যে বস্তুর ভাগ অল্প, অলস রোমান্স-কল্পনার অংশই বেশি। ভাষা যথাসম্ভব কথ্যভাষাশ্রয়ী, তবে অত্যন্ত কাব্যরসসিক্ত। সমসাময়িক পাশ্চাত্য সাহিত্যধারা বাঙ্গালা সাহিত্যে বহাইয়া দেওয়া ইঁহাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই গোষ্ঠীর অনেকেই ভালো গল্পলেখক ছিলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯) ছিলেন ইঁহাদের অগ্রণী। এই গোষ্ঠীর অন্যতম বিশিষ্ট লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) গল্প-উপন্যাস-রচনায় সাবলীলতা দেখাইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের অনুসরণ সর্বপ্রথম চারুচন্দ্রই করিয়াছিলেন। চারুচন্দ্রের সহযোগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৮৪), শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় (জন্ম ১৮৮৮) ও শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (জন্ম ১৮৯০)। ছোটগল্প-রচনাতেই ইঁহাদের কুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই ভারতী-গোষ্ঠীরই কনিষ্ঠতম লেখক গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৩-১৯২৫) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তরুণ লেখকদের নেতারূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কবিত্বময় ছোটগল্প রচনায় গোকুলচন্দ্রের দক্ষতা ছিল। আসলে কিন্তু এই তরুণ লেখকদের গুরু শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (জন্ম ১৮৮২)।

১৬. প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র

বিদ্যাসাগরী ভাষায় গুরুশব্দের ভার কমাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা গদ্যকে লঘুভার করিয়াছিলেন। তবুও মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার দূরত্ব অনেকখানি রহিয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার কোন কোন বন্ধু ও শিষ্যস্থানীয় চিন্তাশীল লেখক বাঙ্গালা গদ্যে সাধুভাষায় ও কথ্যভাষায় ব্যবধান লুপ্ত করিয়া একটি কহিবার ও লিখিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, উপভাষা

নির্মুক্ত, গদ্য রীতি চালাইয়া ভাষাকে লঘুভার ও নূতন নূতন ভাবপ্রকাশের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উপক্রমের সময়ে নানা কারণে শিক্ষিত সমাজে কিছু কিছু পিছু হাঁটার দিকে প্রবণতা দেখা দিতেছিল। স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই প্রতিক্রিয়াশীলতার সূত্রপাত। সাহিত্যে ইহার ইঙ্গিত ফুটিয়াছিল কোন কোন লঘুপ্রতিষ্ঠ লেখক কর্তৃক দৃঢ়ভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধবাদে। (রবীন্দ্রনাথ সর্বদা নিজেকে পিছনে রাখিতেন। সে তাঁহার ভীরুতা নয়, তাঁহার ভদ্রতা, তাঁহার নম্রতা। যেখানে বড় বড় বাগ্মী বীরেরা আগাইতে সাহস করিতেন না সেখানে, প্রয়োজন হইলে, রবীন্দ্রনাথ কোন দিকে গ্রাহ্য না করিয়া আগাইয়া আসিতেন।) তাই রবীন্দ্রনাথ এই ভাষা-আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা কৃতকর্মা হইয়াও নিজে নেতা হইলেন না। তাঁহার সাহিত্য-শিষ্য এবং আত্মীয় ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ চৌধুরীকে সবুজপত্র (১৩২০) মাসিক পত্রিকাটি বাহির করিতে উৎসাহ দিলেন। সাহিত্যে নূতন চিন্তা নূতন ভাষায় পরিচ্ছন্ন সাজে নবীন ও প্রবীণ লেখকদের রচনা রূপে সবুজপত্রে বাহির হইতে লাগিল। সবুজপত্রের লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথ।

প্রমথনাথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সবুজপত্রের আগেও কিছু কিছু ভারতী পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। বিষয়-আলোচনার নূতন রীতি আর চিন্তার স্পষ্টতার সঙ্গে বচনের তীক্ষ্ণতা প্রমথবাবুর প্রবন্ধে আগেই দেখা দিয়াছিল। সবুজপত্রের প্রবন্ধ ও অন্য রচনায় তাঁহার নিজস্ব ষ্টাইল সম্পূর্ণ রূপ লইল।

প্রমথ বাবু গল্পও লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'চার-ইয়ারী-কথা' (১৯১৬) নামক গল্পসমষ্টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সবুজপত্র বাহির করিবার আগে প্রমথবাবু কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন। সেগুলি প্রায় সবই সনেট এবং 'পদচারণ' (১৯১৯) ও 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) বই দুইটিতে সংকলিত। প্রমথবাবুর গদ্যরচনার সুমিতি ও তীক্ষ্ণতা তাঁহার পদ্য রচনাতেও প্রকটিত, এবং তাঁহার গদ্য রচনার মত তাঁহার পদ্য রচনাও অনুকরণের প্রায় অসাধ্য।

সবুজপত্রের অনেকগুলি তরুণ লেখক বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সবুজপত্রের অন্তর্ধানের পর ধীরে ধীরে

সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

সবুজপত্রের প্রকাশ হইতেই বাঙ্গালা-সাহিত্যচিন্তায় আধুনিক পর্বের সূত্রপাত।

১৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য গল্প-উপন্যাস লেখক

আধুনিককালে বাঙ্গালা দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাসরচয়িতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) বাঙ্গালা সাহিত্যে আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তাঁহার রচনার সমাদরও তেমনি অসম্ভাবিত। শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত (১৯০৩) রচনা—মন্দির—১৩০৯ সালের কুন্তলীন পুরস্কার পাইয়াছিল। গল্পটি বেনামিতে বাহির হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় গল্প—বড়দিদি—১৯০৭ সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর ১৯১২ সালের মাঘ মাস হইতে শরৎচন্দ্র সাহিত্যের আসর রীতিমত জাঁকাইয়া বসেন। সাহিত্য পত্রিকার মাঘ এবং ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় যথাক্রমে বাল্যস্মৃতি ও কাশীনাথ নামক দুইটি গল্প বাহির হইল, এবং ১৯১৩ সালের যমুনা পত্রিকায় চন্দ্রনাথ, পথনির্দেশ, বিন্দুর ছেলে, চরিত্রহীন (অংশত) এবং পরিণীতা প্রকাশিত হইয়া লেখকের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। অতঃপর শরৎচন্দ্রের বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাসই ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রথম বাহির হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা তিনি তাঁহার গল্প উপন্যাসের কাঠামোয় ভালোভাবেই কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনীর প্রথম পর্বের (১৯১৬) চিত্রগুলিতে তাঁহার বাল্যজীবনের ছবি এবং কিশোর মনের ঘাত-প্রতিঘাত সহৃদয়ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আরও কয়েকটি গল্প-উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনীর আভাস বা রূপান্তর পাওয়া যায়।

বাল্যাবধি শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের ভক্ত পাঠক ছিলেন। তাই তাঁহার প্রথম যুগের রচনায় বঙ্কিমের অনুসরণ দুর্লক্ষ্য নয়। গল্প-উপন্যাসে রোমান্সের ঘন আবরণেও বঙ্কিমপ্রভাব সূচিত। যৌবনের পূর্বে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পান নাই। ১৩০৮-০৯ সালে ভারতীতে ও বঙ্গ দর্শনে প্রকাশিত নষ্টনীড় এবং চোখের বালি শরৎচন্দ্রকে নূতন দিক নির্দেশ

করিল। অতঃপর বিষয়বস্তুতে রবীন্দ্রনাথের গৌণপ্রভাব এবং ভাষায় তাঁহার সজ্ঞান অনুকরণ শরৎচন্দ্রের লেখায় স্পষ্ট অনুভব করা যায়। শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই গুরুতর।

শরৎচন্দ্রের লেখায় যে বিশুদ্ধ ঘরোয়া রোমান্স-রস পরিবেশিত হইয়াছে প্রধানত তাহাই সেগুলির অপরিসীম জনপ্রিয়তার হেতু। কিন্তু এই বিশুদ্ধ গল্পরস ছাড়াও এমন একটা নূতন কিছু তাঁহার রচনায় আছে যাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট দান বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা হইতেছে সমাজকে প্রচলিত প্রথার দ্বারা নয়, সাধারণ হৃদয়বৃত্তি ও সার্বভৌম ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে বিচার করা। অন্ধসংস্কার-চালিত সমাজের অনেক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার গল্পে-উপন্যাসে সমাজের হৃদয়হীন কৃত্রিমতার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ (১৯১৫), অরক্ষণীয়া (১৯১৬) প্রভৃতি বিশিষ্ট গল্পে সমাজের শৃঙ্খলে নিপীড়িত মানুষের দুঃখবেদনার সকরুণ ইতিহাস পাই।

শরৎচন্দ্রের লেখায় ব্যক্তির ও সমাজের সমস্যার ইঙ্গিত আছে কিন্তু সমাধান নাই। সমাধান গল্পের অপরিহার্য অঙ্গ নয়, আর শরৎচন্দ্র ছিলেন বিশুদ্ধ গল্পলেখক। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসে কাহিনীর যবনিকার অন্তরালেও যে চরম পরিণতির আভাস পাই তাহা শরৎচন্দ্রের রচনায় একেবারেই মিলে না।

শরৎচন্দ্রের গদ্যভঙ্গি গৌণত বঙ্কিমের এবং মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাতে এমন কয়েকটি গুণ আছে যাহা তাঁহার নিজস্ব। শরৎচন্দ্রের লেখা অত্যন্ত সরল। ভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত একটি বাক্যের প্রয়োগ নাই, অথচ ইহা রসহীন কথোপ-কথনের ভাষা নয়। আসল কথা হইতেছে, শরৎচন্দ্রের ভাষা রোমান্টিক এবং সেন্টিমেন্টাল বিষয়বস্তুর অত্যন্ত উপযোগী।

রবীন্দ্রযুগের মধ্যাহ্নে উদিত হইয়াও শরৎচন্দ্র যে নিজের স্নিগ্ধ কিরণজাল বিস্তারিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। সাহিত্যশিল্প হিসাবে তাঁহার সব গল্প ও উপন্যাস নিশ্চয়ই নিখুঁত নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব হইতেছে সমাজদুর্গের বহিঃপ্রাঙ্গণস্থিত দুঃখী-দরিদ্র-নিষ্পীড়িতের প্রতি অজস্র সহানুভূতি। এই সহানুভূতি

বাহিরের তৃতীয় ব্যক্তির নয়, ইহা অনুকম্পাও নয়। পাঁচজনের একজন হইয়া শরৎচন্দ্র যে সহানুভূতি মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই তিনি মনোজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি কিছু কম নয়, কিন্তু তিনি মনীষী কবি, তাঁহার চিত্তের প্রসার অপরিসীম বৃহৎ এবং ব্যাপক। তিনি যে দুঃখ-বেদনা অনুভব করিয়া কাব্যে ও গল্প-উপন্যাসে প্রতিফলিত করিয়াছেন তাহা তীব্রতাহীন, তাহা "রস"। রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টা, তাঁহার রসসৃষ্টিতে আমাদের আত্মার সৌন্দর্যবোধ চরিতার্থ হয়, কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জগতের স্থূল মন সব সময়ে সে রসসৃষ্টির নাগাল পায় না। রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসে আমরা পাই প্রধানত এবং প্রচুরভাবে জীবনরস। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যেও এই জিনিসই পাওয়া যায়, কিন্তু অপ্রচুর এবং রোমান্স-তরলরূপে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ জনপ্রিয় রচনায় সাহিত্যের রস যত না আছে তাহার বেশি আছে গল্পের মাদকতা। চরিত্রসৃজনে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী, এবং এই ঋণ স্থানে স্থানে হয়ত বোঝা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যেখানে শুধু নিজের অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করিয়াছেন সেখানে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব সুপরিস্ফুট।

শরৎচন্দ্র যাহাদের সুখদুঃখ চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি যেন তাহাদেরই একজন—এই সমবেদনাই শরৎ-সাহিত্যের মূলকথা। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট অপ্রধান চরিত্রগুলির কোন মাহাত্ম্য নাই, তাহারা পাঁচপাঁচি মানুষ, দরিদ্র, ভালমন্দে জড়িত সাধারণ লোক। এই সমাজের সহিতই তাঁহার আত্যন্তিক পরিচয় ছিল বলিয়া ইহার কোন কোন ছবি তাঁহার হাতে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে এবং পাঠক-সাধারণের মন অনায়াসে হরণ করিয়া লইতে পারিয়াছে। ধনী বা অভিজাত সমাজের অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রের ছিল না, সেই জন্য তিনি যেখানে এই সমাজের চিত্র আঁকিয়াছেন সেখানে আশানুরূপ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। সাংসারিক অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রের যতটুকু ছিল তাহা গভীর ছিল বটে, কিন্তু ব্যাপক ছিল না। এই কারণে তাঁহার অতগুলি গল্প-উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রায় একই নারী-চরিত্রের এবং দুই তিনটি নর-চরিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখি।

শরৎচন্দ্র প্রথম জীবন কাটাইয়াছিলেন ভাগলপুরে। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা মিলিয়া গল্প-উপন্যাস রচনার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্তী কালে উপন্যাস লিখিয়া নাম করিয়াছেন।

নিরুপমা দেবী (১৮৮৮-১৯৫১) ও অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) সাহিত্যসমাজে শরৎচন্দ্রের আগেই প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। নিরুপমার দিদি, শ্যামলী, বিধিলিপি প্রভৃতি উপন্যাস এখনো সমাদর হারায় নাই। অনুরূপার জ্যেষ্ঠ ভগিনী ইন্দিরাও (১৮৭৯-১৯২২) ভালো গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যসঙ্গী ও আত্মীয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অনেকগুলি সুখপাঠ্য উপন্যাস লিখিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস যখন জনপ্রিয়তার চরমে উঠিতেছে তখন কয়েক জন শক্তিশালী লেখকের অভ্যুত্থান ঘটে। তাহার মধ্যে নবীন-প্রবীণ দুই রকমের লোক আছেন। প্রবীন দুইজন লেখক রচনা সাহিত্যে রম্যরচনার সম্ভার বৃদ্ধি করিল। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) রবীন্দ্রনাথের বালক পত্রিকার যুগের লেখক। বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধারণ পাঠক তাঁহাকে চিনিয়াছে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে, তাঁহার 'কি ও কে', 'কবলুতি', 'পাথেয়' প্রভৃতি গল্পের বইগুলি বাহির হইবার পর হইতে। "পরশুরাম" ছদ্মনামে রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) যে সরস গল্পগুলি লিখিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। ইনি একেবারে পাকা কলম লইয়া আবির্ভূত। নবীন লেখক যাঁহারা গল্প-উপন্যাসে নূতন স্বাদের বিষয়বস্তু আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বয়সে এবং লিপিকুশলতায় প্রবীণ ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন। বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে ছোট গল্পে অনেকেই সবিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা এই বইয়ের পরিসরের বাহিরে।

নির্ঘন্ট